মধুবন

গৌরচন্দ্র চক্রবর্তী

প্রকাশ ভবন
১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট ॥ কলিকাতা-১২

প্রথম সংকলন : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯

প্রকাশক :
শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রকাশ ভবন
১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রিট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
কার্ত্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বসু ষ্ট্রিট,
কলিকাতা-৬

শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার ঘোষ

মান্যবরেষু

এই লেখকের

দিগন্তের রঙ

এক

—জিন্দগী জিন্দা দিলী-হি কা নাম হ্যায়, মুরদা দিল্ ক্যা খাক্ জিয়া করতা হ্যায় ?

খুব কহা মিত্তর সাহব। বুজুরগীকা ইয়ে লব্জ্। ক্যায়া কহ্না হ্যায়। বিন্দুলাল সাবাসি জানায়।

বিহার বনবিভাগে মোহন মিত্র একটি নাম।

ওপরতলা-নীচতলা থেকে আরম্ভ করে ঠিকাদারগুষ্টি, আর গাঁয়ের পর গাঁয়ের মানুষ তাঁকে মিত্তর সাহব বলেই জানে। রোয়াবের সঙ্গে পুরো পঁয়ত্রিশটা বছর চুটিয়ে চাকরী করে আজ অবসর নিলেন। হ্যাণ্ডওভার-টেকিংওভারের পালা শেষ হয়েছে সকালেই। নতুন রেঞ্জার সতীনাথ রায়ের হাতে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে পক্ককেশ মোহন মিত্র বললেন, তরতাজা নতুন জোয়ান ছেলে! তোমাদের দেখলে আমার জঙ্গলে আসবার প্রথম দিনটার কথা মনে পড়ে যায় ভায়া। তারপর, চোখের ওপর ভেসে ওঠে কত ছবি। ভালয়-মন্দয়, সুখে-দুঃখে ভরা, কত বিচিত্র, কত রংএর ছবি। কিন্তু ভায়া, একটা কথা বলে যাই। মনটাকে বাঁচিয়ে রেখ। মরামন নিয়ে জঙ্গলে চাকরী করতে পারবে না।

সতীনাথ সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। রেঞ্জ-অপিস ঘরে তখন আর কেউ নেই। গার্ডের দল নানা কাজে বাইরে ব্যস্ত।

সতীনাথ বলে, রইলেন তো কাছেই। যখন দরকার, গিয়ে বিরক্ত করব। গোটা ডিপার্টমেন্টের সবাই আপনাকে শ্রদ্ধার চোখেই দেখে।

মোহন মিত্র বললেন, তাতে আর লাভ হোল কি বলো ? রেঞ্জার হয়েই এলাম, রেঞ্জার হয়েই বিদায় নিতে হল। মানে, যাকে উন্নতিকরা বলে, তাতো কপালে জুটল না।

সতীনাথ উত্তর দেয়, না-ই বা তা জুটল। মানুষের ভালবাসা তো পেয়ে

গেলেন। যারা চটপট উন্নতির সিঁড়ি ভেঙে শিখরস্থানে গিয়ে বসেছেন, তাঁদের ক'জনের ভাগ্যে এমন ভালবাসা জুটেছে বলতে পারেন?

বৃদ্ধ মোহন মিত্রের চোখদুটো যেন ঈষৎ বুঁজে এলো। ভিজে উঠল চোখের পাতা।

সতীনাথের মাথায় হাত রেখে বললেন, আর একটা কথা। It does not pay. বুঝলে ভায়া? ওপরওয়ালাদের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে যেও না আমার মত। এক-দুই-তিন-চারের কোঠায় হয়ত তোমার জিত হবে। লোকে শুকনো বাহবা দেবে। কিন্তু যোগফলের ঘরে শেষে গিয়ে দেখবে মস্ত একটা শূন্য। বুঝলে কিনা। বিবেক বস্তুটাকে একটু ঘোমটা দিয়েই রেখ। তাছাড়া তোমাদের ক্যাডারের প্রস্পেক্ট আছে তো। আমরা তো চেয়ার-ঝাড়া রেঞ্জার ছিলাম হে। তখনকার দিনে ডি. এফ. ও টুরে এলে তার বসবার চেয়ারও ঝেড়ে দিতে হোত। যাকে তোমরা আজকাল অয়েলিং বল। তখন ছিল অয়েলিং-ক্লিনিং বোথ্।

হাসতে লাগলেন মোহন মিত্র।

সতীনাথ নিঃশব্দে সে হাসিতে যোগ দিল।

নতুন চাকরী। নতুন রেঞ্জের চার্জ। তারওপর বিখ্যাত ঝালুক-পোখরের বিশাল রেঞ্জ। এখনো ডেরাডুনের ট্রেনিংকালের সাহেবিয়ানা, চকচকে ভাব সতীনাথের কথায় বার্তায়, সর্বাঙ্গে মাখানো।

দুপুরে রেঞ্জ কম্পাউণ্ডে বসেছে সবাই গোল হয়ে। কেউ চেয়ারে, কেউ বা টেবিলের ওপর। মিত্র সাহেবের পুরোনো কুর্সীতে তিনিই-উপবিষ্ট।

মোহন মিত্র বললেন, জীবন্ত প্রাণের নামই জীবন। মরা দিল্ ছাই বাঁচতে জানে। জিন্দেগী জিন্দা দিল্‌হীকা নাম হায়···

দিগম্বর প্রসাদ বলে, আপনার মত বিচক্ষণ মানুষের একথার কোন তুলনা নেই মিত্তর সাহব।

সতীনাথ চুপ ক'রে শোনে।

পাইপ ধরিয়ে টানে। মাঝে মাঝে হেসে সায় দেয় মোহনমিত্রের কথায়। উৎসাহ দেয় দিগম্বর প্রসাদ আর বিন্দুলালের কথায়।

মোহন মিত্র এবার সোজা হয়ে বসে বলেন, দেখ, তোমাদের মধ্যে সব চাইতে আজ নতুন হোল সতীনাথ। বিন্দু, দিগম্বর, তোমরা কিছুটা পুরোন।

কিন্তু আমি তো আরো পুরোন। তাই আমার কথাগুলো মনে করি তোমাদের কাজে লাগবে।

তিনজনেই এবার প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল, শুধু কথায় নয়, গাইড হয়ে থাকবেন আমাদের আপনি। সরকারী কাজ থেকে নিষ্কৃতি পেলেও মোহন মিত্র ঐ অঞ্চলেই এক চায়না-ক্লে মাইন্সে ম্যানেজারের চাকুরী নিয়ে থেকে গেলেন। তাঁর মতে, রিটায়ার করে চুপ মেরে বসে গেলে তুদিনেই খাটিয়া ধরতে হবে। তারপর রামনাম সত্য হ্যায়। তাই, খেটে চল। যতই খাটিয়া চলিবে, ততই ঐ খাটিয়া দূরে পলাইবে।

একথায় হেসে উঠল সবাই।

মোহন মিত্র বললেন, আর একটা কথা যাবার সময় বলে যাই। সবাই মনে রেখ।

উঠে দাঁড়ালেন মোহন মিত্র।

কিন্তু কথাটা আর বলছেন না দেখে সতীনাথ বলে, কই ? কি বলছিলেন ? বললেন না তো ?

ভাবছি। তোমরা আবার কে কিভাবে নেবে।

বিন্দুলাল বলে, আপনার কথা তো গীতা, মিত্তর সাব। আমাদের জংলী অফ্‌সরদের কাছে গীতা। বলে দিন। আমরাই ফায়দা ওঠাবো।

মোহন মিত্র ছড়িটা তুলে নিলেন।

তারপর ধীরে ধীরে বললেন, ইয়াদ রখ্‌না। ইয়ে জঙ্গল হ্যায়। ইহাঁ বাঘ হ্যায়, ভালু হ্যায়, হাঁথী হ্যায়···, ঔর ··

বলে প্রশ্ন করলেন, ঔর ক্যা ? বলতো বাবাজীরা ?

একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। মৃদু-মৃদু হাসে। মিত্তর সাহেবের প্রশ্নের জবাব ভেবে পায় না।

সতীনাথ বলে, আধকপালী মাথা ধরবে। আপনারও। আমাদেরও। অনুরোধ করছি, শেষ করে যান আপনার কথাটা। ঔর কি ?

হেসে বলেন মিত্তর সাহেব, ঔরৎ।

হো হো কোরে হেসে ওঠে সবাই একসঙ্গে।

মোহন মিত্র বলেন, হাসির কথা নয় বাবাজীবন। বনেজঙ্গলে কাজ করতে এসেছ, বাঘ ভালু হাতীকে ভয় করবে যেমন, তেমনি ঔরৎ

থেকে দূরে থেক। নইলে এই আমার মত স্ট্যাগ্-নাণ্ট পুল্ হয়ে বিদেয় নিতে হবে।

কথাটা তাহলে খুলেই বলি। মেডিক্যাল গ্রাউণ্ডে ছুটি নিয়ে বাড়ী চলে গেলাম একবার। একস্‌টেনশনের পর একস্‌টেনশন চালিয়ে যখন নিজে হয়রান হলাম, ফিরে এসে ডিউটি জয়েন করার আগে বড় অপিসে রিপোর্ট করতে গেলে সাহেব বললেন, কি মিত্তির তুমি মরনি ?

মুখের ডগায় কথাটা সাঁ করে ছুটে এল। আটকাতে পারলাম না। বলে ফেললাম, Excuse me sir, there are hundreds of young girls in Singbhum forests, all between sixteen and twenty, who were praying for my life. So the desire of a few like you sir, could not be granted by God. কথাটা বলে ফেলেই বেরিয়ে গেলাম। ওপরওয়ালার মুখের কি landscape change হোল ফিরেও দেখলাম না। কিন্তু ঐ যে আগেই বলেছি এসব did not pay in the long run. তাই, যেমন বাঘ ভালু হাঁথী, তেমনি তিন 'ডবলু'। water, wine and women. সাবধান। আজ চলি।

আর অপেক্ষা না করে বিখ্যাত রেঞ্জ অফিসার সত্যি করেই বিদায় নিলেন। আবার ফিরে-ফিরে চাইলেন রেঞ্জ অফিসটার দিকে। থমকে দাঁড়ান। চেয়ে দেখেন। আবার ধীরপদে এগিয়ে যান।

দৃষ্টিপথ থেকে মোহন মিত্র মিলিয়ে গেলে, সেইদিকে চেয়ে পাইপের ধোঁয়া আস্তে আস্তে ছেড়ে সতীনাথ নিচুগলায় বলে, আশ্চর্য মানুষ !

বিন্দুলাল আর দিগম্বর প্রসাদও একসঙ্গে বলে, সত্যিই আশ্চর্য। এত ভাল মানুষ, এমন চোস্ত কাজের অফিসার, তবু জীবনে উন্নতি করতে পারলেন না।

বিন্দুলাল বলে, ওঁর সব কথা শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়। ঠিক যেন মহাদেব। যেমন শান্ত, তেমনি রাগী।

সতীনাথ বলে, বড় অপিসে প্রথম গিয়েই সব শুনেছি। সবাই বলেছেন, যাঁর-হাত থেকে চার্জ নিতে যাচ্ছেন, তিনি একটি চীজ। খোদার বিস্ময়কর এক সৃষ্টি, বলেছিলেন তাহির হুসেন ড্রাফ্‌ট্‌সম্যান।

তিন বন্ধুতে জাঁকিয়ে আবার বসলেন।

বিজলা টেবিলে চা রেখে গেল।

বিন্দুলাল সিগারেট ধরিয়ে বলে, যাই বলো ভাই, মিত্তর সাহেব সাবেকী লোক হলেও, মনটা তাঁর এভারগ্রীনই রয়ে গেল।

দিগম্বর বলল, দেখছ না, রিটায়ার করেও বসে থাকবেন না। তিন মাসের প্রিপেটরি লীভ শেষ হলেই ফ্রান্সিস সাহেবদের চায়না-ক্লেতে যোগ দেবেন, এজ্‌ ম্যানেজার। সমস্ত বন্দোবস্ত আগে থেকেই করে রেখেছেন। কোম্পানী ওঁকে একটা গাড়ীও দেবে শুনেছি। বনজঙ্গলে চাকরী করতে এসে ভদ্রলোক বনজঙ্গলের ফাঁদে পড়েছেন। ভালবেসে ফেলেছেন। ছেড়ে যেতে পারলেন না।

হ্যাঁ, নিজের বাড়ীও করে ফেললেন এখানেই। যেদিন প্রথম মেইন সড়কে বাস থেকে নামি, দেখি ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। নামতেই বললেন, তুমি রায়? নতুন রেঞ্জার? অবাক হলাম। সঙ্গে করে নিয়ে এসে বললেন, এই দেখ, তোমার কোয়ার্টার খালি করে ধুয়ে-পুঁছে রেখেছি। তোমার কোন অসুবিধে হবে না। দুটো দিন বিশ্রাম নাও। তারপর কাগজ পত্র তৈরী করা যাবে। তাছাড়া, পাশেই তো রইলাম। ছেড়ে যেতে পারলাম না। জংগলে ঢোকাও যেমন শক্ত, বেরিয়ে যাওয়াও তেমনি কঠিন। বলে হাসতে লাগলেন।

সতীনাথ আবার পাইপ ধরায়।

বিন্দু বলে, তুমি বড় লাকি রায় ভাইয়া। প্রথম চার্জেই মেজর রেঞ্জ।

সতীনাথ নিঃশব্দে হাসে।

বিন্দুলাল আর দিগম্বরপ্রসাদ এ অঞ্চলের আরো দুটো কাছের রেঞ্জে রয়েছে প্রায় তিনবছর। বেশ সপ্রতিভ। চালাক চতুর। মিত্র সাহেবই খবর পাঠিয়ে ডেকে এনেছিলেন, নতুন রেঞ্জারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে।

ঝালুকপোখরের চার্জে থাকাকালীন অবসর কাটাতে মোহন মিত্র যেতেন সোনডিমরা আর ঝিকপানিতে। বিন্দুলাল আর দিগম্বরের কাছে। তাই বিদায় নেবার দিন সংবাদ পাঠিয়ে দুই রেঞ্জারকে জানালেন, আসতেই হবে সেদিন। সতীনাথের সঙ্গে পরিচয়টা তাঁর মাধ্যমেই হয়ে যাক, এই তাঁর ইচ্ছে।

বাসের সময় হতেই তিনজন মেঠোপথ দিয়ে বড় রাস্তায় এসে পৌঁছল। সতীনাথ কথা দিল, সে যাবে ওদের কাছে। ওরাও কথা দিল, সময় পেলেই ঝালুকপোখর আসবে।

ফিরে এসে আরাম কুর্সীটায় গা এলিয়ে দিল সতীনাথ। মনের মত করে পাইপ সেজে নতুন করে ধরাল।

কোথায় ডেরাডুনের ইণ্ডিয়ান ফরেস্ট কলেজ, কোথায় ঝালুকপোখরের এই বনাঞ্চল!

তবু মোহন মিত্রের মত একজন মানুষ রইলেন কাছে। রইল সোনডিমরা আর ঝিকপানির যোগসূত্র।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে থাকে সতীনাথ।

বিকেল আর সন্ধ্যার মাঝামাঝি সময়টা।

তবু ঝালুকপোখরের এই অরণ্য অঞ্চল একেবারে নিস্তব্ধ নিঝুম। কিছুক্ষণ আগে রেঞ্জকম্পাউণ্ডে মানুষের কিছু আসা-যাওয়া, মোহন মিত্রের সরস উক্তি আর বিন্দুলাল-দিগম্বরের কলহাস্য যেন সতীনাথকে তবু ভুলিয়ে রেখেছিল, সে গোটা দুনিয়া থেকে আজ বিচ্ছিন্ন। নিজের কাছে নিজে একেবারে একা। আজ থেকে এই-ই তার জীবন। নিঃসঙ্গতাই-তার একমাত্র সঙ্গী। গার্ডআরদালিদের নিজস্ব যে গণ্ডী এই কম্পাউণ্ডের দূরের একপাশে, সেখানে সতীনাথের প্রবেশ নিষেধ। তারা ওখানে সংসার পেতে বসেছে। সম্ভ্রম তাকে অনেক দূরে ঠেকিয়ে রাখবে ওদের কাছ থেকে। সেবা আর সেলাম পাবার অধিকারী সে ওদের কাছে। আর কিছু না। মনের কথা নিজের কাছে ভিন্ন এখানে বলার আর কেউ রইল না। কথায় কথায় মিত্র সাহেবের কাছে ছুটে যাওয়া সম্ভব কি?

কিছুক্ষণ আগেই দূরের কোন জঙ্গলে ঠিকাদারের লোকেরা কাঠ কাঠছিল। কুড়ুলের খটাংখট শব্দ বনরাজ্যের এই নিস্তব্ধতাকে বারবার ভেঙেভেঙে ভিরোলের ঐ পাহাড়ের গায়ে-গায়ে প্রতিধ্বনি হয়ে মিশে যাচ্ছিল। অপূর্ব শোভায় পশ্চিমের অরণ্যের মাথায় আগুন ছড়িয়ে দিয়ে সূর্যদেব সবেমাত্র বিদায় নিয়ে গেলেন। ধীরে ধীরে সে আগুনের ছোঁয়াও মিলিয়ে যায়। ঘন অন্ধকার গ্রাস করে চলেছে একের পর এক এলাকা। এ যেন অরণ্যের মাথায় আলো-আঁধারের লুকোচুরি খেলা। শেষ রক্তচ্ছটার পেছনে ছুটে চলেছে সর্বগ্রাসী আঁধারের ঐ কালো। বিকেল থেকে সন্ধ্যে, সন্ধ্যে থেকে রাত,—এ-তো সবখানেই হয়। কিন্তু এখানে এমন গভীর রেখাপাত করে যায় কেন রং বদলের পালা? এমন করে তো আলোর পেছনে আঁধারের ছুটে-চলার খেলা সতীনাথ আর কোথাও দেখেনি।

একমনে চেয়ে চেয়ে দেখে সতীনাথ। পাইপ মুখে দিয়ে চেয়ে-চেয়ে দেখে। অপূর্ব লাগে তার।

বনপথের শুকনো পাতার রাশি চূর্ণ-করতে করতে অদ্ভুত এক শব্দের শিহরণ-জাগিয়ে শালকাঠ বোঝাই সেই ট্রাকটা নালা খাদ পার হয়ে যেন কাতরাতে কাতরাতে জঙ্গলের সীমানা পেরিয়ে রাস্তায় উঠে গেল। একপাল বনমোরগ উড়ে পালালো সেই শব্দের তাড়নায়। ট্রাকের মাথায় কাঠের বোঝার ওপর রেজাকুলিদের গানের একটা সুর শেষবারের মত ছুঁয়ে গেল গাছের পাতাগুলোকে। কাঁপন লেগে রইল পাতার শিরায় শিরায় অনেকক্ষণ।

ব্যস্। তারপর সব চুপচাপ। ভয়াবহ এক নিস্তব্ধতা নিঃশব্দতা গ্রাস করে ফেলল ঝালুকপোখরের এই বনাঞ্চল।

শুক্‌নো একটা পাতা খসে পড়ার শব্দও যেন চমকে দেয় মানুষকে তখন।

বিজলা একটা পেট্রোম্যাক্সের আলো সতীনাথের সামনে টেবিলের ওপর দিয়ে গেল।

কতক্ষণ এমনিভাবে বসেছিল সতীনাথ, তার মনে নেই। ঝালুকপোখরের বনরাজ্য থেকে মন তখন তার উধাও হয়ে গেছে পশ্চিমের এক আধাবিখ্যাত শহরে। যেখানে তার সব স্মৃতিচিহ্নগুলো তখনো হয়তো একেবারে মুছে নিঃশেষ হয়ে যায় নি।

বিজলা পেছনে এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল।

সতীনাথ নিজের মনে তখন ডুব দিয়ে দশ বারোটা বছর পেরিয়ে গিয়ে পৌঁছে গেছে তার আরেক জীবনে। যে জীবন থেকে আজকের এই জীবনকে তখন একেবারেই দেখা সম্ভব ছিল না। অথচ আজ এই-জীবনের প্রথম সোপানে পা দিয়েও যেন, অস্পষ্ট হলেও, সে জীবনের অনেক অলিগলির অনেক ছবি দেখা যায়। দেখা যাচ্ছে।

বিজলা নিচুগলায় ডাক দিলে, সাব।

অপেক্ষা করে রইল কিছুক্ষণ।

আদেশ হোল, সব কিছু কোয়ার্টারের ভেতরে নিয়ে চল।

সেখানে গিয়ে দেখল সতীনাথ, নেয়ারের খাটে সুন্দর করে তার বিছানা পাতা। পাজামা রাখা একপাশে। নিচে পায়ের কাছে স্লিপার জোড়া। ধূপকাটির গোছা জ্বলছে কোণের একটা টেবিলে।

আজ যে ক'দিন সে এসেছে, এ ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হয় নি।

পুরোনো সাহেব গিয়ে নতুন সাহেব এসেছেন।

পুরানো ব্যবস্থা কিন্তু তেমনই রয়ে গেছে। নতুন কিছুতে রূপান্তরিত হয় নি। পরিবর্তন নেই।

সতীনাথ একবার বিজলার দিকে চেয়ে দেখলো। বিজলা মাথা নিচু করে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

একখানা বই বার করে শুয়ে শুয়ে পড়বার চেষ্টা করতে লাগল সতীনাথ। মন বসে না। পুরাতন থেকে যে মন অহরহ পালাই পালাই করে, নতুনের বুকে এসে সহসা সেই মন চট করে বসতে চায় না।

তাই বুঝি মোহন মিত্র বলে গেলেন, মনটাকে জীবন্ত না রাখলে বনেজঙ্গলে চাকরী করতে পারবে না বাবাজীবন। ইয়ে জংগল হ্যায়, ইহাঁ বাঘ হ্যায়, ভালু হ্যায় হাঁথী হ্যায়,...ঔর,...

মনে মনে হাসে সতীনাথ।

অস্পষ্ট ভেসে আসে রান্নাঘর থেকে বিজলা আর শামুর চাপা গলার কথোপকথন।

চোখ জড়িয়ে আসে মাঝে মাঝে সতীনাথের। আবার বুকের ওপর ভাঁজ হয়ে পড়ে থাকা বইটা ক্লান্ত চোখের সামনে তুলে ধরে।

কানে আসে শামু বলছে, খুব সাবধান বিজলা। সাহেব বড় মেজাজী মালুম হচ্ছে। গড়বড় করেছিস কি টোঁটোঁর মত বীটুএ বদলি হয়ে যাবি। তোর নতুন চাকরী। তাই বলছি। আমার আর কি। আরদালিতেই বহাল, আরদালিতেই পিন্‌সিল।

ইংরেজের আমল থেকে সাদা চামড়ার সাহেবদের সঙ্গে কাজ করে আসছে শামু।

বলছে, সব ফেলে সাহেবকে খুশি করা চাই। বরাত ফিরলে ফারোসটোর পর্যন্ত হতে পারিস তুই। নইলে টোঁটোঁ। অসুখে পড়লে খাটিয়া বইবার লোক পাবি না।

আক্ষেপের সুর ধ্বনিত হয়, তারপর।—সারাজীবনটা রান্নাঘর সামলাতে আর মেম-সায়েবদের খিদমত করতেই কেটে গেল। ভাগ্যিভাল নতুন রেঞ্জারের কোন মেমসাহেব দেখছি না।

আবার বলে, ফারোসটোর হবি তুই একদিন। এ আমি বলে দিচ্ছি। আমাদের মত মরতে হবে না তোকে। ···দেতো বিড়িটা সুলগে।

উনুনের আগুনে বিড়ি ধরিয়ে দেয় বোধ হয় বিজলা। সরোষ টানের সরস শব্দ ভেসে আসে। বেশ জোরালো।

—ফারোসটোর হবি বিজলা? বল?

—ধ্যাৎ।

বিশ্বাস হোল না? নাপুংগুটুর বোদ্‌রো সাহেব কি ছিল? আজ না হয় মাথায় টুপি দিচ্ছে। গাছে নম্বর ঠুকে-ঠুকে হাতে কড়া পড়ে গেছে না? তাওতো বর্ষার সময় ওদের চাকরীই থাকত না। তখন গোটা 'করমা' পরবটা নেচে আর ডিয়াং খেয়ে কাটাতো বেচারা। দেখেছিতো সব নিজের চোখে। এমনি টাম্‌পোরি চাকরী ছিল। কি তরক্কিই করলে লোকটা। আর তোর তো পাকা চাকরী। তুই গার্ড। তোর ভয় কি?

দুই

—তা হয় না মিস্টার সুন্দরম। লোডেড লরী সীজ্‌ করে এমনভাবে রিলিজ্‌ করা সম্ভব নয়।

কাঠ-পিটিয়ে যারা সোনা ঝরায়, তাদের কানে কথাটা মধু ঢালে না। চাপা বিরক্তি প্রকাশ পায় সুন্দরমের চঞ্চলভাবে টাই হাতানোয়। আড়চোখে সতীনাথ লক্ষ্য করে। নির্বিকারভাবে পাইপ ধরিয়ে কিছুক্ষণ অন্যদিকে চেয়ে ধোঁয়া ছড়াতে থাকে।

মাসদুয়েকের মধ্যেই সে বেশ খাপ্‌খাইয়ে নিয়েছে নিজেকে। কেমন যেন ভালবেসে ফেলেছে বালুকপোখরের এই বনাঞ্চলকে। দূরে দূরে বনবাসীদের গ্রাম। যেন ছিটিয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সীমাহীন সমুদ্রের বুকে এখানে ওখানে গুটিকয়েক নৌকো! চারিদিকে অথৈ জলরাশীর মত শুধু জমাট জঙ্গল। কে কার মাথা ছাড়িয়ে আকাশের বুক ছুঁয়ে ফেলবে, তারই প্রতিযোগিতায় যেন প্রতিটি শালবৃক্ষ বুকফুলিয়ে মাথা উঁচিয়ে উঠছে। গহন সে অরণ্যের মাঝে সূর্য্যি দেবও উঁকি মারতে ভয় পায়। পায়ে চলার পথ-

চিহ্ন বারবার হারিয়ে গেছে ভেজাপাতার স্তূপের মাঝে। খসে যখন পড়েছিল, ওরা ছিল জীর্ণ। শুকনো। রোদের মুখ না দেখে শিশিরে ভিজেভিজে গলে-গলে গেছে কোথাও। কেমন একটা ভাপা গন্ধ ছড়িয়ে থাকে। রাত্রে পাওয়া যায় না। তখন শালফুলের মিষ্টি হাল্‌কা গন্ধ ভাসতে থাকে সারাটা অঞ্চল জুড়ে।

সতীনাথ টেনে টেনে নিঃশ্বাসে ভরে নেয় সেই হালকা মিষ্টি গন্ধ। ভোর রাতে সে-গন্ধ রেঞ্জ কম্পাউণ্ড পর্যন্ত অতি সন্তর্পণে এগিয়ে এসে সব কিছুকে ছেয়ে ফেলে। ঘেরা বারান্দাটায় ঘরের দরজা খুলে প্রথম পা দিলেই জড়িয়ে ধরে সেই সুবাস। সতীনাথ রেলিংটা ধরে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকে। সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করে, সে আছে। ততক্ষণে তিরোলের পাহাড়টা একটু যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবাধ্য যে ক'টা তারা তখনো রাতের আকাশের বুক আঁকড়ে জেগে থাকার শেষ চেষ্টা করতে থাকে, তারাও যেন ডুব দেয়। কোথায় কে জানে। বনমোরগের ডাকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গাঁয়ের মোরগরা চীৎকার জুড়ে দেয়। শব্দের পৃথিবী এমনি করেই ধীরে ধীরে জেগে ওঠে।

অদ্ভূত লাগে। চারিদিকে যখন সূর্যের তরল আলো গলে-গলে পড়তে থাকে, সোনালী আভায় সেজে ওঠে আর সব কিছু, তখনো বনাঞ্চলের ভেতরে জমাট অন্ধকার। আরো অনেক পরে কুয়াশার মত ভেঙে-ভেঙে যায়। আবার শুরু হয় আলো-আঁধারির লুকোচুরি খেলা।

যেমন সন্ধ্যায়। তেমনি সকালে।

অদ্ভুত লাগে।

সতীনাথ বুকভরে নিঃশ্বাস নেয়। দুচোখ ভরে দেখে। মোহন মিত্র অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

জীবন্ত প্রাণ নইলে বনেজঙ্গলে চাকরী করা সম্ভব নয়।

মরা মন দুদিনেই ক্লান্ত হবে। হারিয়ে যাবে। অবাধ্য ভোরের তারার মত হঠাৎ কোথায় ডুব দেবে, কে জানে।

মুরদা দিল্‌-এর জন্যে অরণ্য নয়।

অরণ্যের সব কিছুই জীবন্ত।

আলো অন্ধকার সব। সবকিছু।

মিস্টার সুন্দরম ধীরে ধীরে বাংলায় নেমে আসেন।

এতক্ষণ ইংরাজীতেই হচ্ছিল কথাবার্তা।

সতীনাথের ইংরাজী জবাবগুলো ধমকের মত শোনায় যেন।

মোলায়েম বাংলায় জবাব মোলায়েম ভাবেই দেয় সতীনাথ।

—তা হয় না মিস্টার সুন্দরম। তা হয় না।

সুন্দরম বলে, একটু কিন্তু-কিন্তু করেই বলে,—দেখুন, আমরা এদিকে গত চল্লিশবছর ধরে ঠিকেদারী করছি। কারবার করছি।

সতীনাথ উত্তর দেয় না।

সাহস পেয়ে আবার বলে সুন্দরম্,—পুরোনো কোম্পানী। কোনো বিদিশী ফার্মের চেয়ে ছোট নয়।

সতীনাথ এবার চোখ তুলে চায় সুন্দরমের দিকে।

বলে, জানি।

—তাই বলছিলাম, বদনাম হয়ে যাবে। চল্লিশ বছর···। তাকে বাধা দিয়ে সতীনাথ এবার বলে ওঠে, আগেকার সে চল্লিশ বছরের হিসেবটা ভুলে যান মিস্টার সুন্দরম। আজ থেকে নতুন বছর গুনুন।

কথাটা বলেই উঠে দাঁড়ায় সতীনাথ।

অনন্যোপায় সুন্দরমও উঠে দাঁড়ায়।

বলে, আচ্ছা, তাহলে আজ আসি।···

নিশ্চয়ই।

তাহলে মিস্টার বোসকেও এই কথাই গিয়ে বলব ?···

নিশ্চয়ই।

মিস্টার সুন্দরম জীপে গিয়ে উঠল! এদিকে আর ফিরে চাইল না।

সবেমাত্র জঙ্গল থেকে ফিরেছে সতীনাথ।

খাকীর পোষাক ঘামে ভিজে গেছে। দীর্ঘ সুপুরুষ চেহারা। সারাদিনের পরিশ্রমে আর রৌদ্রতাপে, রক্তরাঙা হয়ে উঠেছে। সারাটা দিন আজ খুবই পরিশ্রম গেছে। বারবার পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই ভেঙে ভেঙে বেশ ক্লান্ত হয়েছে সতীনাথ। কিন্তু কাজটা শেষ না করে ফিরতে পারল না।

কি স্পর্দ্ধা! নোটের গোছা ছুঁড়ে মুখ বন্ধ করবে, বিলিতি মদের ছুটো বোতল দিয়ে কিস্তিমাৎ করবে আর বেআইনী কাঠ কেটে জঙ্গল উজাড় করে

টাকার পাহাড় গড়বে কাঁচ-বাংলার মালিক ! সে আর চলবে না। ব্যবসা আর চুরির মধ্যে কোন পার্থক্য যারা রাখে না, তাদের ব্যবসাদার বলে সম্মান আর যারাই করুক, সতীনাথ পারবে না। বিশহাজারী গাড়ী চড়ে এলেও না। ওদের সঙ্গে আরো সবাই বুঝুক, এ অঞ্চলের গাছগুলোর শেকড় এখন বড় শক্ত। মাটির অনেক নিচে তাদের নিরাপদ আশ্রয়।

তাই সুন্দরমকে সোজা কথা স্পষ্ট করেই বলে দিলে সতীনাথ। চুরির মাল আটক করাই আইন। তাকে 'ছাড়' দেওয়া বে-আইনী।

কালো ছিপছিপে ওঁরাও ছেলে বিজলা। লক্ষ্য করছিল। আজ সাহেবের মেজাজ সুবিধের নেই। তার ওপর বোস কোম্পানীর 'সুন্দরি সাহেব' খামখা চটিয়ে দিয়ে গেল।

সে বেচারা বারবার উর্দীর বোতাম, পেটি-পাগড়ী ছুঁয়ে ছুঁয়ে পরীক্ষা করে দেখে নিল, সব দুরস্ত্ আছে কি না।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে জানাল, গোসোলের ঠাণ্ডা-গরম পানি তৈয়ার।

চায়ের কাপটা শেষ করে উঠে গেল সতীনাথ।

বিজলা টেবিলের ওপর থেকে বন্দুকটা তুলে নিয়ে গিয়ে উঠল কোয়ার্টারের বারান্দায়।

মোটরপথের ওপর আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল জনা তিনেক বনরক্ষী। সুন্দরমের জীপ এগিয়ে আসতেই তারা সালাম জানিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল।

গাড়ী থামিয়ে সুন্দরম মুখ বাড়িয়ে ভেতর থেকেই বলল, লজ্জা করে না তোদের ? লরীভর্তি মাল আটকাবি, আবার বক্‌শিসের জন্যে হাত পাতবি ? পথ ছাড় ছুচুর দল সব।

বনরক্ষীরা এতদিন সুন্দরম সাহেবের হাসি আর নোটের মারফৎ স্নেহের পরশই পেয়ে এসেছে। সহসা সেই সুন্দরম সাহেব এমন রুক্ষ মেজাজে কথা বলবে, ভাবতেই পারেনি ওরা। থতমত খেয়ে একজন বলে, সুন্দরি সাব, আমাদের দোষটা কোথায়, বাতলে দিন ? লরী তো আর আমরা ধরিনি, খোদ্ সায়েব নিজে ধরেছেন।

সুন্দরম বলে, যে-ই ধরুক, মাল তো আমার আটকালো। সদরে কেস গেলে বদনাম তো হবে। বোস সাহেব জানলে চাকরি থাকবে আমার ?

সহিবাৎ। সহিবাৎ। কিন্তু আমাদের কৌন গুনাহ্ আছে বলুন ?

রাগতভাবে বলে সুন্দরম, কিছু বলবার দরকার নেই। তোদের বড়া সাহেবকে বলে দিস। কাঁচ-বাংলার সঙ্গে টক্কর লাগিয়ে বেশি দিন টিকতে পারবেন না। বুঝলি? আজ এক পয়সাও না। শালা ভাগ। ছুছুন্দরের দল। ভাগ।

সশব্দে হর্ণ বাজিয়ে সুন্দরমের জীপখানা ছুটে বেরিয়ে গেল। একজন বনরক্ষী সেই দিকে চেয়ে বলল, উঃ, শালা আস্‌লী হারামী হ্যায়।

তিন

ঔরৎ 'হাকিম, গজব খুদা, বুঝলেন মিস্টার সুন্দরম, it is a curse to be under the rule of a woman. আপনি যতই চেষ্টা করুন, অভিশাপ খণ্ডাবার নয়। যত সতর্ক হয়েই চলুন, গড়িয়ে-গড়িয়ে ঠিক সেই খানা-ডোবায় গিয়ে পড়তেই হবে। কোন নিস্তার নেই। কি করবেন বলুন? অপমান ঝেড়ে-ঝুড়ে ফেলে চাগ্‌রী করুন গে যান।

সুন্দরমকে নিরুত্তর দেখে মোহন মিত্র আবার বললেন, আমার কোন উপায় নেই, বুঝলেন। আজকালকার ছেলে ছোক্‌রারা বড্ড তেরিয়া মেজাজের। কে আমার কথা শুনবে? ঐ সতীনাথ? যেটুকু মান সম্মান করে, অন্যায় পয়রবি করতে গিয়ে খুইয়ে বসতে পারব না ভাই।

কিন্তু-কিন্তু করে সুন্দরম বলে, আপনার কথাতো সবাই শোনে—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মোহন মিত্র বলেন, শোনে না, শুনতো। যখন আমার ছ'টা পা ছিল। রিটায়ার করে আর সবাইয়ের মত আমারও এখন মাত্র দুটি পা। বুঝলেন না, সবই চেয়ারের দাপট। ঐ চারপেয়ে শুক্‌নো কাঠের চেয়ারটারই রোয়াব। তারই জোরে সব হুকুম চলে। যে হুকুম চালায় তখন সে নিজের দুটো পা নিয়ে ছয়-পেয়ে এক জাঁদরেল চিজ্‌। সব ঐ চেয়ারের মহিমা। মাথা নত করে থাকে তারই সামনে।

যেই নেমে এলেন, ওমনি সব মুছে গেল এক্তিয়ারের আর হুকুমের কসরৎ। তাই বলি, আমায় দিয়ে আর হবে না কিছু।

সুন্দরম আজ বহুদিন সসম্মানে চাকরী করছে কাঁচবাংলার বিখ্যাত

কোম্পানিতে। এ অঞ্চলের স্বনামধন্য মালিক—ঠিকাদার রাশভারি অবিনাশ বোসের আমল থেকে। ছেলের মত ভালবাসতেন তিনি। প্রায় সব কর্তৃত্ব তখন সুন্দরমের ওপরেই ছিল। মোটা মাইনের বিখ্যাত কোম্পানীর বড় অফিসার। সেই অনুপাতে প্রতাপ গড়ে উঠেছিল এ তল্লাটে। সরকারী চাকুরে বনরক্ষী আর তার ওপরওয়ালারা সমীহ করতেন সুন্দরমকে। প্রয়োজনের অধিকবার সেলাম করত। পাওনা গণ্ডার প্রত্যাশা রাখত সবাই। বিয়ে-শাদী পাল-পরবে কাঁচ বাংলার অকৃপণ দান আসত সুন্দরমের হাত দিয়েই। মোহন মিত্রের আমলে অবশ্য অন্য কথা ছিল। মোহন মিত্র তখন বুঝেছিলেন, সমস্ত দুনিয়ার চরিত্রশুদ্ধির দায়দায়িত্ব একা তাঁরই উপর ছেড়ে দেওয়া নেই। এইটুকু বুঝতে অনেক মাশুল তাঁকেও দিতে হয়েছিল, সেকথাও ঠিক। নতুন জীবনে তিনিও চাবুক হাতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন, সব বেইমান আর ইতরদের সায়েস্তা করবেন সঙ্কল্প নিয়ে। তাই মেডিক্যাল লীভ্ নিয়ে হয়রান হয়ে যখন সদর অপিসে জয়েন করতে গেলে সাহেব বলেছিলেন, মিত্তির তুমি মরনি? মোহন মিত্র সটান মুখের ওপর বলে দিতে সেদিন পেরেছিলেন, সিংভূম অরণ্যে ষোল থেকে কুড়ি বছরের শতশত যুবতী যখন তার জীবনের জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছে, তখন সে মরে কি করে? আজ হলে জবাব তাঁর হোত ভিন্ন ধরনের।

কাঁচ বাংলাই হোক, কি স্বরূপ চাঁদ এণ্ড কোং-ই হোক, চাকুরী জীবনের অপরাহ্ন বেলায় ঝালুকপোখরে এসে মোহন মিত্র চোখ বুজে থাকতেন। বুঝেছিলেন, মহা অরণ্যের স্রষ্টা যিনি, তিনি যদি স্বয়ং ঠিকাদারের কুড়ুল চেপে না ধরেন ধ্বংসের হাত থেকে অরণ্য বাঁচাতে, তবে দায় পড়েছে তাঁর রোজ রোজ লাঠালাঠি করে ব্লাডপ্রেসার বাড়াবার ঝুঁকি নিতে। হেসে-খেলে হৈ-চৈ করে ঝালুকপোখরের দিনগুলো তিনি শত্রুসৃষ্টি না-করে নিরুদ্বেগে কাটিয়ে দিয়ে অবসর নিয়েছেন। একেবারে চারপাই ধরলে রামনাম সত্য হ্যায়-এর দিন এগিয়ে আসবে। তাই খাটুনির মধ্যে ব্যস্ত থাকতে বেসরকারী নতুন কাজটা গছে গিয়েছেন।

কারণ অবশ্য আরো একটা ছিল।

অরণ্য আর অরণ্যবাসীদের হৃদয়ে একবার যে কোন কারণে আসন করে নিতে পারলে তাদের ছেড়ে যাওয়া শেষ কালটায় আর তত সহজ থাকে না।

মোহন মিত্রের জীবনেও অরণ্য ত্যাগ করে চলে যাওয়া সম্ভব হয়নি। পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরে অরণ্যের পরিচিত পথ। পাকে পাকে বাঁধে বিশাল অরণ্যের রহস্যাবৃত মায়া। সামান্য একটা লতার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে মনে হয় কথা কয় সে। কত কালের পরিচয় তার সঙ্গে। নাম-না-জানা পাখীর ঝাঁক যেন চীৎকার করে প্রতিবাদ করে, না-না-না, যেতে দেব না। দেব না।

এক ডাল থেকে ভিন্ন ডালে ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করে পথ আগলায় লাল ঠোঁটের টিয়ার ঝাঁক। বড় বড় চোখে তাকায় ফিরে ফিরে বারে বার।

সুন্দরমদের গাছকে কবিতা ভাবলে চলবে না। Nature's loveliest poem is a tree ভাবলে সেই গাছ পিটিয়ে সোনা ঝরানো দুষ্কর হত তাদের। তাই তারা কুড়ুল তুলে নিয়েছে হাতে। বাইরের সভ্য জগতের দৈনন্দিন নানা প্রয়োজন মেটাতেও বটে, কাঁচবাংলার মত লক্ষ্মীঠাকুরানীর জেলখানা তৈরী করতেও বটে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সংহার তাই অনিবার্য ওদের কাছে।

সতীনাথের মত বেয়াড়া মানুষ পথরোধ করে দাঁড়ায় কিসের জোরে? সরকারী ক্ষমতাটুকুর জোরে?

কাঁচবাংলার কর্তৃত্বের আসনে আজ যিনি সমাসীনা, তিনি বিশ্রীভাবে বলেছেন, তুমি স্ত্রীলোকের মত আমার সামনে এসে কাঁদুনী গাইছ সুন্দরম?

তবে নিজেকে কি তিনি স্ত্রীলোক বলে স্বীকার করেন না? অক্ষমতার কাঁদুনী গাইবার একমাত্র উপযুক্ত জীব যদি স্ত্রীলোকই হয়, তিনি নিজে তবে পুরুষ? স্ত্রীলোক নন?

হয়তো নন। নইলে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী রাশভারি অবিনাশের পুত্র শেখরচাঁদকে সরিয়ে দিয়ে কর্তৃত্বের আসনে গিয়ে বসলেন কি করে?

মানলাম শেখর ছোট ভাই। কিন্তু শিশু নয়তো সে। বড়দিদির শাসন সে ব্যবসাক্ষেত্রেও মেনে নিয়ে নির্বাক হয়ে তাঁর জন্যে পথ করে দিয়ে সরে দাঁড়াল কেন? না হলে নারীর কাছে অক্ষমতার জন্য তিরস্কার আজ গর্বিত সুন্দরমকে সহ্য করতে হোত না। এমন করে তাকে মাটিতে মিশিয়ে দিত না।

ঠিকই বলেছেন মোহন মিত্র, it is a curse to be under the rule of a woman.

চার

মধুবন-এর উপকথায় তার পুরোন ইতিহাসটা এখানে মোটেই অবান্তর নয়। এ অঞ্চলে বাহির থেকে তিন রকমের বা তিন শ্রেণীর মানুষ আসে। ঠিকাদার, মহাজন আর চাকুরিজীবী। সরকারী চাকুরী আর ঠিকাদারের চাকুরী, প্রায় একই জিনিষ। আর আসে খনি অঞ্চলের ইজারাদার। তাদের ঠিকাদারই বলি। ঐ একই শ্রেণীর তারা। বনাঞ্চলে মাটির নিচে আছে বেরিল পাথর, চীনে মাটি, আয়রনওর, আছে কপার মাইন্স। পাহাড়ের গায়ে গায়ে পরতে-পরতে আরো কত সম্পদ। কয়লা-অভ্র-সাদা মাটি। আরো কত কি। বনাঞ্চলের অভ্যন্তরে এই সব খনিজ সম্পদ আহরণের ছাড়পত্র আগে দেবে বন বিভাগ, তারপর আসে খনি বিভাগ। মাটির ওপর গাছপালা আহরণের যেমন হুকুম আবশ্যক, তেমনি মাটির নিচের সম্পদ আহরণেরও। ইজারাদার আর ঠিকাদার তাই একই শ্রেণীর। মহাজনের অবশ্য অন্য ভূমিকা। চাকুরিয়াদেরও আরেক। উদ্দেশ্য সকলেরই এক—অর্থ উপার্জন। বনাঞ্চলের আর এক সম্পদ তার মানুষ। কাঠ আর খনিজ সম্পদ যেমন সহজলভ্য, এ অঞ্চলের মানুষও ঠিক তাই। সহজ। সস্তা।

বনাঞ্চলে একটিমাত্র উদ্দেশ্যে যখন উপরোক্ত তিনটি শ্রেণীর জীবের আগমন, তারা কেউ-ই এখানে স্থায়ী সংসার পাততে আসে না। অথচ থাকতে গেলে তাদের যেমন-তেমন একটা কিছু সংসারের আবশ্যক হয়। কেননা স্বেচ্ছায় বনবাস নিয়ে কেউ আসে না। বনজঙ্গলে পালিয়ে এসে নিস্তারও নেই কারো। মুনি ঋষির সংখ্যা আর আগের মত নেই। থাকলেও সাধনার স্থান ও পদ্ধতি তাদের বদল হয়ে গেছে। বনাঞ্চলের স্থান নেই সে সাধনায়। সে নব সাধনার স্থান নিয়েছে রাজধানী শহরগুলো। কিন্তু যারা আসে, অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে আসে, তারা বাধ্য হয়েই সাজিয়ে বসে খেলা ঘরের সংসার। সে খেলাঘরের উপকরণ এই সস্তা সহজ মানুষ। যারা সরল, অথচ বেঁকে বসলে একেবারে সর্বনাশা। সাংঘাতিক।

তাদেরই নিয়ে জমে ওঠে অরণ্য অঞ্চলে সম্পদ আহরণের পালা। জমে ওঠে মিথ্যা-সাজানো সংসারের খেলা।

বাইরের সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, আমাদের চিরপরিচিত গ্রাম নগরের গতানুগতিক জীবনের আড়ালে এই বনজীবনে এসে তেমন একটু-আধটু ঘরপাতা-পাতির খেলায় প্রায় সবাই হাতমক্স করে থাকেন। অবিশ্যি বাইরে ফিরে গিয়ে তাঁরা'ই আবার শান্ত-ভদ্র জীবন গ্রহণ করে নিতান্ত সুবোধ বালকের মত স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে নিরুদ্বেগে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিয়ে কর্তব্যনিষ্ঠা আর ধর্মপরায়ণতার কত সুনামই না-জানি অর্জন করে অমরত্ব লাভ করে থাকেন।

তাই বলে কি কোথাও কোন ব্যতিক্রম নেই?

হয়তো আছে।

যে কোন কর্ম উপলক্ষ্যে যে কোন মানুষ ঘর ছেড়ে অরণ্যে এলেই যে এমনি করে তাকে মিছে-সংসার পেতে বসতেই হবে, তেমন কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। তবে যারা বসে, তাদেরও তেমন কেউ মন্দ বলে না। দোষারোপ করে না। কলঙ্ক বলে কোন কথা নেই তাদের অভিধানে, বনজীবনে।

এ যেন অতি সহজ সাধারণ একটা বিষয়, যা কোন সমালোচনার, কোন নিন্দাবাদের অপেক্ষাই রাখে না কোন ক্ষেত্রেই। কারণ, যাদের নিয়ে মিথ্যার এই খেলা, তাদের হয়ে প্রতিবাদ জানাবার কেউ থাকে না। অতি পরিচিতের মহলে প্রথম কানা-কানির পালাটা কিছু হাল্কা প্রশ্নে, সামান্য লঘু তামাসায় প্রায় এমনি করেই শেষ হ'য়—

—শেষে উনিও?

—তাই নাকি? কাকে?

—ওমুক কে।

—কবে থেকে?

—প্রায় মাসখানেক।

—বেশ বেশ। আছেন ভাল।

ব্যস্। ঐ পর্যন্ত।

শহরের পরিচয়ে যে ব্যক্তি অতিবড় শুকদেব, তাঁদের অনেককেই এই দুর্গম বনজঙ্গলে তাই এমনি করে আগা-গোড়া মিথ্যে দিয়ে ফাঁকির ডেরা বাঁধতে

দেখলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকে না। এখানেও থাকে সেই পর্দা, সেই আবরু, সেই অন্দর মহল। অথচ সকলেই বোঝে, এ ঝুঠা-সংসারের আয়ু কত স্বল্প, কত ক্ষণস্থায়ী এই খেলা।

এই খেলার ফলে এদিকে সৃষ্টি হয়ে আছে এক শ্রেণীর নারীর দল। যাদের নিয়ে কত মানুষ যে কতবার এমনি করে সখের খেলাঘর বেঁধেছে, তার কোন হিসেব কোথাও নেই।

ঘর ভেঙে সভ্য জগতের পুরুষের দল, আধুনিক অর্জুনের দল, চলে যায়। পড়ে থাকে বার বার ফেলে-যাওয়া সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নার অতীত অনুভূতিহীন মাটির পুতুলগুলি।—উলুপীর দল!

সত্যিই কি তারা অনুভূতিহীন?

তাই যদি হবে, তবে আবার নতুন খেলাঘরের ডাক এসে পৌঁছলেই নিপুণ হাতে ঘরকন্না সাজায় কেন? নতুন মানুষের সঙ্গে হাসে। কথা কয়। আদর সোহাগ আদায় করে। দেয় তার চতুর্গুণ। সুদে-আসলে পুষিয়ে। পুরোনো মরচে ধরা চাবির গোছা ডোবায় ফেলে দিয়ে জলের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থাকে। তারপর গৃহিণীর মতই আবার নতুন ঘরের চাবির গোছা আঁচলে বেঁধে হাসিমুখে সর্বান্তঃকরণ দিয়ে সংসার করে। নতুন মানুষের জন্মে মঙ্গল প্রার্থনা করে।

কল্যাণ কামনা করে।

এ কেমন করে সম্ভব?

অন্তর বলে, মন বলে কোন পদার্থ সত্যি করেই এদের নেই?

কেবল শরীর? শরীর আর ভোগলিপ্সা? ভোগলিপ্সা আর মাদকতা? এরা কি বার বার ফাঁকির অপমানে কালশিরে-ধরা মন নিয়ে যন্ত্রে পরিণত হয়ে গেছে? নতুন মানুষের জন্মে মঙ্গল প্রার্থনা কল্যাণ কামনা—সবই কি যান্ত্রিক কৌশল?

অনেকে বলেন, এছাড়া তাদের গতি নেই।

বিশ্বাস করা কঠিন। কেননা গভীর জঙ্গলে অন্য পথে আয়ের রাস্তা তো তাদের বন্ধ হয়ে নেই। কাঠের কাজ, খাদের কাজ। কত কাজই তো করে অন্য মেয়েরা। তারাও কত পুরুষের সঙ্গে রঙ্গ করে, নিরুদ্দেশও হয়। আবার ফিরে এসে যে যার কাজে মন দেয়। অর্থ উপার্জন করে। নাচে। ডিমাং

খায়। ভরপুর যৌবনের উন্মাদনা ষোল আনা সব দিক দিয়ে উপভোগ করে।

কিন্তু ওরা সেই সহজ পথে না গিয়ে এক শ্রেণীর মাংস-লোলুপদের ক্ষণস্থায়ী খেলাঘরের মিথ্যা ঘরণী সেজে কেন থাকতে ভালবাসে বার বার পরিত্যক্ত হয়েও ?

কে জানে এ-রহস্যের প্রকৃত কারণ কি।

মনে হয় এটা তাদের ঘর বাঁধাবাঁধি খেলার নেশা।

ঠিক তেমনি নেশা না হলে যেন ওরা বাঁচে না।

তাই ওরা সম্পূর্ণই এক ভিন্ন শ্রেণীর জীব।—উলুপীর দল !

অবিনাশের হয়তো ঠিক এইখানেই ভুল হয়ে থাকবে। নইলে তিনি এমন ধরা পড়ে গেলেন কেন চির জীবনের মত ? অবশ্য তাঁর পাত্রী নির্বাচনেও ভুল থেকে গেছিল। নইলে এমন-টা তো হবার কথা নয়।

কাঁচবাংলার মালিক, অপরিমিত অর্থ-সামর্থ্যের মালিক, সে তল্লাটের ডাক সাইটে শিকারী অবিনাশ, যাকে সসম্মানে প্রণাম জানায় সবাই, কেবল মস্ত ঠিকাদার কোম্পানীর মালিক বলেই নয়,—তিনি যখন শোভারাণীকে নিয়ে এসে কাঁচবাংলায় উঠলেন, তখন এসব কর্মের পরিচিত পদ্ধতির বিপরীত অনুষ্ঠান দেখে প্রথমটা সবাই ভ্রূ-কুঞ্চিত করেছিল।

রাশভারি অবিনাশ ভ্রূক্ষেপও করেন নি। শোভাকে নিয়ে যেমন বনাঞ্চলে তাঁর বিখ্যাত কাঁচবাংলায় দিনাতিপাত করতেন, তেমনি তাকে নিয়ে কলকাতায় নিজ বাড়ীতেও যেতেন। থাকতেন। আবার ফিরে আসতেন। সকলেই জানতেন শোভারাণী অবিনাশের সন্তানের জননী। স্বর্ণলতার মা।

বিহারের অরণ্যসীমা যেখানে উড়িষ্যার বনে গিয়ে মিশেছে সেখানে মানুষের আঁকা রেখা-চিহ্ন প্রকৃতি কিন্তু মেনে নেয় নি। অরণ্যের একটা নিজস্ব তন্ময়তার সাম্রাজ্য আছে। নিরবচ্ছিন্ন বিশালতা ও মায়াময় গভীরতার আকর্ষণ আছে। মানুষের আঁকা কোন সীমারেখাই সে বিশালতাকে ক্ষুদ্র গণ্ডীতে বাঁধতে পারে না, সে গভীরতার তলস্পর্শ করতেও পারে না। তাই, সে রাজ্যে কোন্‌টা বিহারের জঙ্গল আর কোন্‌টা উড়িষ্যার মানচিত্র, একেবারেই বোঝা যায় না। সীমানা পার হয়েছি বোঝা যায় কেবল তখনই, যখন বনশাসন ব্যবস্থা আর ভাষা এসে বাস্তব রূপ নিয়ে সামনে হাজির হয়। এ ছাড়া বনের গহনে আর সব কিছু তেমনি একাকার। সেই নিশ্ছিদ্র নিবিড়তা, সেই কুয়াশা-

স্বপ্ন-মোড়া পাহাড়ের পর পাহাড়, সেই রূপোলি ঝরনার গান, অরণ্যের সেই ধ্যান গম্ভীর মাধুর্যময় রূপ,—সবই এক।

তারই মাঝে অরণ্যের আরেক রূপ যেন প্রকাশ পেতে চায়। সে অরণ্য চঞ্চল, মুখর। সে অরণ্য অবিরত কথা কয়। নিস্তব্ধ নির্জন বনের আঁধারে কান পেতে শোনা যায়, সে অরণ্য কথা কয়। এপার ওপারের সঙ্গে অবিরাম অফুরন্ত কথা কয়ে চলে।

সৃষ্টির আদিকাল থেকে মৌনতার অন্তঃস্থলে যে কথার প্রথম সূচনা, আজো তার শেষ নাই। এপারের অহ্বানে ওপার সাড়া দেয়। নিরন্তর সেখানে প্রকৃতির এই দেয়া-নেয়ার খেলা চলে। তারা কোন মনুষ্যসৃষ্ট সীমা রেখার খবর জানে না, রাখে না।

ধারও ধারে না।

এ মিলনের নিয়মই বুঝি এই।

সেই নিয়মেই ওপারের শোভারাণী এপারের অবিনাশের, দুর্দান্ত অবিনাশের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারে নি।

দুই তরফের সম্পদের তুলনামূলক হিসেবকে বানচাল করে দিয়ে শোভারাণী সেদিন অবিনাশের স্ত্রী রূপে এপারের বিখ্যাত কাঁচবাংলায় এসে উঠল। ওপারের ধনপতি জগন্নাথ পট্টনায়েক কন্যা জামাতাকে আশীর্বাদ জানিয়ে নিশ্চিন্ত মনে গড়গড়ার নল মুখে তুলে নিলেন।

কিন্তু স্বামী-সুখ শোভারাণীর কপালে বেশি দিন সইল না।

স্বর্ণলতার বয়েস তখন কতই হবে? ছয়?

শেখরচাঁদের জন্ম হল। ধুমধামের সঙ্গে কলকাতার বাড়ীতে তার অন্নপ্রাশনও দেওয়া হল ঠিক সময়ে। শোভারাণী ফিরে এল কাঁচবাংলায়। সাধে আহ্লাদে সোহাগে বিশ্বাসে ভরপুর শোভারাণী। অবিনাশ, রাশভারি অবিনাশ, আত্মবিশ্বাসী অবিনাশ তখন কেবল গাছ পিটিয়ে সোনা ঝরাচ্ছে না, একের পর এক খাদ ইজারা নিচ্ছে। বনাঞ্চলেই তখন তার দু-দুটো অপিস বাড়ী। কত বাবু, কত অফিসার, কত সাব্‌-ঠিকাদার তখন তার তাঁবে। ঘোড়া ছোটায় অবিনাশ। কাঁধে বন্দুক নিয়ে শিকারে বেরোয়। বাঘের মাথায় মাথায় ঘরের দেয়াল প্রায় ছেয়ে ফেলেছে। সেদিন স্বপ্নেও অবিনাশ ভাবতে পারে নি, হোঁচট খেয়ে হঠাৎ কোথাও বিনা নোটিশে তাকে থামতে হবে।

কিন্তু থামতে হোল।

শোভারানী তার সাজানো হাট ফেলে রেখে একদিন শেষ বিদায় যখন নিল। অবিনাশকে থমকে দাঁড়াতে হোল। চেয়ে দেখল, স্বর্ণলতা, শেখরচাঁদ। সবাইকে অসহায় করে দিয়ে শোভারানী চিরবিদায় নিয়েছে। চিকিৎসার কোন ত্রুটি রাখেনি অবিনাশ। কলকাতা আর কাঁচবাংলা এক করে ছেড়েছিল। তবু শোভারানীকে ধরে রাখা যায় নি। এতখানি নির্ভর করেছিল অবিনাশ তার ওপর, সেকথা বুঝতে পারলে তার মৃত্যুর পর।

সপ্তাহ গেল। মাস গেল। বছর গেল। আত্মবিশ্বাসী রাশভারি অবিনাশ অটল রইল। আত্মীয় স্বজনেরা দলে দলে কলকাতা থেকে আসেন। উপদেশ দেন। আবার বিয়ে কর অবিনাশ।

লাইব্রেরী ঘরে বসে একমনে বইয়ের পাতায় চোখ রেখে শুনে যায় সে। নির্বাক নিরুত্তর।

আত্মীয়রা বলেন, আর কিছু না, বাচ্চা দুটোর দিকে চেয়ে আবার বিয়ে কর অবিনাশ।

এবার অবিনাশ সরব হয়। রাশভারি অবিনাশ স্থিরকণ্ঠে বলে, আপনাদের যাবার দিন সব সুব্যবস্থাই থাকবে। ইচ্ছে করলে টানা গাড়িতেই এখান থেকে আপনারা কলকাতা পর্যন্ত যেতে পারবেন। বড় গাড়িটাই নেবেন! কষ্ট কম হবে।

কাজ, স্বর্ণলতা আর শেখরচাঁদ। এছাড়া অন্য কোন দুনিয়া নেই অবিনাশের। গৃহশিক্ষকে আস্তে আস্তে কাঁচাবাংলা ভরে উঠল। ছেলেমেয়ের নিজের দায়িত্ব নিজেরা নেওয়ার বয়েস হতেই কলকাতায় পড়ালেখা আরম্ভ হোল তাদের। অবিনাশ প্রতিসপ্তাহে কলকাতা পাড়ি দেয়। রাশভারি অবিনাশ, কঠোর পরিশ্রমী অবিনাশ দায়িত্ব এড়াতে জানেনা। কর্তব্য আর দায়িত্ববোধ এক জিনিষ নয়। শুধু কর্তব্য কেমন যেন একটু নিরাশক্তির গন্ধ বয়ে আনে। দায়িত্ববোধে থাকে কিছুটা অন্য আগ্রহ, অন্য আবেগ। অন্ততঃ অবিনাশের তাই মনে হয়।

এই তো, কদিন হোল? তবু মন মানল না। স্টেশনে এসে যখন পৌঁছল অবিনাশ, তখন অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছে।

ছোট স্টেশন। মাস্টারবাবু খাতির করে আরাম চেয়ার বার করিয়ে

দিলেন। কাঁচুমাচু ভাব। ট্রেন লেট্ থাকার জন্মে যেন প্রকারান্তরে তিনিই দায়ী। অথচ কোন সুরাহা করবার ক্ষমতাও তাঁর হাতে না থাকায় তিনি অসহায়।

তেওয়ারীকে কাছে ডেকে বলে অবিনাশ, তোমরা ফিরে যাও। গাড়ী এলে আমি চলে যাব।

তেওয়ারী বিশ্বস্ত লোক। পুরোন কর্মচারী। সাহেবের মতিগতি, প্রয়োজন-ইচ্ছা-রুচি, সবই তার জানা। সফরের কোন্ সময় কোন্ জুতো সাহেবের পায়ে উঠবে, কোন অঞ্চলের সফরে কি কি সঙ্গে যাবে, এমন কি কোন জঙ্গলের শিকারে কোন্ র‍্যাইফেল বা বন্দুক যাবে, সবই তার জানা। নির্ভরশীল মানুষ তেওয়ারী।

সামনে এসে নরমভাবে নিবেদন করে, আমাদের কোন তক্‌লিফ হচ্ছে না হুজুর। আপনাকে তুলে দিয়ে তবে তো আমরা যেতে পারি।

এত বিনয় কেন, অবিনাশ তা বোঝে।

বলে, তোমার সাতদিনের ছুটির হুকুম দিয়ে এসেছি। দেশ থেকে ঘুরে এসো।

তেওয়ারী এখন ঘনঘন দেশে যাবার ছুটি পায়। অন্যান্য কর্মচারীদের ঈর্ষার পাত্র সে।

প্রথম যৌবনে যে ভুল একবার করে বসেছিল তেওয়ারী, হয়তো সে কথা মনে পড়ে তার। মনে পড়ে অবিনাশেরও। অবিনাশই বাঁচিয়েছিল সেবার তাকে। ম্যানেজার তো চাকরীই খতম করে দিয়েছিল। অবিনাশের মনে কি হোল কে জানে। খাস কর্মচারীদের তালিকায় তার নাম দেখে তারপর সকলেই অবাক হয়ে পড়েছিল। কর্তা ইচ্ছা কর্ম। কারো কিছু বলবার ছিল না। তবে তেওয়ারীর দিকে চেয়ে আর পাঁচজন একটু বিরক্তই হোত। লোকটা অন্যায় করেও ইনাম পেল! মনে হিংসা আসবেই অন্যের। মনে হিংসা থাকলে, দেখলে বিরক্তিও জাগবে। তবু তেওয়ারীর তাতে কোন ক্ষতি হোত না। খোদ মালিকের কাছে মানুষ সে।

মুন্সীর কাজে প্রথম ভর্তি হয়েছিল। সে অনেক দিন। বিখ্যাত কাঁচবাংলার ডেপুটি ম্যানেজার এহেন কর্মচারীদের মালিক-দেব্‌তা।

তেওয়ারী ছুটির দরখাস্ত বাড়িয়ে ধরল বছর দুই পরে। প্রথম। লিখেছে,

'ঘর' থেকে তার চিঠি এসেছে, তার নাকি পুত্রসন্তান জন্মলাভ করে বংশরক্ষা করেছে। তাই, মাত্র এক সপ্তাহের ছুটি তার চাই-ই চাই।' ঘর অর্থাৎ দেশ তাকে যেতেই হবে।

ডেপুটি ম্যানেজার অগ্নিশর্মা।

নিশ্চয়ই তুমি বিনা ছুটিতে মাঝে মাঝে পালিয়ে বাড়ি যেতে?

নহি হুজুর।

তবে তোমার ছেলে হোল কি করে?

হামারা নহী হুজুর, লড়কা হমারা ঔরৎকা হুয়া হ্যায়।

ডেপুটি ম্যানেজার চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে চীৎকার করে দারোয়ানকে হুকুম দিলেন, নিকাল দো রাস্কেল কো। আভি নিকাল দো।

তেওয়ারীর দিকে চেয়ে বল্লেন, বিনা ছুটি ঘর ভাগ্‌না তোমার আদৎ। তোমার চাকরী থাকবে না।

কেরাণীবাবুরা বললেন, ধরা পড়ে গেলে তেওয়ারীজী? আরে, ছেলে হওয়ার কথাটা না-ই বা লিখতে দরখাস্তে। এখন বরখাস্ত হয়ে দেশে গিয়ে নিশ্চিন্তে কেবল লেড়কা পয়দা করগে।

চোবে হাতের খৈনীটা গালে ফেলে জিভের সাহায্যে দলাটা যথাস্থানে চালান করে চোখ মটকে বলে, আপনা কেইস্ মজবুত বনা রহা থা। পকড়া গয়া।

ব্যাপারটা অবিনাশের টেবিলে যখন পৌছল তখন হুকুম দেখে সকলে তাজ্জব ব'নে গেল। তেওয়ারী বদলী হল মালিকের নিজস্ব দপ্তরে। এবং অবিনাশের খাস কর্মচারী হিসেবে। অযাচিত ভাবে ছুটিও মঞ্জুর হোল এক মাসের।

স্তম্ভিত হয়ে গেল সবাই।

রাশভারি কঠোর অবিনাশ। অন্যায়কারীকে চিরদিন নির্দয়ভাবে শাস্তিই দিয়ে এসেছে।

কিন্তু একি সৃষ্টিছাড়া হুকুম আজ?

স্টেশনে সাহেবের সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে তেওয়ারীর মন উধাও হয়ে গেছে গাঁয়ের বাড়ীতে। মনের আকাশে ভেসে উঠেছে বিলাসীয়ার মায়ের মুখখানা। আঁট-সাট গড়ন। চঞ্চল, কালো ভোমরার মত দুই উড়ু-উড়ু চোখ। গাঁয়ের লোকে কত কথাই বলে। বলে, ঐ চোখ দুটোই রাক্ষুসী।

কলেজের ছোঁড়ারা তাঁতিলে গাঁয়ে এসে বিলাসীয়ার মায়ের কাছে কাছেই ঘোরে। তেওয়ারী কানে তোলে না। ওরা কি জানবে? বিলাসীয়ার মা তো ওদের জেনানা নয়। তার চেয়ে কে বেশী জানে তাকে? ঐ চোখ দুটোকে সবাই দোষে কিন্তু তার যে ঐ চোখ দুটোই ভাল লাগে, সে কথা তেওয়ারী সবাইকে বোঝাবে কেমন করে?

অবিনাশ চেয়ে আছে তেওয়ারীর দিকে।

লজ্জিত তেওয়ারী চোখ নামিয়ে নেয়।

অবিনাশ নিজেকে ধরে রাখতে পারে না।

রাশভারি অবিনাশ বলে ফেলে, লজ্জা কি?

যার মন কেমন করে না, সে-তো পশু। তুমি ফেরৎ ট্রেনেই চলে যেও।

কৃতজ্ঞতায় মাটিতে মিশে যায় তেওয়ারী।

ঘণ্টা বাজল।

এঁকে বেঁকে পাহাড়ী পথের ঢাল বেয়ে বনজঙ্গলের বেড়া ভেদ করে ছোট লাইনের গাড়ী খেলনার মত ঝিকি-ঝিকি ছুটে আসছে। ঘণ্টা দুয়েক এই খেলনা গাড়ীতে গিয়ে তবে বড় লাইনের গাড়ী ধরে কলকাতা।

ছোট লাইনের ছোট রেল স্টেশন।

কিন্তু অবিনাশ বড় কোম্পানীর বড় মালিক।

তার খাতিরই আলাদা।

কোম্পানীর লোক তো বটেই, স্টেশনের বড় বাবু পর্যন্ত ছুটে এগিয়ে এসে প্রথমশ্রেণীর কামরায় অবিনাশের সব স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দিয়ে বার বার নমস্কার জানিয়ে দূরে সরে দাঁড়াল।

তেওয়ারী পা ছুঁয়ে প্রণাম করে নেমে এল।

গাড়ী ছেড়ে দিলেও সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলল কিছু দুর।

অবিনাশ বলল, আর ভিজো না তোমরা। যাও।

দাঁড়িয়ে পড়ল তেওয়ারী।

কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে তখন চোখ দুটো তার টলটল করছে।

এ পথের প্রথম কয়েকটা স্টেশন বড়ো কাছাকাছি। পূর্ণবেগ ধরবার আগেই মাঝে মাঝে থামতে হয়। চারিদিকে পাহাড় আর জঙ্গল। কিছুটা দুর থেকেও ঠাহর করা চলে না, কোথায় স্টেশন। ডিস্টান্ট্ সিগ্‌নাল পার

হয়ে গেলেও প্রায়ই বোঝা যায় না স্টেশন কতদুর। হঠাৎ একসময় প্ল্যাটফরম আর স্টেশন একসঙ্গে যেন ছুটে এগিয়ে এসে আপনা হতেই নজরে ধরা দেয়। কাঠের চারচালার লাল ছোট্ট ছোট্ট স্টেশন। মাটির বুকে মেশান প্ল্যাটফরম। সেখানে দাঁড়িয়ে নগ্ন, অর্দ্ধনগ্ন বনবাসী শিশুর দল, কেউ পাকা পেয়ারা, কেউ কোনো বুনো মিষ্টি বা টক্ ফল পাতার দোলায় নিয়ে যাত্রীদের চোখের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করছে। জাম, কুল, কাঁটাফল, বড়োাল। কোন হাঁকডাক নেই।

রাজ্যের অন্যসব রেল স্টেশনের চেহারা কিন্তু একেবারে আলাদা। চিলম্ কংকড় আর চা-গ্রীমের চীৎকারে আকাশ কাঁপানো গাড়ীর বাঁশীর শব্দও যেন সেসব স্টেশনে কোথায় তলিয়ে যায়।

এ অঞ্চলের রেল স্টেশনগুলোতে নিঃস্বতা আছে, নোংরামি নেই। এখানে চোখ কান আর মনকে নিমেষে পীড়িত করে তোলে না অবোধ্য অসম্পূর্ণ শব্দের নিরন্তর তীব্র প্রতিযোগিতা।

তেওয়ারীকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।

অবিনাশেরও মন কেমন করে।

স্বর্ণলতা আর শেখরচাঁদ। কলকাতা তাই অহরহ অবিনাশকে ডেকে নিয়ে যায়। যাত্রাপথের দুধারে যতকিছু এলোমেলো ছবি ভেসে ওঠে, দুচোখ ভরে অবিনাশ দেখতে দেখতে চলে।

সব কিছুই ভাল লাগে তার।

এমনি করেই স্বর্ণলতা আর শেখরচাঁদ বড় হল।

কিন্তু অবিনাশ যা ভেবেছিল, তা হল না।

স্বর্ণলতা তেজস্বিনি বটে তবে নারীত্বের অনেক নমনীয়তা যেন ঝরে গেছে তার। একটু কঠোর। প্রয়োজনের চেয়েও যেন একটু বেশী।

মাইলের পর মাইল পাহাড়ী পথে ঘোড়া ছুটিয়েও স্বর্ণলতা ক্লান্ত হয় না। সওয়ার হওয়ার সাধ তার পোষাক-আষাকে ভাবে-ভাষায়, পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট।

স্বর্ণলতা সদাই সজাগ।

শেখরচাঁদকে দেখে চিন্তিত হয় অবিনাশ। মায়ের নমনীয়তা নিয়ে জন্মেছে সে। কিন্তু তার সঙ্গে এমন অলসতা অপটুতা কোথায় পেল? ভাবনা হয় অবিনাশের।

স্বর্ণ পেয়েছে অবিনাশের দৃঢ়তা। কিন্তু যতই হোক, সে তো মেয়ে।

অবিনাশের চিন্তা হয়। চিন্তা হয় কাঁচবাংলার ভবিষ্যত নিয়ে। এই বিখ্যাত কোম্পানী নিয়ে। যেমন করে সব কিছু গড়তে চাইল অবিনাশ, অবিকল ঠিক তেমনটি সব হল না। হয়ত অতিবড় নিপুন শিল্পীরও চিরদিনের আক্ষেপ এমনিতরই হয়ে থাকে। তার থেকে ভগবানও কি রেহাই পেয়েছেন?

আক্ষেপ তো তাঁরও বর্তমান। জীবজগতের চারিদিকে চেয়ে দেখলেই সে সত্য ধরা পড়ে। অতৃপ্ত ঈশ্বর।

একা অবিনাশের আর কতটুকু সাধ্য?

নিজের সাধ্যের গণ্ডীতে কি নিজেকেই ধরে রাখা যায়? যেখানে পরকে নিয়ে কথা, সেখানে তো মানুষ আরো অসহায়। সাধ্যই সেখানে শেষ কথা তো নয়।

ঈশ্বর তাই শুধু অতৃপ্তই নয়, অপরিণতও।

অপূর্ণ।

নিরুপায় ঈশ্বরের মত অবিনাশের জীবনের শেষ দিনকটা কেটেছিল বিশ্রী এক অসহায় বিরক্তি নিয়ে। অব্যক্ত।

স্বর্ণলতা হোল সুলতা।

শেখরচাঁদ শেখরচাঁদই রয়ে গেল।

সুলতার রইল ব্যবসা আর হুকুমৎ।

শেখরচাঁদের, বন্দুক মদ আর অফুরন্ত যৌবন।

শোভারাণী আর অবিনাশ মুছে গেল সব দিক দিয়ে।

পাঁচ

ওসব দিন ভুলে যা বাসব, ভুলে যা। বোকা সেজে মায়া কাড়তে আর পারবি না। আমায় মায়া করে কে দেখ দিকি চেয়ে। চাঁদি ফেটে গেল রোদের ঝালায়। বাজে কথা রাখ। সুদটা বার কর। বাসব তবু অবনত মুখে নির্বাক হয়ে আছে।

তার বুকে কঞ্চির মুখ দিয়ে আঘাত কোরে নিবারণ কুণ্ডু বলে, কিরে, বেঁচে আছিস না মরেছিস? রা কাটিস না কেন?

আরক্ত চোখ দুটো বাসব একবার নিবারণের মুখের ওপর তুলে ধরে।

বল কিছু ? আমার আরো দশ দরজায় যেতে হবে তো। বিরস বদনের নাচ দেখে তো আমার দিন চলবে না বাসব। কিছু বের কর।

বল্লাম তো। ধীরে-ধীরে বলে বাসব।

কই বললি ? যা বললি ওটা কি একটা কথা হোল বাসব ? টাকা ধার দিয়ে তোদের পায়ে তেল মাখিয়ে বেড়াব, আর তুই রেঞ্জার সাহেব দেখাবি ? সে বেটা কি আমাদের ইষ্ট দেব্‌তা। আমি দিলাম তুই নিলি, এর মধ্যে তৃতীয়পক্ষের কথা কেন উঠছে ? নাকি, গালমন্দ আরো দশটা দিতে বাধ্য করে আমার হয়রানি আরো বাড়াবি ?

বাসব বলে, আমার কাছে একটা কড়িও নেই।

লাফিয়ে ওঠে নিবারণ।

নেই বললেই মানব নাকি ? আমার কাছে গুনে গুনে যখন টাকাগুলো গুছিয়ে তুলছিলি, মনে ছিল না, ফেরত দিতে হবে একদিন ?

ছিল।

তবে ?

বাসব আবার নিরুত্তর।

নিবারণ বলে, মনে ছিল। শালা টাটুটাকে একমুঠো খেঁসারি দিতে তো পাঁজরা খুলে যায় আবার জবাব কাটিস ? কড়ি নেই তো মুরগী বেচ। হালের ষোষটা বেচ। টাকা আমার আজ চাই-ই চাই। ভেবেছিস বোবার বালাই নেই। বোকা সাজার চালাকি করে আর ফাঁকি দিতে পারবি না। আজ দেখ কি করি।

—কি হয়েছেরে বাসব ? ভরদুপুরে গাঁয়ে এত চোটপাট কিসের বলত ?

বাসব চেয়ে দেখল পেছনে এগিয়ে আসছে রতন। রতন মাঝি। হাতে তার টাংগি। সারা গায়ে ঘাম ঝরছে। এই বয়েসেও বুকের খাঁজ আর বাহুর পেশী দেখলে মাথায় কাঁচাপাকা চুলের বহর বড় বেয়াড়া বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক। তবে বেমানান নয়। সুঠাম দেহের রতন মাঝির মাথায় ঐ কাঁচাপাকা চুল না থাকলে তাকে মানাতোই না। রতন বলে তাকে চেনাই যেত না। কঠিন পরিশ্রম যেন তার সর্বাঙ্গকে পাথর করে দিয়েছে। কালো পাথরের মানুষ রতন মাঝি।

কি হয়েছে ?

বাসবকে জবাব দিতে হোল না।

নিবারণ কুণ্ডুকে দশ গাঁয়ের মানুষ ভাল করেই চেনে ।

একটানে রতন তার হাত থেকে কঞ্চিটা টেনে নিয়ে দুমড়ে মুচড়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, ঠিক বলেছে হে নিবারণ, বোকা সেজে মায়া বাড়াবার দিন আর নেই। মনে আছে তো, কাঁচ বাংলার মেম সাহেবের ঘোড়ার চাবুকটা কত লিকলিকে কিন্তু চিমড়ে। যেখানে ঘা বসে, বসেই যায়। টেনে তুললে কেমন ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছোটে ? যেন তীর। তাই না নিবারণ ? দেখি তোমার পিঠটা। দাগটা কাঁচা আছে না মিলিয়েছে ?

নিবারণ চিবিয়ে চিবিয়ে উত্তর দেয়, চাবুকের দাগটা মিলিয়ে গেছে রতন। কিন্তু আমার টাকার দাগটা তোমাদের সাতপুরুষেও মেলাবে কি ? চামড়ার ওপরের দাগ একদিন মিলিয়ে যায়, কিন্তু শরীরের রক্তে যে দাগ পড়ে, সে কি চট করে মেলায় ?

মেলায় না নিবারণ। তোমাদের রক্তে আমাদের টাকার কালশিরেটা পড়ে দেখতে শেখ। যুগ যুগ ধরে সুদের নামে যে টাকা গুনে এলাম, তার একটা হিসেব কষো তো গিয়ে। তাহলে আর কঞ্চি হাতে টাটু চেপে ঘোরবার সাহস জাগবে না। বুঝলে ? নয়তো শরীরটা তোমার এখুনি চিরে ফেলে সে দাগ চোখের ওপর মেলে ধরবো।

সত্যিই সময়টা বদলেছে। ধমক দিয়ে চাবুকের ভয় দেখিয়ে আর এদের কাবু করা যাচ্ছে না। আগের দিন হলে নিবারণ আজ শুধু বাসবের ভিটেভেই লাঙ্গল চষে দিত তাই নয়, রতনকেও পিছমোড়া করে বেঁধে ধোঁয়ার কুণ্ডলি রচনা করে দিত চারিদিকে। রতন মাঝি বুদ্ধিতে সাবালক হয়েছে শহরবাজারে গিয়ে। সর্দার সেজে বসে আছে দশ গাঁয়ের। তবু তো কাঠুরে। লাল আলু আর মেথী ছাড়া ওর তো আর কোন চাষও নেই। তবু ঘাড়টা এমন বাঁকা।

তার ওপর কাঁচবাংলার ঐ মেমসাহেব। মাথাটা এদের চিবিয়ে খেলে। আবার মিটিং করে এদের নিয়ে। কাঠ চুরিতেই কাঁচবাংলার যত সাজ। খাটিয়ে নিয়ে এক কড়ি বেশি দেবে, তেমন পেছল হাতও নেই। অথচ মুরুব্বিয়ানা আছে ষোল আনা। এরাও আহাম্মকের বংশধর সব। কাঁচবাংলার

মেম সাহেবই এদের স্বর্গ যেন। আবার এসে জুটেছে এক নতুন ছোকরা। ঝালুকপোখরের রেঞ্জার সাহেব। কাজতো করে জঙ্গলঠেংগানো, নবাবী আর ধরে না। মুখে পাইপ চব্বিশঘণ্টা লেগেই আছে। যেন সৈন্যবাহিনীর মোড়ল। জাহাজের কাপ্তেন। ভাষা শিখিয়েছে সব চোস্তমার্কা। রক্ত, দাগ, কালসিরে, চাবুক, ঘা। আরো কত কি! বাসবরা তবু নিরীহ মানুষ। রত্নাটাই নষ্টের গোড়া।

মোচড়ানো কঞ্চিটার দিকে চেয়ে থাকে নিবারণ কিছুক্ষণ।

বলে সভ্য হয়ে গেলি রতন। বুলিচালি শিখলি ঢের, তবু কুড়ুল ছাড়তে পারলি ?

রতন বলে, মেলা কথা বাড়াবার সময় নেই। টাট্টু চেপে মানে মানে সরে পড়। দেখছিস কুড়ুলের ধার। বনজঙ্গলে আর শেয়ালরাজা মানব না। পালা।

বটে ? টাকাটা ?

হিসেব হবে। দলিল নিয়ে আসিস কাঁচমাংলায়। কার কাছে কত পাবি হিসেব হবে। পাঁচটাকা ঠাকুর্দার আমলে দিয়ে নাতীর ছবিঘে জমি মারবি, এ আর হবে না। জঙ্গলের আইন কানুন এখন আলাদা। যা ভাগ এখান থেকে।

বাসবকে বলে রতন, সামনের হাটে দেখবি কি মজা হয়।

বাসব বলে, কি ?

দেখিস তো।

হাসতে হাসতে বলে, মোরগের লড়াই রে, মোরগের লড়াই।

কথাটা যে নিবারণ কুণ্ডুর উদ্দেশ্যেই রতন বলল, বুঝতে বাকি থাকে না তার।

টাটুটাকে কান ধরে টেনে এনে নিবারণ বলল, আমার মোরগও ভাগড়া, মনে রাখিস।

চড়ে বসল নিবারণ টাট্টু ঘোড়ায়।

কঞ্চির চাবুকটা দুমড়ে মুচড়ে পড়ে আছে অদূরেই। সেদিকে চেয়ে নিয়ে পা দিয়ে টাট্টুর পেটে মৃদু আঘাত করতে করতে বলল নিবারণ, আসিস সামনের হাটে। দেখা হবে।

রতন হাসল শুধু।

ছয়

কিছুকাল আগের ঘটনা হলে বাসরের আঙিনায় আজ রক্তগঙ্গা বয়ে যেত। ঘরদোরে আগুন ধরে যেত। বাসরের লাসটা আগুনে ঝলসে ঐখানেই পড়ে থাকত, নয়, গুম্ হয়ে যেত। পুলিশ রিপোর্টে বলা হোত,—আকস্মিক দুর্ঘটনা। 'মৃত বাসবের অসাবধানতার ফল'।

রতনমাঝির দল কুড়ুল হাতে এমন শক্ত হয়ে দাঁড়াবার কথা চিন্তাই করতে সাহস পেত না নিবারণ কুণ্ডুদের সামনে।

গ্রামে নেমে আসতো ভয়াল নিস্তব্ধতা! খুনের দায়টা কার মাথায় চেপে বসে, এই আতঙ্কে সবাই ঘরে ঘরে আলো নিভিয়ে রাতের অন্ধকারে ফিস্‌ফিসিয়ে বলত, চুপ্! চুপ্। দেওয়ালেরও কান আছে।

অস্পষ্ট হলেও বাসবের মনে পড়ে। এ গাঁয়ে তখন তারা কেউ ছিল না। তিন ক্রোশ দূরের ঐ যে শেওলা ঢাকা পাহাড়ের বুকটা আকাশের দিকে চিৎ হয়ে আছে, তারই দক্ষিণের ঢালে গোটা দশেক ঘরের গ্রাম ছিল মিঠাপানি। গ্রামের নামটা হয়তো ঝরণার মিষ্টি জলের থেকেই কোন কবিভাবাপন্ন ছোক্‌রা কোন্‌কালে রেখে থাকবে। বুড়োরাও আপত্তি করেনি। সেই থেকে নাম, —মিঠাপানি।

বাসবের বয়েস তখন কত সে 'তা জানতো না। আজো জানে না। গাঁয়ের কেউ মনেও রাখে না। কারো বয়েসই কেউ মনে রাখে না। রাখার দরকারও পড়ে না। থুন্‌থুনে বুড়োকেও যদি বলা যায়, তোমার বয়েস এই দেড়কুড়ি হবে, কি-বলো? অনেকক্ষণ মুখের দিকে চেয়ে আনন্দে ছলছল চোখে হাসি মাখিয়ে বলবে, তাই হবে, তাই হবে। তুমি যখন বলছ, তখন দেড়কুড়িই হবে।

বয়সের হিসেবটা ওরা অন্যভাবে রাখে। কবে ঐ সড়ক হয়েছিল? তখন সে ঠাকুরদার হাঁটুর সমান ছিল, না বুক সমান? কবে তিরিলের জংগলে অরণ্যবহ্নিতে শূয়োরের পাল মরেছিল বিস্তর? তখন সে বুড়ো শালগাছটার কতটা? এই হোল বয়েসের হিসেবের মাপকাঠি! শালগাছটা বিশ-ত্রিশ চল্লিশ বছরে কতটা বেড়ে গেছে, সে হিসেব রাখবার উপায়ও যেমন নেই,

প্রয়োজনও নেই। এখনো অনেককে বয়েস জিজ্ঞাসা করলে বলবে, দাঁড়াও বাপু বউকে জিজ্ঞাসা করে আসি। বউ ওর বয়েস জানবার অধিকারিণী হোল কিসে, সে খবর জানবার কোন উপায়ই থাকবে না। বয়েসটা ওদের কাছে তাই কিছু নয়।

তবু শিশুকাল শিশুকালই।

বাসরের তখন শিশুকাল।

অস্পষ্ট হলেও বাসবের সেদিনের কথাটা মনে আছে। যে ঘটনার পর তারা মিঠাপানি ছেড়ে ঝালুকপোখরে এসে বাসা বেঁধেছে। গোটা গাঁয়ের মানুষ সেদিন মিঠাপানি ত্যাগ করে চলে আসে এই গ্রামে।

ছোট গ্রাম। এমনি করে বড় গ্রামের সঙ্গে মিশে ঝালুকপোখরকে বিখ্যাত করে তুলেছিল। সেদিনের সে কথা কেউ ভোলেনি।

বাসবেরও তাই মনে আছে।

নুন বেচতে এসেছে শাওজী।

টাটুঘোড়াটা অদূরে ছেড়ে দেওয়া। শাওজীর হুকুমে যে যেমন পেরেছে, ঘোড়ার খাদ্য জুটিয়েছে। দাঁড়িপাল্লা শাওজীর হাতে। নুনের বস্তা মাটিতে মুখ খুলে পড়ে।

রামে এক, রাম। রামে দুই চার। চার, চার, ছও।

বাসবের বাপ শক্ত জোয়ান মথুর। চেপে ধরল শাওজীর হাত।

হোল না। আবার মাপতে হবে।

শাওজী ধমক দিল, অত সময় নেই। ধর।

দুচারজনের পীড়াপীড়িতে শাওজী আবার দাঁড়ি বাটখারা তুলে ধরল, রামে এক দুই। দুই দুই চার।

খবরদার।

উঠে দাঁড়াল মথুর

শাওজীও উঠে দাঁড়াল, হাতে সের।

চিরদিন ঠকাবে? নুন বেচে মহল তোলা?

আর তো কিছুর প্রয়োজন নেই। সজনের পাতা বা যে কোন শাক সেদ্ধ, কখনো আলু হোল তো তোফা বাৎ। পাগলা হাতী আর বনশূয়োরের মুখ থেকে, মাচায় রাত কাটিয়ে, যেটুকু শস্য রক্ষা করতে পারে, তাতেই সানন্দে চালিয়ে নেয়। শুধু নুনের জন্যে পরনির্ভরতার সুযোগ নিয়ে গলা কাটবে শাওয়ের দল?

মথুর শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। জন চারেক জোয়ান তার সমর্থনে এগিয়ে আসে।

শাওলী সেরটা ছুঁড়ে দেয় মথুরের মাথা লক্ষ্য করে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছোটে।

শাওজীকে টুকরো টুকরো করে কাটে ওরা টাংগির ঘায়ে-ঘায়ে। পাহাড় গড়িয়ে ফেলে দেয় নিচে। দিন সাতেক পরে পুলিশ দেখা গেল গাঁয়ে। বিশ-পঁচিশ জন। এলোপাথারী মার। তীর ধনুকের জবাবে বন্দুক সরব হল। গাঁয়ের জোয়ানরা মাটি নিল। বুড়োরা হাসপাতালে গেল। যুবতীরা অকথ্য লাঞ্ছনা সয়েও বেঁচে গেল।

পুলিশ রিপোর্ট দিলে, বিদ্রোহ। আত্মরক্ষার জন্যে কয়েক রাউণ্ড গুলী চালিয়ে অবস্থা আয়ত্বে আনা গেছে।

মেয়ে-বৌরা শিশুদের হাত ধরে মিঠাপাণি ছেড়ে চলে এল ঝালুকপোখর। ঘরদরজা পুড়ে ছাই। উপায় নেই।

মোষ মুরগী পুলিশের লোক খেদিয়ে কিছু নিয়ে গেছে। কিছু শাওজীর ঔলাদের ঘরে জমা হয়েছে।

যে ক'জনকে বেঁধে নিয়ে গেল পুলিশ, তারা আর ফিরল না। জেল হোল কি ফাঁসি, কেউ তার খবর রাখেনা। গুলী খেয়ে মরল যারা, তাদের লাস চালান হল কিনা কে জানতে যাচ্ছে ?

গ্রামই যখন উজাড় হয়ে গেল, পুড়ে ছাই হোল সব, তখন মরামানুষের হিসেব রাখবে, অরণ্যে এমন ব্যবস্থা কেউ রাখেনি।

শাওজীর খুনের বদলার পেছনে পুলিশের বন্দুক লুকোন ছিল মথুররা তখনো জানতো না। গোটা গ্রাম তার মাশুল গুনে দিলে লোপাট হয়ে গিয়ে।

কিন্তু আজ অবস্থা বদলেছে।

নিবারণের চোটপাট শুনে বাসব মিঠাপাণির কথা ভাবছিল। বাপের মাথার রক্ত কি তার চোখে ঠেলে উঠছিল ?

রতন মাঝি মথুরের মত শক্ত হয়েই খাড়া ছিল। হাতে টাংগি নিয়ে।

দিন বদলেছে।

নিবারণকুণ্ডু ফাঁপাপেটের টাটু চেপে ফাঁপা শাসানী দিয়ে, সুদের টাকা হাটে উসুল করবে বলে ভয় দেখিয়ে গেল, তাগড়া মোরগের নামে শপথ নিয়ে।

কিন্তু চলে গেল।

বাসব ভাবে, মিঠেপাণির দিন হলে তার আঙিনায় আজ আবার রক্তগঙ্গা বয়ে যেত। মিঠেপাণির দিন তবু বনাঞ্চলের সব এলাকা থেকে একেবারে মুছে যায়নি। দূরে দুরান্তের গ্রাম, যেখানে, কোথাও তুখানা কি তিনখানা কুঁড়েঘর নিয়েই গ্রাম, যার মাইলের পর মাইলের মধ্যে কোথাও আর লোকের বসতি নেই, সেখানে মিঠেপাণি আজো বেঁচে আছে। নিবারণকুণ্ডু আর শাওজীরা মিঠেপাণিকে জীয়ন্ত করে রেখেছে সেখানে। তিন পুরুষ আগে পাঁচটাকা ঋণ নিয়ে পুরুষানুক্রমে মাসিক সুদ গুণেও জমির ফসল সে সব গ্রামের মানুষ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। নিজের ঘরে তুলতে পারে না। ফসল পাবার আগেই, তৈরী হওয়ার আগেই, নিবারণ কুণ্ডুদের, শাওজীদের পাহারাদাররা গোঁফে তাও দিয়ে লাঠিহাতে এসে পাগড়ী নামিয়ে বসে।

ওরা দূর থেকে চেয়ে চেয়ে শুধু দেখে।

নিজের পরিশ্রমের সোনার ফসল সুদের দাবীতে অন্যের গোলায় চালান হয়ে গেল। যা পড়ে রইল তাদের ভাগে, তা দিয়ে বছরের চারকুড়ি দিনও আধ-পেটা খেয়ে বাঁচবে না ওরা। তখন টাংগি হাতে ছোটে। বনলক্ষ্মীর আঁচল ধরে দাঁড়ায়। ঠিকাদারের কুলি হয়। যতদিন বাঁচে, যেখানে কাজ সেখানেই ডেরা ডালে।

তবুও ঝালুকপোখর আছে।

আছে বাসব আর রতনমাঝির দল।

সেখানেও নিবারণকুণ্ডু আর শাওজীরা আছে।

তবে রূপ কিছুটা বদলেছে।

দিন বদলের সাথে সাথে।

* * *

নামটা যখন তার নিজেরই পছন্দ, তখন স্বর্ণলতাকে আমরা সুলতাই বলব। কাঁচবাংলার সে-ও এক কর্ত্রী বইকি। কিছুদিন আগে তো সর্বময়ীই ছিল। এখন শেখরচাঁদ খানিকটা কর্তৃত্ব আদায় করে ছেড়েছে। অবিনাশ কোন ভুল করে যায়নি। সুলতা আর শেখরকে সমান করে রেখে গেছে নিজের উইলে। শেখরের মতিগতি ভিন্নরকমের ছিল বলে নিজের আসন সে পেতে নেবার সময় বা সুযোগ করে উঠতে পারেনি।

অবিনাশের দূরসম্পর্কের কাকা সুধাময়। বিচক্ষণ ব্যক্তি। সুলতা-শেখরের

অভিভাবক হয়েই কাঁচবাংলায় রয়ে গেছেন অবিনাশের শেষদিন থেকে। তিনি না থাকলে থান্‌-থান্‌ হয়ে কবে ভেঙ্গে পড়ত এই কাঁচবাংলা। অবিনাশের অতি প্রিয়পাত্র সুন্দরম সেই আশাতেই হয়তো ছিল। ছোক্‌রা কম চেষ্টা সেদিন করে দেখেনি। কিন্তু সুধাময় এসে দাঁড়িয়েছেন। কাঁচবাংলার খিলেনগুলো আল্‌গা হয়ে যেতে দেননি তিনি।

ধীরে ধীরে সব কর্তৃত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন সুলতাকে। কর্মচারীর দল বুঝেছে —তিনিই সব। তাঁর সই দিয়েই টাকা ওঠে। তাঁর হুকুমেই বহাল-বরখাস্ত। শেখরচাঁদ নামেই শুধু আটআনার মালিক। সময় কোথায় তার দপ্তরে বসবার, কাগজপত্র দেখবার? তদ্বির-তদারক করবার?

বন্দুকের বড় শখ শেখরচাঁদের। রাইফেল বন্দুক একবার পছন্দ হলে না-কিনে ছাড়বে না। বাঘের কপালে ছোট্ট একটি গুলীর টিপ না পরাতে পারলে শান্তি পায় না। ভালুক শূয়োর তো আকছার। বাঘের চামড়ার জুতো বানাবার বায়না ধরত ছেলেবেলায় শেখরচাঁদ।

শিকারী হিসেবে নাম কিনেছে, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। বিদেশী শিকারীদের লোভ দেখিয়ে এনে বাঘ শিকারে নামায়। মোটা টাকা সেলিক দিয়েও হাতে আসে শেখরের। কলকাতা আর সিংভূমের জঙ্গলে স্ফূর্তির ফোয়ারা ছুটিয়ে নিঃশেষ করে দেয় সে টাকা। ইয়ার-দোস্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অফুরন্ত যৌবন তার শখের জুড়িগাড়ি। তাতে অপরিমিত অর্থ আর উন্মত্ত সওয়ারী। বল্গাহীন তুরঙ্গের সর্বনাশা গতি দেখে আশেপাশের সবাই সভয়ে পথ করে দেয়। মাঝে মাঝে সুন্দরম শুধু সবিনয়ে অনুচ্চকণ্ঠে ইসারার কায়দায় বলে, ওদিকে নয়, ওদিকে নয়। একটু এদিকে।

শেখর বিশ্বাস করে সুন্দরমকে। তার ইসারায় পথ চলে এখনো তার চোট লাগেনি গায়ে। নির্ভর করতেই হয়। বিশেষ করে সুলতার খবরদারিকে পরাস্ত করতে সুন্দরমের উপর নির্ভর না-কোরে শেখরের এক পা-ও এগোবার উপায় নেই। কাগজপত্র অপিস-দপ্তর সব কিছু এখনো সুন্দরমেরই আওতায়। শুধু সই করার অধিকার। আর, ফাঁকা শাসন।

ওদের দুজনের বিশ্বাস, সুলতা কাঁচবাংলার ইজ্জৎ ধুলোয় মিশিয়ে দেবে। It is a curse to be under the rule of a woman. কর্মচারীর দল আর যাই ভাবুক।

—তুমি না এতদিন বলতে শেখর, আমাকে তুমি যমের মত ভয় কর ?

—সিগরেটের ধোঁয়া ফুঁ দিয়ে সরিয়ে শেখর বলে, আজো করি।

তবে ?

তাই তো দূরে থাকতে চাই। শেখর হঠাৎ বলে বসে।

সুলতার মুখে আর কোন কথা জোগায় না। যেমন ধীরপদে এসেছিল শেখরের ঘরে, তেমনি ফিরে যেতে থাকে। একবার কি মনে হয়, মাঝপথে থমকে দাঁড়ায়। শান্তকণ্ঠে বলে, বেশ, তাই হবে।

সুলতা ঘর ছেড়ে চলে যায়।

সুন্দরম আলমারির পেছন থেকে আবার গ্লাস দুটো বার করে। শেখরের গ্লাস তার হাতে এগিয়ে দেয়।

ওঁর খবর দিয়ে আসা উচিত ছিল।

সুন্দরম বলে।

শেখরচাঁদ চোখের কালো চশমা ঠিক করে নেয়। নতুন করে সিগারেট ধরায়। গ্লাসটা এক চুমুকে নিঃশেষ করে উঠে দাঁড়ায়।

চঞ্চল হয়ে ঘরময় পায়চারি আরম্ভ করে। মেঝেয় পাতা কার্পেটের ওপর আক্রোশভরে বার বার জুতো ঘষে। অরণ্যের মাঝে হারাণো দুটি হরিণশাবক। কোন্ শিল্পী কবে কি মন নিয়ে এঁকে রেখেছিল। শেখর চেয়ে চেয়ে দেখে। আবার সিগারেট ধরায়। ছবিটা নোংরা।

সুন্দরম বলে, চঞ্চল হও কেন শেখরচাঁদ ? আমরা তো রয়েছি সবাই। তাই বলে ওঁর কথায় ব্যবসা চালাতে গিয়ে পথে দাঁড়াবে, সে কোন্‌দিশি কথা ? কোন্ ঠিকেদারের মাল আটকায় না শুনি ? কেন এমন হল ? কি প্রশ্ন একবার বোঝ। ব্যবসাও করব আবার সাধুগিরির অভিমান থাকবে ষোল আনা টনটনে, দুটো একসঙ্গে চলে কি করে ?

শেখরচাঁদ ফিরে এসে বসে সোফায়। আবার সিগারেট ধরায়। গলার টাই-টা খুলে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় দামী কার্পেটমোড়া ঘরের মেঝেয়।

সুন্দরম আবার বলে, কি ভাবে অপমানিত করলেন উনি আমাকে। স্ত্রীলোকের মত চোখের জল ফেলতে যাবার মানুষ আমি ? যেন দোষটা সব আমারই। আমিই যেন চুরি করাচ্ছি। মেট-মুন্সী, ওরা যদি……

শেখরচাঁদ বলে উঠলো, আজ আপনি আসুন মিস্টার সুন্দরম। শরীরটা তেমন ভালো বোধ করছি না।

সুন্দরম বলে, হবেই। যে অবস্থা তিনি বাধিয়ে রেখেছেন কয়েক বছর ধরে, তাতে কারই বা শরীর ভাল থাকবার কথা? আমার তো সাতপাউণ্ড ওজনই কমে গেছে।

শেখরচাঁদ ভেতরের দিকে দরজা ঠেলে নিজের বিশ্রামের ঘরে চলে গেল। সুন্দরমের মুখে যেন চাবুক পড়ল।

সুন্দরম সে দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল একা কিছুক্ষণ। তারপর মুখে একটু অপ্রস্তুতের হাসি টানবার চেষ্টা করে বাইরে যেতে যেতে বিরক্তভরা চাপা স্বরে বলল, রাবিশ্।

সাত

ওয়ে শমা, তেরা উম্র হ্যায় সিফ´ এক রাত কি! উসে হস্‌কর গুজর্‌, ইয়া রোকর্‌……, বুঝলে সতীনাথ, নইলে কি আমি বাঁচতে পারতাম? নিজের সুখ-দুঃখ নিয়ে ভাবতে নেই। উত্তর দিতে পারল না সতীনাথ অনেকক্ষণ।

জেনেছিল, মানুষটা অদ্ভুত। যেমন শান্ত, তেমনি রাগী। কিন্তু কত বেদনার পাহাড় জমা হয়ে আছে? বাইরে তার কোন প্রকাশ নেই। মনে হয়, মৌজী মানুষ মোহন মিত্র। প্রাণ খুলে হাসতে জানে। জানে হাসাতে। শয়ের আর কবিতা আওড়াতে পারে।

—কিন্তু প্রদীপের ইচ্ছাটাই কি সব?

হাসি আর কান্না! এ ছাড়া যখন তৃতীয় উপায় সামনে নেই, তখন সিফ´ একটি রাতের আয়ু নিয়ে সে বেচারা আর কি চাইতে পারে বল? জলতে তাকে হবেই। আয়ুও মাত্র একটি রাত। হেসেই জ্বলুক। কেঁদে কাটিয়ে লাভ কি? কে শুনছে তোমার কান্না? হাসো সতীনাথ, হাসতে শেখ। তাহলে অন্ততঃ কিছু লোক তোমার সঙ্গে পাবে। কাঁদলে কেউ চেয়েও দেখবে না। কাছেও আসবে না।

খুব হয়েছে, এবার তোমার মাস্টারিটা রাখ দেখি, এদিকে চা জুড়িয়ে জল হয়ে গেল, বলতে বলতে কোমরে কাপড় জড়িয়ে তরুবালা ঘরে এসে দাঁড়ালেন। সতীনাথের দিকে চেয়ে বললেন, কি নাথ সাহেব, তুমিও ভাবে বিভোর দেখছি। দয়া করে গাত্রোত্থান কর। ওদিকে যে সব আগ্‌লে বসে বসে হাঁটুতে বাত ধরে যাবার যোগাড় হল।

হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালো সতীনাথ। সত্যি বউদি। দুবার চাকরটা এসে তাগিদ দিয়ে গেল। চলুন। চলুন দাদা।

মোহন মিত্র বালিশটা কোল থেকে নামিয়ে রেখে বললেন, হরির তাগাদায় যদি তখনই উঠে যেতাম আমরা, পেতে দেখতে বৌদির এমন রণংদেহী মূর্তিখানা ? আহা, এ মূর্তি যে আমার কত.......

বাধা দিয়ে তরুবালা বললেন, থামো তো তুমি। সেই থেকে ফরাস পেতে ফরাসী আড্ডা জমিয়েছ, আর এই কাঁচা ছেলেটার মাথা খাচ্ছ। নাথ, তুমি ওঁর একটা কথাও শুনোনা। গোল্লায় যাবে। নিজের জীবনটা তো মাটি করলই, সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও পথে বসালে। এবার তোমার সর্বনাশ করতে উঠে পড়ে লেগেছে। মানুষটা কি কম সব্বোনেশে ভেবেছ তুমি ?

ভেতরে লম্বা একফালি বারান্দা। যার পুবের বাঁকটার শেষেই রান্না ঘর। সেই বারান্দায় খাবার টেবিল পাতা। সাধারণ একটা টেবিল আর খান কয়েক চেয়ার। কোন জাঁকজমক নেই। যেমন বাইরের ঘর, তেমনি ভেতরের সব। শোবার দুখানা ঘরও তাই। পালং নেই। সোফা নেই। কোচ নেই। সস্তা কাঠের জোড়া খাট। একটা করে মাঝারি সাইজের আলমারি আর খান দুই করে চেয়ার। দুটো শোবার ঘরে এই মাত্র আসবাব। বাইরের ঘরে ঢালা ফরাস। তাকিয়া নয়। সাধারণ বালিশ কয়েকটা। যেমন বাহির, তেমনি অন্দর। এই হোল মোহন মিত্রের সংসার। এরই মাঝে রোগা উৎকলবাসী ভৃত্য হরি টিক্‌টিক্ করছে। ছেলে মেয়েকে তরুবালা ভাইয়ের কাছে মুঙ্গেরে রেখে কলেজে পড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এমন মানুষের কাছে থাকলে ছেলেমেয়ে কোনদিন মানুষ হবে না। তরুবালার এই বিশ্বাস। নইলে রিটায়ার করেও জঙ্গল ছাড়ে না, এমন সৃষ্টি ছাড়া মানুষ দেখেছে কেউ ?

সতীনাথ চায়ে চুমুক দেয় আর হাসে। ভাবে, দুই-ই সমান। একজে ছেড়ে অপর যেন অসম্পূর্ণ। তরুবালা না হলে মোহন মিত্র হয় না।

তাই তো ওকে একদিন বলেছিলাম, ওসব বালাটালা দিয়ে আমার কোন দরকার নেই। তুমি আমার শুধুই তরু। তখন লজ্জায় একেবারে অধোবদন। আর আজ দেখ তার শাসনের বহরখানা। মোহন মিত্র পাঁপর চিবোতে চিবোতে বলে।

তরুবালা বলেন, দেখ ভাই, এ মানুষের সঙ্গে চলা যে কি কঠিন, কেউ বুঝবে না। যদি কথা না শুনলে, সে কি দাপানি। যদি অন্ধের মত অনুসরণ করে বিপদে পড়লে, ওমনি বলবে, আরে, যা বলব সব সময় তাই কি মেনে চলতে আছে? ঘটালে তো বিপদ। দোষটা তখনো ষোল আনা আমারই। রেগে বেরিয়ে যাবে বলতে বলতে, আন্ধা গুরু বাহ্‌রা চেলা, মাংগে গুড়, দাবে ঢেলা।

সতীনাথ হো হো করে হেসে উঠে বলে, অর্থাৎ এগোলেও নিস্তার নাস্তি, পেছুলেও সর্বনাশ।

ঠিক বলেছ ভাই। সারাটা জীবন জ্বালিয়ে খেলে। এখন প্রদীপের জ্বালা নিয়ে তোমায় কাব্য শোনাতে বসেছিলেন। উঃ, আমি বেঁচে আছি না মরে গেছি বুঝতেই পারি না।

মোহন মিত্র বলেন, অথচ ইনিই সেই বয়েসে আদর পেলে চোখ বুঁজে বলতেন, উঃ, আমি বেঁচে আছি না মরে গেছি।

থামো তুমি।

সতীনাথ চেয়ে দেখে নতুন করে চা ঢালতে ঢালতে তরুবালার চোখ দুটো টল টল করে উঠল।

সতীনাথ জানে না। কেউ জানে না। কিন্তু মোহন মিত্র জানে। জানে তরুবালা। কালো বলে তরুবালাকে নতুন সংসারের সবাই যখন অবহেলার চোখে দেখতো, মোহন ধীরে ধীরে কাছে এসে ফিস ফিসিয়ে বলত, ওরা জানে না। ওদের চোখ নেই তরু। আমি অনেক সাদা মেয়ে মানুষ দেখেছি। দেখেছি, সেখানে কেবল হাড় আর মাংস। তোমার বুকের মধ্যে যে ভালবাসা, যে মনুষ্যত্ব, তা আমি কোন সাদা হাড় মাংসের মধ্যে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাই নি। ওরা কিচ্ছু জানে না তরু। ওরা বড্ড বোকা।

তরুবালার আরো মনে পড়ে, রাগ করে বেরিয়ে যাচ্ছিল বাড়ী থেকে একদিন মোহন মিত্র নতুন জীবনে। পরে শান্ত হলে, তরুবালা চোখের জল মুছে বললে,

তুমি না আমাকে এত ভালবাস ? অমন করে রেগে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলে তখন ? একটু মায়া হোল না ?

শুয়ে শুয়ে চোখ বুঁজে মোহন বলেছিল, তখন আমার হাতখানা কেন একবার ধরলে না তরু ? তাহলে তখুনি আমি জল হয়ে যেতাম।

আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল, আর কোনো দিন রাগ করব না। কিন্তু কথা রাখতে পারে নি মোহন মিত্র। আবার রাগ করেছে। হাত চেপে ধরলে হাত ছাড়িয়ে নিয়েছে। কোন মানা শোনে নি।

চোখের জল মুছতে মুছতে তরুবালা চামচে করে খাবার তুলে ধরেছে মোহনের মুখে। মোহন তখন বলেছে, তুমি এমনি করে কেন আমার রাগ থামিয়ে দাও না তরু ? শুধু হাত ধরলেই কি সব সময় কাজ হয় ?

সতীনাথ চেয়ে চেয়ে দেখছিল তরুবালার সজল চোখ দুটো। কত তরঙ্গের দোলায় ভেজা চোখের পাতা কাঁপছে। সতীনাথ সে সব পুরোনো ইতিহাসের বিন্দু বিসর্গও জানে না। অথচ সেই নায়ক, সেই নায়িকা তারই সামনে আজ বসে।

একই টেবিলে তারা চা খাচ্ছে।

মোহন বলে উঠলেন, এই জন্যে বলি, হরি যখন রয়েছে, তখন আগুনের আঁচটা না-ই বা পোহালে অত। জান সতীনাথ, ওর চিরদিন দেখেছি উনুনের সামনে বেশিক্ষণ থাকলেই চোখ দুটো কেমন ঝাপ্‌সা হয়ে ওঠে। মানা কথা তো কখনো শুনবে না বলেই প্রতিজ্ঞা করে এসেছে আমার জীবনে। কি আর বলব ভাই ?

নিমেষে সামলে নিলেন তরুবালা। আনন্দের অশ্রুভোগ যে কত মধুর বেদনাময়, সতীনাথ নিজের জীবনে আজো টের পায় নি। সে অশ্রু গোপন করার চাইতে প্রকাশ করায় যে কতো গর্ব, সতীনাথ না জানলেও মোহন মিত্র জানেন। বলেন, কি আর বলব ভাই ?

আপনাকে কিছু আর বলতে হবে না দাদা। আমি সব বুঝতে পেরেছি। প্রথম দিন মনে হয়েছিল, আমি একা। একাই থাকব। থাকতে হবে। আপনার কাছে বারবার আসা সম্ভব হবে না। কিন্তু দেখছি, আপনার কাছে না এলে বাঁচাই অসম্ভব আমার।

তরুবালা বলেন, মরেছ। অবণ্যের বায়ু এঁর মত একবার তোমারো মাথায় চাপলে আর রক্ষে নেই কিন্তু। সাবধান।

আট

আস্ত এক জোয়ান মানুষকে ভাল্লুকে ছিঁড়ে ফেলেছে মহুয়া-তলায়। সকাল বেলাতেই।

গ্রামবাসীর ভিড় জমে গেছে।

রক্তাক্ত মানুষটার প্রাণহীন দেহ নিকানো ঐ মহুয়া তলায় পড়ে আছে। সাদা সাদা মহুয়াগুলো জোয়ান মানুষের তাজা রক্তে লাল। আংটির বড় রুবি পাথরের মত। জমাট রক্ত ভেদ করে দু এক জায়গায় সাদা মহুয়া লাল-পাথরের টুকরোর মত ফুটে আছে।

বাসব বলে, তোরা ফারাক যা। দূরে-দূরে গিয়ে বোস।

ভিড় একটু সরে যায়। কিন্তু কান্নায় আছড়ে পড়ে সবাই। বাচ্চাগুলোর কান্না এতক্ষণে থেমেছে। গালবেয়ে চোখের জলের ধারা শুকিয়ে আছে। চোখগুলো লাল-লাল। প্রায় রুবিপাথরের মত।

সতীনাথ গার্ডদের কাগজ লিখে পাঠায় থানায়। তারই এলাকায় ঘটেছে, থানায় জানাবার সরকারী দায়িত্ব তার না-হলেও অন্য একটা দায়িত্ব বোধ এসে গেছে। গাঁয়ের মানুষ তাকে কেবল কাঠের রেঞ্জার বলেই জানে না। রক্তমাংসের মানুষ বলে এতদিনে চিনেছে।

মোহন মিত্র বলেন, বাসব, যা দিকি, আমার ওখান থেকে একটা কাপড় নিয়ে আয়। ঢেকে দে। ওর মুখখানা দেখতে আর পারছি না।

সতীনাথ একটু সরে এসে বলল, মুখটা আর তলপেটটা। উঃ, একেবারে ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিয়েছে।

ভালুকে তাই করে। মুখ আর পেটই ওদের লক্ষ্য। মোহন মিত্র বলেন।

মহুয়া নিয়ে অনেক কাব্য হয়। কাব্য আছে। আরো হবে।

কিন্তু মহুয়া নিয়ে অরণ্যবাসীর জীবনে যে রক্তাক্ত কাব্য লেখা হয়, তার খবর ক'জন রাখে? মহুয়া তাদের খাদ্যই নয়, পণ্য। মহুয়া আহরণে ওরা এমনি করে কত জীবন দিয়ে থাকে। প্রত্যেক গাছের তলায় পরিষ্কার করে ওরা রাখে। মহুয়া পড়ে টুপটাপ। ঝাড়জঙ্গল সাফ করে না রাখলে

অসুবিধে হয়। পরিষ্কার গাছতলায় পাকা মহুয়া বিছিয়ে থাকে মুক্তোর মালার মত। ভালুক কম মাতোয়ালা, কম লোভী নয়। কুড়িয়ে খাবার তর সয় না তার। উঠে পড়ে গাছে। পেটপুরে খায়। নেশায় চুর হয়ে গড়িয়ে পড়ে নিচে। ঠিক সেই সময় সামনে পেলে শিবুমাঝির ছেলে রুপাকে। নখে-দাঁতে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ফেলল তাকে। কুড়ুলটা ফেলে রেখে রুপা মহুয়া কুড়োতে ব্যস্ত ছিল। জানতে পারেনি সাক্ষাৎ যম অতর্কিতে সামনে এসে এমনভাবে হঠাৎ হাজির হবে। তা না হলে জীবনটা তার হয়তো যেতো না। জখম হয়তো হোতো। প্রাণটা বাঁচত।

মোহন মিত্র বলেন, এমনিভাবে ওরা হাতী আর বন্যবরাহের হাতেও প্রাণ দেয়। একটু অসতর্ক হলেই গোটা পরিবার খতম। হাতীর দল শস্য খেতে আসে। আসে শুয়োরের পাল। ওরা মাচা বেঁধে তার ওপর রাত জাগে আগুন জ্বালে। টিন পেটে। হাতীর দল সুযোগ পেলে ঘরগুলো শুদ্ধু মাটির সঙ্গে পিষে মিশিয়ে দেয়। যারা ভেতরে রইল, তাদের পরিণামটা একবার ভেবে দেখ সতীনাথ।

অদ্ভুত মরণ জয়ী সংগ্রাম করে এরা মৃত্যুর পাঞ্জা থেকে জীবন-কে ছিনিয়ে রাখে। অরণ্যে এই সংগ্রামই হোল ওদের জীবনে একমাত্র সত্য।

সতীনাথ বলে, তারওপর আরো সংগ্রাম চাপিয়ে রেখেছি আমরা ওদের ওপর। সুদখোর, ব্যবসাদার, সরকারী, বেসরকারী সব রকমের ফাঁস। জমি জিরেত সুদের দায়ে বিকোয়। জীবন যায় পশুর হিংসায়। মানুষই বা পেছিয়ে থাকবে কেন? কিন্তু, ওরা তো দুর্বল নয়।

মোহন মিত্র সতীনাথের মুখের ওপর চোখ রেখে কিছুক্ষণ নিরুত্তর হয়ে থাকেন। তারপর আস্তে আস্তে বলেন, ওরা সেটা আজো টের পায়নি সতীনাথ। শুধু দেহের বলটার ওপরই ওরা আজো আস্থা রেখে চলেছে। তাই গলায় ফাঁসের পর ফাঁস পরেও অবলীলাক্রমে মাত্র সেইটুকু জোরেই মাটি কাঁপিয়ে চলেছে। যেদিন তোমার কথার অর্থ ওরা বুঝবে, ওরা তো দুর্বল নয়, সেদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে সতীনাথ। কিন্তু..., তোমরা তো থাকবে। তোমরা দেখো।

সতীনাথ বাসবকে কাছে ডেকে বলে, কাল যেন অপিসে আসে। রুপার পরিবারের জন্যে যেমন ব্যবস্থা তারা চাইবে, তাই হবে।

আমি আছি। মিস্তির সাহেব আছেন। ভাবনা কি তোমাদের?

বাসব বলে, আসব।

মনটা খারাপ হয়ে আছে সতীনাথের। সারাটা রাত ভাল ঘুমও হয় নি। সকালে বিজলা চা দিয়ে গেছে। দেখেছে। কিন্তু হাত বাড়িয়ে পেয়ালাটা টেনে নিতে কোন উৎসাহ বোধ হল না তার। পাইপ তার প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী। বিছানার পাশেই সেটা পড়ে আছে। হাত দিয়ে স্পর্শ করল সতীনাথ। নাঃ, থাক। কিচ্ছু ভাল লাগছে না। মুখটা বিস্বাদ।

ঠিক এমনি মনে হয়েছিল আরেক দিন। যেদিন মাতাল মেয়েটাকে ওরা আগুনে পোড়াচ্ছিল। সেইদিন।

কি খেয়াল হল, বন্দুক নিয়ে রাতের অন্ধকারে সতীনাথ জঙ্গলের পথে বেরিয়ে পড়েছিল। বিজলা অবাক। শিকারে যাবে নাকি? তা এমন একা-একা? রাতের অন্ধকারে? কেন? কিছু বলতে সাহস পায় না। বিজলা নিঃশব্দে পিছু নেয়। টের পেয়ে সতীনাথ বলে, কিরে?

কোন উত্তর দেয় না বিজলা।

সতীনাথ বোঝে। বলে, বেশ। চল।

বাঁকটার সামনে দাঁড়ায় সতীনাথ। বলে, ও পথটা? কোনদিকে গেছে রে?

বিজলা বলে, রাজনবুরু। সেবার যেদিকে আগুন লেগেছিল সাব।

মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে নিয়ে সতীনাথ বলে, অ।

বিজলা সাহসে ভর করে বলে, এবার ফিরবেন সাব?

না। তুই যা।

একটু একা থাকতে ইচ্ছে করছে সতীনাথের।

বিজলা ভাবে, শিকার করতে হয়, মাচা বেঁধে, হাঁকেয়া লাগিয়ে করলেই হয়। এ আবার কি খেয়াল?

খেয়ালই বটে। নইলে খাট থেকে সটান উঠে রাতদুপুরে বন্দুক নিয়ে জঙ্গলে কেন বেরোবে সতীনাথ? হয়তো জঙ্গলের বিপদআপদগুলোকে ঠিকমত এখনো চেনেনি সে। বিজলার ভয়-ভয় করে।

অদূরে সেও নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

খেয়ালের কোন যুক্তি সঙ্গত ব্যাখ্যা থাকে না।

সতীনাথের বেলাতেও তা খাটে।

যখন কাজকর্ম হৈ-চৈ নিয়ে থাকে, সে তখন ভিন্ন মানুষ। কিন্তু তার কোনো-কোনো কাজ বিজলা ঠিকমত বুঝতে পারে না। চাকরী তো তারও একেবারে নতুন নয়! অনেক হুজুর-ই তো দেখলে। মিত্তির সাহেবও তো ছিল। তার শখ ছিল ঘুরে ঘুরে জঙ্গল দেখা। কিন্তু তাই বলে অন্ধকার গভীর রাতে নয়।

দূরে ওটা কিসের আলো বিজলা ?

বিজলা একটু এগিয়ে দেখবার চেষ্টা করে। না বুঝে চট করে কোন উত্তর দেয় না।

সতীনাথ বলে, গিয়ে দেখে আয়।

হুকুম পেয়ে এগিয়ে যায় হাঁক দিতে-দিতে।

কিছুক্ষণ-পর ফিরে এসে বলে, মুর্‌দা। জ্বালাচ্ছে।

সে কি রে ? একেবারে জঙ্গলের ভেতরে ? আগুন লেগে যায় যদি ?

না। বাইরেই আছে। এখান থেকে মনে হচ্ছে জঙ্গলের ভেতর। টাঁর জমিটার ঢালুতে।

চল তো দেখি।

সতীনাথ বন্দুকটা বিজলার হাতে দিয়ে বলল, পারবি তো ? দেখিস।

বাঁখের মত বন্দুকটা ঘাড়ে ফেলে বিজলা এগিয়ে চলতে লাগল। সতীনাথ পেছনে।

দুজন লোক এগিয়ে এল।

চিনতে পেরে কপালে হাত ঠেকিয়ে বারবার পেন্নাম জানিয়ে বলল, হুজুর, দেখুন কি কাণ্ড। শালাকে নাগালে পেলে জ্যান্ত পোড়াতাম এই সাথে।

কি ব্যাপার ?

পরশু সারারাত মেয়েটাকে নাচিয়েছে আর মদ খাইয়েছে। কথা দিয়েছিল, শাদী করবে। শালা নিমকহারাম। জানটা খতম করে দিলে।

পুলিশে খবর দিলে না কেন ?

কি হবে ? তীর বিঁধে, গলা টিপে তো মারেনি। মদ খেয়ে মেয়েটা নিজেই মরেছে।

তবু। যদি বিষ-টিষ······

চালাক কি কম? সে সব কিছু না। মরল তো আজ সন্ধ্যেবেলা।

ভেবে পায় না সতীনাথ। বিয়ে করবে বলে কথা দিয়ে উৎসবের নাচে একসাথে রাতভোর নেচে মেরে ফেলবে কেন?

শাদী করবে জেনে কেউ কোনদিন ওদের বাধা দিত না। দুজনে হাটে যেত। কাজে-কামে যেত। তারপর এই কাণ্ড। বে-ইমান শালা।

কাপড়ের ঢাকা খুলে ফেল্ল একজন। দেখুন হুজুর। মুখটা এখনো নেশায় টস্‌টস করছে।

থাক থাক।

থাকবে কেন? আপনিই হুজুর আমাদের পুলিশ। আমাদের হাকিম। দেখে রাখুন। শালাকে পেলে তখন যেন আমাদের কিছু বলবেন না।

চিন্তিত হয়ে সতীনাথ বলে, কিন্তু তাকে তো আমি চিনি না।

আপনি না চিনলেও, আমরাতো চিনি। যাবে কোথায়? বনজঙ্গলে লুকিয়ে থাকা ভারি শক্ত।

ওরা এবার আগুনে দেবে মেয়েটাকে।

কিন্তু, এতো খুন। তার কি কোন কর্তব্য নেই? আইন? পুলিশের আইন?

সতীনাথ দেখল, পূর্ণ যুবতী। সারা অঙ্গে তার তখনো যেন নাচের তরঙ্গ একেবারে থেমে শেষ হয়ে যায় নি। মুখে বিশ্বাসভরা মৃদু হাসি। থম্‌কে আছে।

চোখ ফিরিয়ে নিল সতীনাথ।

ঢেকে দাও তোমরা।

সে রাতটাও ঘুমোতে পারে নি সতীনাথ!

চোখের সামনে সব সময় অষ্টাদশীর জীবনরসে ভরপুর চেহারাটা ভেসে উঠেছে। মৃত্যুর কয়েকঘণ্টা আগেও পরম বিশ্বাসভরে সে প্রিয়তমের হাত ধরে নেচেছে। কত গান গেয়েছে। প্রিয়তমের হাতের পাত্রে চুমুক দিয়ে দিয়ে মদ্যপান করেছে। বেচারি জানতেও পায়নি চুমুক দিয়ে দিয়ে কাল-মৃত্যুকেই সে অজ্ঞাতে বরণ করে চলেছিল।

মোহন মিত্র বলেছিলেন, ও তুমি কিছুতেই প্রমাণ করতে পারবে না। বনজঙ্গলের নিয়মকানুনই আলাদা। সরকারী নিয়মের সঙ্গে তার কোথাও

মিল নেই। অরণ্যের আলো অন্ধকার সব কিছু যেমন জীবন্ত, তেমনি, বিশ্বাস ভালবাসা বেইমানী এসব-ও জীবন্ত। জীবন্ত এখানে হিংসা-ও।

*　　　*　　　*

জানতাম। ঠিক তাই। নাঃ, তুমি বনজঙ্গলে চাকরী করতে পারবে না দেখছি।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল সতীনাথ।

মোহন মিত্র সকালবেলাতেই সতীনাথের শোবার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছেন।

বলেছিলাম না? জীবন্ত প্রাণ না হলে বনে-জঙ্গলে চাকরী তুমি করতে পারবে না সতীনাথ? যা ভেবেছি, ঠিক তাই। এখনও বিছানাতেই মুখ গুঁজে পড়ে?

সামনের ছোট টেবিলে চায়ের পূর্ণ কাপ-টা লক্ষ্য করে বললেন, হুঁ।

মেঝের দিকে চেয়ে বললেন, সারারাত কেবল দেশলাইয়ের কাঠি পুড়িয়েছ আর পাইপ টেনেছ। ঘুমোবার সময় পাওনি। তাই না?

সতীনাথ লজ্জিত মুখে নিঃশব্দ হাসি টেনে উঠতে উঠতে বলল, না না। একটা বই পড়তে পড়তে ভুলে গেছি কখন ভোর হয়ে গেল।

বেশ! চায়ের পেয়ালাটাই তার সাক্ষী।

বিজলা, কড়া করে লেবু চা আন দু কাপ।

কেন? আপনিও বই পড়ছিলেন নাকি? আমার মতই?

সতীনাথ আর মোহন মিত্র একসঙ্গে এবার হো-হো করে হেসে ওঠেন।

শোন সতীনাথ, দিল্ জিন্দা রাখো। দেখ, শোন, অনুভব কর। পথ খোঁজ। মুষড়ে পড়লে তো চলবে না। হার মানবে কেন? খণ্ড খণ্ড বেদনার ঘটনায় নিজেই যদি পরাস্ত হয়ে যাই, রাস্তা পাব কোথায়?

বিজলা দুকাপ লিম্বু-চায় রেখে গেল ওদের সামনে।

নাও, বেশ জুৎ করে ঠেসে তোমার পাইপটা এবার সাজোদিকি। সত্যি বলছি, তোমার পাইপ টানবার কায়দাটা দেখলেই আমার নিজেরও কেমন মেজাজ এসে যায়।

জানো সতীনাথ, আমার বিশ্বাস, মানুষের ওপর সস্তা দয়া দেখানো পাপ। বিকৃত স্পর্দ্ধা।

সতীনাথ পেয়ালায় চুমুক দিতে গিয়ে থেমে গেল।

হ্যাঁ, তাই। ঠিক তাই। তুমি আমি দয়া দেখাবার কে? পথে পথে গর্ত খুঁড়ে রাখব। চোখ বেঁধে ছেড়ে দেব। পড়ে গেলে দয়া দেখাব। খুব মজার খেলা, না?

একমনে সতীনাথ পাইপ টানে। উত্তর দিতে পারে না।

বাঃ! চমৎকার! সত্যি বলছি, চমৎকার মানায় তোমায়। বিজলা, বলে হাঁক দেন মোহন মিত্র।

ছুটে আসে বিজলা।

হ্যাঁরে, তোর নতুন সাহেবের ক্যামেরাটা কোথায় বলত? আরে, ফোটো-বাক্সা। জানিস?

বিজলা জানে। ফোটো-বাক্সা আজ চেনে না, জঙ্গলে এমন কেউ নেই।

সতীনাথ তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, আমিই বের করে দেব। তুই যা বিজলা। আপনার যা কাণ্ড!

বিজলা নতুন-পুরোন দুই সাহেবের খেলা কিছু-কিছু বোঝে।

শামুকে গিয়ে দুষ্টুমি করে বলে, ফটো তোলাবি শামু?

শামুর এই বয়েসেও ফটোতে বড় শখ। সোজা হয়ে উঠে বলে, দাঁড়া, ওয়ার্দি পরে আসি। পাগড়ী ভি।

তাকে টেনে ধরে বিজলা বলে, আরে আভি নেহি। সাম্‌কো। সাহেবরা ফোটোবাক্সা নিয়ে যাবে, ও-তে মশালা ভববে, তব্ তো।

শামু অনেক ফটো তুলিয়েছে জীবনে। কিন্তু ফটোতে নিজের মুখটা ওর কোনোদিনই তেমন পছন্দ হয় নি। প্রত্যেকবারই ভাবে, এইবার মৌকা হলেই, জরা ডানদিকে হেলে তোলাবে। তাতে পাগড়ীর ঝালরগুলো দুলবে। মনে হবে, হ্যাঁ, শামুও ফোটো তোলাতে জানে। শামু বুড়ো হলে কি হবে, ঠাটিয়াল আছে। সেই ফটো সে ঘরের দেওয়ালে 'আয়না' বাঁধিয়ে টানাবে। দশজন গাঁয়ের ছোকরা দেখে অবাক মানবে। নইলে, একগাদা ফটো আর সাটিক্‌ফিটিক তার বাক্সে পচ্‌ছে। বিলিতি সাহেবেরা তাকে সাটিক্‌ফিটিক দিয়ে গেছে। একদিন মিত্তর সাব কো দেখিয়েছিল। চক্ষু ছানাবড়া। বলেছিল, শামু, তুই আমার আরদালী হবার লোক নোস্।

তবে?

তুই আমার হাকিম হবার যুগ্যি লোকরে। তোকে কোন্ মুখ্য আরদালীতে বহাল করে গেছে ভেবে পাই না।

লজ্জায় শামু শুক্‌নো জিভটা বার করে ঘর থেকে ছুটে পালিয়েছিল।

শামু যতক্ষণ জেগে থাকে, নেশায় থাকে।

ওর জিভটা খড়ের মতো শুক্‌নো। খস্‌খসে।

আমি বসছি। তুমি তৈরী হয়ে নাও। একসঙ্গে একটু বেরোব বলে এসেছি। কাজ আছে।

কয়েকদিন হোল সতীনাথেরও কিছু কাজ জমে আছে। তার কিন্তু-কিন্তু ভাব দেখে মোহন মিত্র বলেন, বুঝেছি। কিন্তু ওসব তো কোনদিনও শেষ হবে না ভাই। আমার মতো তুমিও একদিন কোনো এক সতীনাথ রায়ের হাতে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে কাঁধে ছড়ি ফেলে ধীরপদে যখন বেরিয়ে যাবে, সেদিনও মনে হবে, ওমুক কাজটা আরো ভালো কোরে শেষ করে গেলে হোত! তমুক কাজটা ঠিক মনের মতো কোরে শেষ তো করে গেলাম না! তখন বারবার ফিরে ফিরে চেয়ে দেখতে ঘাড় আপনিই বেঁকে-বেঁকে আসবে এই রেঞ্জ অপিসের দিকে। তবে তোমার সেদিন চোখ ফিরে আসবে আরো বড় অপিশের দিকে জানি। কেন না, সবাই তো আর মোহন মিত্র নয়।

সতীনাথ বলে, মোহন মিত্র হতে পারলে ধন্য হয়ে যেতাম দাদা। আমি যেন তাই হই। তার চেয়ে বড় আর কিছু হবার স্পর্ধা করি না।

মোহন মিত্র অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন সতীনাথের মুখের দিকে। কপালের রেখাগুলো একটু কেঁপেও ওঠে।

টেবিলের ওপর থেকে একখানা ফরেস্ট জার্নাল তুলে নিয়ে অহেতুক নাড়াচাড়া করতে করতে মোহন মিত্র বলেন, যাও, তৈরী হও। আমি বসছি।

বিজলী!

হুজুর।

বিজলা জানে, পুরোনো সাহেবের ডাকে নাম তার ঘনঘন বদলাতে পারে। কখনো বিজুলী, কখনো বিজলা, কখনো বিজ্‌লী। আবার কখনো বা বিজল। ঐ তিনটি অক্ষর যে কোনো ভাবে উচ্চারিত হলেই হোল। বিজলা জানে। তাই ছুটে আসে। হুজুর, বলে এসে সামনে দাঁড়ায়!

মোহন মিত্র নিচু গলায় বলেন, রুটি-মাখন-ডিম। শুধু তোর সাহেবের জন্যে। আমার জন্যে সিরিফ্‌ এক কাপ আরো লাল চা। যা। ঝটপট্‌।

স্নানঘর থেকে বেরোতে বেরোতে সতীনাথ বলে, দাদা, আর যদি আপনাকে বাড়ী ফিরতে না দিই ?

তার মানে ?

হাতের জার্নালটা টেবিলের একপাশে ঠেলে দিয়ে কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করে প্রশ্ন করেন মোহন মিত্র। —আবার এখানে ? আর নয় ভাই। এ পাঠ চুকিয়ে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। প্রাইভেট কোম্পানীর কাজে তবু কিছু স্বাধীনতা আছে। সরকারী কাজে ? রাম বল। ছোট থেকে বড় অবধি সবাই ওপরওয়ালা। যেন দাম্‌কি দিতে পারলেই ঠাট বজায় রাখা হোল। সবাই superior. সবাই officer, এমন ভণ্ডামী ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত ঠাসাঠাসি হয়ে আছে, বুঝতে পারলেই দমবন্ধ হয়ে আসবে। তাই তোমায় একদিন বলেছিলাম, ওপরওয়ালাদের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে যেও না সতীনাথ। It does not pay. বিবেক বলে যাদের কোন বলাই নেই তাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বের চেয়ে মূর্খামী আর কিছু নেই। অনেক মূল্য দিয়ে পঁয়ত্রিশ বছরে এই সোদ্দা কথাটুকু বুঝতে শিখেছি। পাঞ্জা লড়াব অনেক বড় বড় শক্তি আরো রয়েছে। কব্জিতে তেমন জোর করা চাই, যাতে তাদের হারিয়ে দেওয়া যায়। সে দ্বন্দ্বের প্রতিপক্ষ হিসেবে ওদের গণ্য করতেই নেই। ওরা বেলুন। ফু,—ফস্‌।

বিজলা চা ও খাবার দিয়ে গেল টেবিলে।

একি, আপনি কিছু নেবেন না ?

না। বয়েস হয়েছে।

মনটা তো কাঁচাই আছে।

কেবলমাত্র মনের জোর দিয়ে সবকিছু হজম করা সম্ভব না-ও হতে পারে। তুমি খাও। আমি চায়ে চুমুক দিই আর দেখি। তোমায় দেখলে আমার জঙ্গলে আসবার প্রথম দিনগুলো মনে পড়ে যায়।…কত উৎসাহ, কত কর্তব্যবোধ, honesty. কোথায় সব তলিয়ে যায় !

আবার বলেন, এই machinaryটাই চায় না সত্যিকারের কাজ। অথচ বড় গলায় duty, honesty বলে সবাই চেঁচায়। এই contradictionটাই একদিকে দাস-মনোবৃত্তির জন্ম দেয়, অন্যদিকে frustration. ফলে আদৎ কোন কাজই হয় না। অয়েলিং-ক্লিনিংটাই সার। সেলামে-খিদ্‌মতে ওপরতলা

বুঁদ্‌। দাপটে-শাসানীতে নিচের তলা চোর। ব্যস্‌। দশটা-পাঁচটা এইভাবেই চলছে বারোমাস।

সতীনাথ প্রশ্ন করে, চাকাটা ভুল ঘুরছে মানি। তাই বলে নিজে স্বেচ্ছায় তারই মধ্যে যেটুকু করণীয় বলে গছে নিয়েছি, সেটুকু সুসম্পন্ন করবার চেষ্টা করব না?

মোহন মিত্র বললেন, চেষ্টা করে দেখ। পারবে না। চক্করটাই উল্টো কাটছে। তুমি তার ভেতর বসে সোজা কাটাতে গেলেই ছিটকে বাইরে পড়ে যাবে। তবেই না বলেছিলাম, বিবেক বস্তুটাকে একটু ঘোমটা দিয়েই রেখ।

কষ্ট হচ্ছে আপনার কথাটা মেনে নিতে।

আমারো হয়েছে। কষ্ট হলেই ভুলগুলোর সঙ্গে কিলোকিলি করতে মরিয়া হয়ে উঠবে। আমিও উঠতাম। তাইতো মরেছি। হয়নি কিছু।

সতীনাথ চিন্তিত মুখে নিরুত্তর বসে রইল কিছুক্ষণ।

তারপর কি ভেবে বলে ফেলল, তাই বলে…

বাধা দিয়ে মোহন মিত্র বললেন, বুঝেছি। কর্তব্য-অবহেলার প্রশ্নটা মনকে বড় বেশি ঘা দিচ্ছে। তাই না?

ঠিক তাই।

তাহলে আগে ভেবে দেখা দরকার, কর্তব্যটা কি? তবেই না তারপর প্রশ্ন আসবে অবহেলা করলাম কি না। যত নিয়মকানুন, বনজঙ্গল আর তার অধিবাসীদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে, সেগুলো কিসের জন্যে? জঙ্গলের মঙ্গলের জন্যে। এখানকার মানুষদের সুখসুবিধের জন্যে। এইতো?

ঠিক তাই।

কিন্তু কার্যকালে কি দেখা যাচ্ছে? একটাও আসল জায়গায় কাজ করছে না। কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু গোলমাল থেকে যাওয়ায় জঙ্গলেরও সর্বনাশ হচ্ছে, বনবাসীদেরও যন্ত্রণা দিনদিন বেড়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, সে কথা ঠিক।

তবে? বলবে, execution ঠিক মত সবাই করছে না। বাজে কথা। না যদি হচ্ছে, হওয়াচ্ছেন না কেন ওঁরা? পারেন না বলেই। চেষ্টা করে দেখেছি, অনেক কষ্ট করে দেখেছি। বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। সুন্দর একটা মোটরগাড়ি। ইঞ্জিনের বদলে সেখানে দুটো ছাগল জুড়ে দিয়ে তার লেজ কষে

মল্‌তে থাকলেই কি স্পীড্‌ উঠবে ভাই? খোল নোল্‌চে বেবাক্‌ ঝেড়ে না বদলালে কোন উপায় নেই।

বেশি কর্তব্যপরায়ণতা দেখাতে গেলেই লেগে যাবে ওপর-ওয়ালাদের সঙ্গে নির্ঘাৎ ঠোকাঠুকি। কারণ, ওপর-ওয়ালাদের-ও তো আবার ওপরওয়ালা আছেন। সেখানেও সেই অয়েলিং ক্লিনিং আর দাপট দাপানির সম্বন্ধ। যত ওপরে উঠবে, তত বেশি পঙ্কিল। আরেকটা কথা। যত ওপরের হুকুমৎ, তত জঙ্গল সম্বন্ধে তাদের অনভিজ্ঞতা। তাহলে কি দাঁড়ালো হিসেবটা? জঙ্গল আর বনবাসী, কারো মঙ্গল সাধনই এ যন্ত্র দিয়ে করা যাবে না। তবে তুমি আমি মরুভূমিতে কুয়ো খুঁড়তে গিয়ে হয়রান হয়ে মরি কেন? হ্যাঁ, মরলেও যদি কুয়োটা খোঁড়ার কাজ সফল হোত, নিদেন, সফলভাবে কিছুটাও এগোতো, তাহলে না হয় সে মহৎ কাজের জন্যে জীবনটা উৎসর্গ করে একটা তৃপ্তি ছিল। হাওয়ায় ইট ছুঁড়ে মহল গড়া যায় না সতীনাথ।

সতীনাথ নিঃশব্দে এবার একটু হাসল। তারপর চিন্তা করে বলল, কোথাও কোনো একটা গোলমাল আছেই।

—নইলে সব কিছু থেকেও কিছু হচ্ছে না, করা যাচ্ছে না কেন? দেখ, বর্তমানের আইনে এই মানুষদের জমি সুদের দায়ে বিকোতে পারে না। কিন্তু ঠেকানো যাচ্ছে? ফুটো আছে আইনের সারা গায়ে। বদবুদ্ধির কারসাজিতে ঠিক গলিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে। তাই বলে অপরাধের সাজা দেবে না, তেমন কথা নেই। যেটুকু আইনের দড়ি হাতে আছে, তাই দিয়ে আচ্ছা করে বেইমানদের বাঁধবে। এই হোল duty. সেখানে honest থাকলেই হাত-পা কাটা অবস্থাতেও আমরা কিছুটা গড়িয়ে গড়িয়ে যেতে পারব। সে পথে যত বাধাই আসুক, পাঞ্জা কষতেই হবে। তার জন্যে কব্জিতে জোর রাখতেই হবে। বেলুন-মার্কা কতকগুলো হামবড়া বাজে ওপরওয়ালার সঙ্গে পাঞ্জা কষতে গিয়ে কব্জির সে জোর অপব্যয় করার মূর্খতা থেকে আমরা মুক্ত থাকব। হাজার হাজার এইখানকার মানুষ। কতবড় সম্পদ? তাদের দয়া দেখাবার স্পর্দ্ধা না রেখে, এসো আমরা পাশাপাশি চলি, সহযোগিতা করি।

সতীনাথ বুঝতে পারে, কেন মোহন মিত্র অবসর নেবার পরও অরণ্য ছেড়ে যেতে পারেন নি। কেন তরুবালা ছেলেমেয়েদের মুঙ্গেরে উকিল ভাইয়ের কাছে রেখে নিজে মোহন মিত্রের সঙ্গেই রয়ে গেলেন।

মোহন মিত্র বললেন—হাজার হাজার মধুর-রূপা বাসব-রতন মাঝির এই অঞ্চল। এই অঞ্চল, যে মাতাল মেয়েটাকে ওরা পোড়ালে, তার। একটু থেমে বললেন, দেখবে না ? তাদের সবাইকে তুমি দেখবে না সতীনাথ ? কত বিচিত্র জীবন। দুচোখ মেলে দেখবে না সে জীবনের তরঙ্গ।-তবে বৃথাই চাকরী নিলে। জিন্দা দিল না হলে অরণ্যে চাকরী করতে পারবে না তুমি।

সতীনাথ একটু দেরি করে বলে, এর উত্তর আপনাকে অন্য একদিন দেব। আজ না।

সাবাস, বলে উঠে দাঁড়িয়ে সতীনাথের পিঠে চাপড়ে দিলেন সস্নেহে মোহন মিত্র। আমি অপেক্ষা করে থাকব সতীনাথ।

চল, ওঠা যাক।

নয়

মোহন সতীনাথকে যতটা অবাক করে দেবে ভেবেছিল, ততটা না হলেও সতীনাথ অবাক হয়েছে বৈকি।

এই সুলতা ? যার নামে কত গল্প ছড়িয়ে আছে ঝালুকপোখরের বনাঞ্চলে ?

হ্যাঁ। এই সুলতা। অবিনাশের আশা-আকাঙ্খাটুকু আজো যে বহন করে চলেছে তার চলনে-বলনে, আদব-কায়দায়। শিক্ষার বড় বড় সার্টিফিকেট-ধারী অনেককেই দেখেছে সতীনাথ। যাদের মন তবু শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে নি। ওপরের খোলসটা ছাড়া আর সবই যেখানে একেবারে নক্কার-জনক। সামান্য একটু হাওয়ার ছোঁয়ায় ওপরের সে সাজানো খোলোস কেমনভাবে মিলিয়ে গিয়ে ভেতরের সমস্ত দৈন্যকে একেবারে সূর্যের আলোর মত পরিষ্কার বাইরে মেলে ধরে, বয়েস অল্প হলেও, সতীনাথ তেমন মেয়ের পরিচয় যে একেবারে পায়নি কোন দিন, সেকথা সত্য নয়। নারী সম্বন্ধে তারাই জাগিয়েছে হয়তো সতীনাথের মনে একটু অবহেলা। শঙ্করীকে মনে পড়ে সতীনাথের। কলেজ জীবনে যে শঙ্করী সতীনাথের অনেক রাতের ঘুম কেড়ে নিত। কবিতা লেখার প্রেরণা জোগাতো। একদিন হঠাৎ হোঁচট

খেয়ে সতীনাথ আবিষ্কার করল শঙ্করী শিক্ষিত বটে কিন্তু ওর মনটা অনেক নিচে তলিয়ে আছে, প্রায় পাঁকের কাছাকাছি। সেদিন থেকে সতীনাথ কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছিল। পুরোন খাতাটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ছিল।

তাই বলে সতীনাথ নারীর ওপর সব বিশ্বাস হারিয়েছিল একথা বললে তার ওপর নিশ্চয়ই ঘোর অন্যায় করা হবে। তার প্রমাণ নন্দিতা। নন্দিতা আর বিকাশকে দেখে সতীনাথ মুগ্ধ হয়েছে। বলেছে, মানুষ মানুষকে এমনি করে ভালবাসতে পারে দেখলে মনটা ভরে যায় বিকাশ। বিকাশ মৃদু হেসে বলেছিল, নন্দিতাকে ছাড়া এমন করে ভালবাসা যায় না সতীনাথ। ব্যর্থতা সৃষ্টির অনেক উপকরণ মেলে, সার্থকতার সাধনা, সে বড়ো কঠিন। মানুষ মানুষকেই তো ভালবাসবে সতীনাথ।

বিকাশের কথা সতীনাথ বিশ্বাস করেছিল। বলেছিল, ছেলেবেলার পর হাত-পা বড় হয়ে উঠলেই সকলেই কিছু মানুষ হতে পায় না বিকাশ। এক বস্তা ডিগ্রী কাঁধে বয়ে বেড়ালেও নয়।

বিকাশ চুপ করে ছিল।

বুঝেছিল, সতীনাথ শঙ্করীর কথা ভুলতে পারে নি। সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেনি বিকাশ। বলেছিল, শঙ্করীদের চেয়েও জীবনটা অনেক বড় সতীনাথ। সেখানে নন্দিতারাও আছে। সতীনাথ বেশ জোর দিয়েই বলেছিল, নিশ্চয়ই। কথাটা আজ তার হঠাৎ কেন মনে পড়ল সুলতাকে দেখে, সতীনাথ বলতে পারে না। ঘোড়ায় চড়া, কাঁচবাংলার কড়া শাসক অবিনাশের মেয়ে, সুলতা যে আরো বেশি কঠিন, আরো বেশি হিসেবী, এই গল্পই শুনে এসেছে সতীনাথ সবার কাছে। কিন্তু সেই সুলতা যে এমন সহজ, ভাবতে একটু অবাক লাগবেই তার। তবে মোহন তাকে যতটা অবাক করে দেবে ভেবেছিল, সতীনাথ ততটা অবাক হয় নি।

মোহন বলে, কি ভাই চুপ্‌সে গেলে কেন?

সতীনাথ উত্তর দেয়, এতবড় কাজ আপনার ছিল ভাবতে পারি নি। সাত সকালে বিছানা থেকে টেনে এনে কাঁচবাংলার সুলতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার মতলব এঁটেছিলেন, সে কথা বুঝতে পারি নি।

রাগ করলে না তো?

কি আশ্চর্য! মানুষে মানুষে এমনি করেই তো পরিচয় ঘটে। অবশ্য আপনার যদি অন্য কোন গভীর উদ্দেশ্য না-থেকে থাকে।

মানে, যত বড়ই হোক, নারী-পুরুষ যেই হোক, ঠিকেদার ঠিকেদারই হয়। নইলে তার ব্যবসা চলে না।

তেমন কোন গন্ধ পেলে কি?

না। আপনার মতলব ঠিক বুঝতে না-পেরে কথাটা বললাম। সুলতা ঠিকেদার, আমি সরকারী অফিসার। একে অপরকে ঠিক এই একটি জায়গায় পাশ কাটাবার চেষ্টা না করলেই হোল।

মোহন বলে, বুঝেছি। তুমি ভাবছ দুজনের আলাপ করিয়ে দিলাম কাঁচ-বাংলার সুযোগ-সুবিধে করে দেওয়ার জন্যে। মানুষের তখ্‌মাটাই তার আসল পরিচয় নয় সতীনাথ। একটু থেমে আবার বলে, ইসিটশনে fire লেখা লাল বাল্‌তিগুলো ঝুলতে দেখেছ? ওগুলোতে আগুন থাকে, না জল? কিম্বা বালি? অতদূরে যাবে কেন? হেড অপিসে চলে যাও, পুরণ সিং চাপরাশির তখ্‌মায় কি লেখা আছে? Chief Conservator of Forests, Bihar. তাই না?

সতীনাথ হেসে বলে, আপনিই না বলেন, it is a curse to be under the rule of a woman? মেয়েদের হয়ে হঠাৎ আজ এমন ওকালতি শুরু করলেন কেন দাদা?

সুলতা চলে যাওয়ার পর তরুবালা ঘরের কাজে ব্যস্ত ছিল টিকৃটিকে উৎকলবাসী হরির সঙ্গে। এবার এগিয়ে এসে বলে, তা জানো না? যে কথা উনি যত বেশি জোর দিয়ে বলেন, তার পেছনে ওঁর ততবড় দুর্বলতা লুকোন থাকে।

মোহন মিত্র তরুবালাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, নারী সম্বন্ধে curse কথাটা আমি সুন্দরমুদের দলকে ঠেকিয়ে রাখতে বলি সতীনাথ। তবে curse যে কোথাও একেবারেই নয়, তেমন কথা বুকঠুকে বলতে কি পারবে ভাই?

সতীনাথের মুখটা কেমন দেখাল হঠাৎ। হয়তো ওর শঙ্করীর কথা মনে পড়ে থাকবে।

মোহন তাকে চুপ করে থাকতে দেখে এবার একটু জোর দিয়েই জিজ্ঞাসা করে, বল?

সতীনাথ বলে, ঠিক বলেছেন। তরুবালা বলে, নাথ সাহেব, ওমনি দাদার কথায় সায় পেড়ে গেলে তো?

সতীনাথ জবাব দেবার আগেই মোহন মিত্র বলে ওঠে, আরে বাবা আঁতুড় ঘরে প্রথম মাটি ছুঁতেই তো under the rule of women, প্রথম আশ্রয়ই তো নারীর কোল। প্রথম শব্দ উচ্চারণ, সে-ও তো ঐ নারীর কোলেই।

সতীনাথ তরুবালার দিকে চেয়ে উৎসাহ দিয়ে বলে, নিন এবার হোল তো?

তরুবালার মুখে বিজয়িনীর গর্বিত হাসির একটা ঝলক দেখবে বলে সতীনাথ হয়তো আশা করে ছিল। কিন্তু তার বদলে সতীনাথ দেখল মমতার এক স্নিগ্ধ ছবি। কারণ, তরুবালা মোহন মিত্রের জীবনকে জানে। সতীনাথ এখনো জানে না। পরিবেশটাকে একটু লঘু করার উদ্দেশ্যে তরুবালা বলে, জানো না, একবার এক অধ্যাপক বন্ধুকে মুঙ্গেরে কি বলে মুখের ওপর জবাব দিয়েছিলেন?

কি? সতীনাথ উৎসুক হয়ে চেয়ারটা টেনে নেয় আরো কাছে।

তরুবালা বলে, আমার এক দূর সম্পর্কে মামাতো বোন বেড়াতে এসেছিল সেবার। তখন ইনিও সেখানে। অধ্যাপক বন্ধু পাটনা যাবেন তাঁর কাজের জায়গায়। আমার মামাতো বোন বুলা-ও পাটনা যাবার ঝোঁক ধরল তার ছোট কাকীর কাছে। ইনি বন্ধুকে বললেন, বুলাকেও সঙ্গে নিয়ে যা। পাটনা যেতে চাইছে। যাক। ওর ছোটকাকীর কাছে। ভাদ্রমাস, বোধ হয় তালের বড়াটড়া খাবার সাধ হয়েছে বুড়ির হাতে। তা, এঁর অধ্যাপক বন্ধুটি···মাঝপথে মোহন মিত্র তরুবালাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, মর‍্যাল্ গলিয়থ্, বন্ধু বল। শুধু অধ্যাপক অধ্যাপক বারে বারে আওড়াচ্ছ কেন?

তরুবালা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে বলে, বাকিটা তুমিই বল। তোমার যা ভাষা, ওসব মুখে আনাও যায় না।

মোহন মিত্র বলে, তা না গেলে ব্যাপারটা বলা হবে কি করে?

না। তুমিই বল।

মোহন বলে, রা কাটব না, অথচ উপভোগের বাসনা ষোল আনা।

ধমক দিয়ে তরুবালা বলে, আঃ, বুলার পাটনা যাওয়ার কথাটা বল না।

সতীনাথ বলে, আমার কিন্তু আর ধৈর্য থাকবে না বউদি।

উনিই বলবেন।

বেশ। বলছি।

মোহন মিত্র আরম্ভ করলেন, অধ্যাপকটি নিজেকে একজন মস্ত মর‍্যাল গলিয়থ বলে প্রচার করে বেড়াতেন। এ সব ক্ষেত্রে যা হয় আর কি। বুলাকে পাটনা অবধি নিয়ে যাবার কথা শুনে বলে উঠলো, না ভাই মোহন, সে আমি পারব না।

কেন?

মেয়ে মানুষকে বিশ্বাস করি না আমি। বুঝতে পারছ, কেমন পাঁকিয়ে উঠলো আমার ভেতরটা। একটু দম নিয়ে বলেই ফেললাম। বললাম, তোর মা-ও কি পুরুষ মানুষ ছিলেন রে শিবে? ছাত্তর পড়িয়ে পড়িয়ে নিরেট একটা গাধা হয়ে উঠেছিস দেখছি।

হেসে উঠে সতীনাথ বলল, আপনার শিবে তখন কি উত্তর দিলে?

আব্বার?...কোঁচা হাতে সুড়সুড় করে on road.

তরুবালা আর সতীনাথ হাসতে লাগল।

তার পরের কথা বল। তরুবালা স্বামীকে উস্কে দেয়।

হাঁা। একদিন সেই শিবেকে ধরে ফেললাম। রাত দুপুরে কানের মাকড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছেন চাঁদের আলোয়।

কোথায়? সতীনাথ চাপা হাসির সঙ্গে প্রশ্ন করে।

কোথায় আবার? সে-ও on road তবে নির্জন এক জংলা রোড। সঙ্গে এক নামজাদা লোকের স্ত্রী। চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, শিবে না? এখানে কি করছিস? শিবে যেন ভূত দেখে আমার চেয়েও বেশি চমকে উঠল। থতমত খেয়ে ঢোক গিলে বলল, বউদির কানের মাকড়িটা হারিয়ে গেছে। তাই খুঁজে দেখছি। বললাম, তা রাতের বেলা কেন? কাল সকালে খুঁজিস। এখন বাড়ী যা। শিবে মাথা নিচু করে সরে পড়ল। আর তার বৌদি?

আমি দেখিনি সতীনাথ। চোখ ফিরিয়ে ছিলাম। কেননা জানতাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সোনার মেডেল পাওয়া সেই অধ্যাপক মহাশয় শিবের গুরু স্থানীয় ছিলেন। তাই, তখ্‌মাটাই মানুষের আসল পরিচয় নয় সতীনাথ। ঠাকুরপোদের আমি খুব একটা বিশ্বাসের পাত্র বলে গণ্য করতে পারি

না। বলে হো হো করে হেসে উঠলো মোহন মিত্র। তরুবালা ধমক দিয়ে ওঠে, রসিকতারও একটা মাত্রা-জ্ঞান থাকা উচিত। যত বয়েস বাড়ছে ততই যেন হাল্কা হয়ে পড়ছ।

ঠিক ধরেছ তরুক্ষু, আর কিছু বয়েস বাড়লেই হাওয়ায় মিশে যাবো। পঞ্চভূতে লীন। চোদ্দ চাষ তো হয়েই আছে। বাকী আর মাত্র দুটি চাষ। ব্যস। তার পরই ধুনে কাৎরা-ক'াই।

সতীনাথ কথাটা ভাল না বুঝতে পেরে প্রশ্ন করে, কেন?

জান না? ষোল চাষে তুলো, তার অর্দ্ধেকে মুলো। তার অর্দ্ধেক ধান, বিনা চাষে পান? তোমরা আজকালকার ছেলেরা দেখছি এসব কিছুই জানো না।

তরুবালা বলে, তা না জানুক, ক্ষতি নেই ওদের। কিন্তু তরুক্ষুর মানেটা জানে। আমি কি তোমার ঘাড় মটকাতে যাচ্ছি?—ঠিকানা কি? তথ্যা দেখে মানুষ বিচার তো আমি করি নি। ছেলেবেলায় তাই নিয়ে কবিতাও লিখে ফেলেছি, ন্যাড়ার মাথায় যত চুল দেখ, চুল নেই এলেকেশীর,
জটাধারী? সেতো বেল-চাঁচ করে, বাঁদর মুখ তো শশীর।

—আপনি কবিতাও লিখতেন?

তার হাসিটা মাঝ পথে যেন অনুচ্চারিত কোন ধমক খেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। কেন সে নিজে একদা কবিতা লিখত, কেন তা জীবন থেকে ছিঁড়ে ফেলেছে, হঠাৎ হয়তো মনে পড়ে গেল সতীনাথের।

তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল মোহন মিত্র। তারপর ধীরে ধীরে বলল, ভয় পাচ্ছ কেন ভাই? প্রত্যেক জীবনই তো এক একটা কবিতা। সে রহস্য সব হতভাগা বুঝতে পারুক আর না-ই পারুক। যত জীবন, তত কবিতা। লেখ আর না-ই লেখ। বোঝ আর না-ই বোঝ! মহুয়া তলায় লাল রুবি পাথরের-ও কবিতা লেখা হয়ে থাকে সতীনাথ! রুপাদের দল সেকথা না জানলেও, থাকে।

সতীনাথ মাথা নিচু কোরে চুপ করে থাকে। তরুবালা চেয়ে-চেয়ে দেখে তাকে। কিছুক্ষণ পর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলে, আর একটু চা দেব ভাই?

সতীনাথের বদলে মোহনই জবাব দেয়, চায়ের কথা কি জিজ্ঞাসা করতে আছে তরু? এনে সামনে ধরে দিতে হয়। সকলেই তো মোহন মিত্র নয়।

জিজ্ঞাসার অপেক্ষা না রেখে দাবী জানিয়ে বসবে? সব কবিতাই তো সমান হয় না। একই বর্ষা রবীন্দ্রনাথের মনে যে ভাব জাগিয়ে তুলতো, ফুটো চালের তলায় বসে জাত-ফকিরের মনে নিশ্চয় সে ভাব জাগাতে পারে না। সে ব্যাটা তখন নিজের কাঁথা সামলাতেই অস্থির, বাতায়নে দাঁড়িয়ে 'এমন দিনে তারে বলা যায়' ভাবতেই পারবে না। খোদার চোদ্দ পুরুষের পিণ্ডি চটকাতে চটকাতে সে বর্ষাকে কেবল অভিশাপই দিয়ে যাবে। তাই যে কোন মানুষের কোন ভাবান্তর দেখলেই নির্দিষ্ট একটা সমাধানে সকলের ক্ষেত্রেই পৌঁছে ভুল কোরে বোস না। আমি গম্ভীর মুখে বসে থাকলে সামনে চা পেলে তরল হই। সতীনাথ, মানে তোমার ঠাকুরপো, তা নাও হতে পারেন। তবে টোপ ফেলে দেখতে পার, যদি কাজ হয়। মাছের সঙ্গে গপ্পো করার চেষ্টা না কোরে ফাৎনার দিকে নজর রাখ।

সতীনাথ এবার মুখ তুলে হাসবার চেষ্টা করল।

প্রথম প্রথম সে ভেবেছিল, অরণ্য মানে শুধুই জঙ্গল। এখন দেখছে সেখানেও মানুষ! রতন-বাসবরাই হোক, সুলতা সুন্দরমই হোক—মানুষ আছে। জড়িয়ে পড়তেই হবে। কোন উপায় নেই।

সহজ হবার চেষ্টা কোরে সতীনাথ হাঁক দেয়, কই বউদি চা হোল? দুপুর গড়িয়ে যেতে যে বেশি আর দেরি নেই। কাজকর্মও তো কিছু আছে।

তরুবালা বলে, কই তুমি তো কিছু বললে না ভাই? সতীনাথ উত্তর দেয়, বলার তো কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। না, মানে, কেমন লাগল তোমার?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সতীনাথ বলে, গল্প তো ওর বিষয়ে বিস্তর শুনে আসছি প্রথম দিন থেকে। এই তো প্রথম দেখলাম। বলব একদিন আপনাকে। এত তাড়া কিসের? তরুবালা বলে, মেয়েটার জীবনে শান্তি নেই। ওপরে কোন অভিভাবকও সত্যি করে নেই। ভাইটা একটা দস্যি। মিতা জুটেছে সুগ্রীব, ঐ সুন্দরম্। দুচক্ষে দেখতে পারি না লোকটাকে। কেবল টাকা গুছোবার তালে থাকে। আমাদের কাছেই আসে। মুখ ফুটে নিজের ঝামেলার কোন কথা বলে না। দেখলে মায়া হয়।

মোহন মিত্র বলে, তোমাকে আমি যেটুকু চিনেছি সতীনাথ তাতে তোমার

সম্বন্ধে যে ভুল গল্পকথাগুলো সুন্দরবনের চেষ্টায় কাঁচবাংলায় ছড়াচ্ছে, মেনে নিতে পারি নি। পারিনি বলেই সুলতাকে আজ এখানে ডেকেছিলাম। ও আমার মেয়ের মত। বলেছিলাম, তুমি দেখলে বুঝবে, সতীনাথ অমানুষ নয়। তোমাকে আগে বলিনি। বললে, জানতাম তুমি আমাদের ভুল বুঝবে। সে ভুল ভাঙান বড় শক্ত হবে আমার পক্ষে।

সতীনাথ চুপ করে বসে শুনে যাচ্ছিল। কোন উত্তর দেবার তার ইচ্ছা ছিল না।

মোহন মিত্র আবার বলে, ঐ মেয়ে, ঠিকেদার হতে পারে কিন্তু এ অঞ্চলের সব মানুষের সুখদুঃখে সমানভাবে আমার সঙ্গে এগিয়ে আসে। এতবড় মনটা ওর। ভাগ্য-বলে তোমার মত দোসর পেয়েছি এই অরণ্য জীবনের সাঁঝবেলায়। কেমন কোরে তোমাদের আলাদা রাখি, বল?

আবার বলে, তোমার কাছ থেকে সুলতার কোম্পানীর জন্যে কোন সুযোগ আদায় করে দেবার মতলব আমার নেই সতীনাথ। গোপন সুযোগ আদায় করার মেয়ে নয় সুলতা। তুমি দেখো। আমার আজকের কথার সত্যতা সম্বন্ধে তোমার যদি কোনদিন কোন সংশয় জাগে, ভুলে যেও মোহন মিত্র নাম।

—ছি ছি একি বলছেন আপনি? সতীনাথ একটু যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে।

—হ্যাঁ সতীনাথ। মেয়েমানুষ জীবনে অনেক দেখেছি। নিজের পেটের সন্তানকে বিষ দিয়ে মারতে মা-কেও দেখেছি জঘন্য স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে, আবার দেখেছি, অপরের সন্তানের কল্যাণ কামনায় সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে, সে-ও মেয়েমানুষ। তাই, সুলতা আমারই মেয়ে। এ সিদ্ধান্তে একদিনে আমি পৌঁছই নি সতীনাথ। তুমি শুধুই তাকে ঠিকেদার বলে ঘৃণা করলে আমার বুকেও বাজবে।

মোহন মিত্রকে এতটা আবেগময় হতে সতীনাথ দেখেনি। প্রথম চার্জ দিয়ে যেদিন রেঞ্জ কম্পাউণ্ডের গেটটা খুলে ছড়ি কাঁধে ফেলে পথে নেমেছিলেন, সেদিন সতীনাথ লক্ষ্য করেছিল চোখদুটো তাঁর কিঞ্চিৎ বাষ্পাচ্ছন্ন। পা দুটো একটু বেসামাল। তারপর আর কোনদিন মোহন মিত্র এমন করে হঠাৎ হারিয়ে যান নি নিজের দুনিয়া ছেড়ে অন্য দুনিয়ায়। তাই সতীনাথ একটু বিব্রত হয়ে পড়ল যেন।

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন দাদা, মানুষ সম্বন্ধে আমিও শেষ সিদ্ধান্ত হঠাৎ টেনে ফেলি না। বিশ্বাস করুন।

মোহন মিত্র যেন একটু সহজ হয়ে উঠলেন। বললেন, কাঁচবাংলা আর স্থলতাকে এক কোরে গুলিয়ে ফেল না সতীনাথ। ও দুইয়ের কোন মিল নেই।

॥ দশ ॥

এ অঞ্চলে রতনডিহির হাটের নামডাক আছে। জংলী গাঁয়ের হাট। কিন্তু বড় হাট। দূর দূরাঞ্চল থেকে গাঁয়ের মানুষ রতনডিহির হাটের নামে ছোটে।

রং-এর হাট। উৎসবের হাট। তারই মাঝে চলে কতো মন দেওয়া নেওয়ার পালা। আবার কোথায় বন্ধকী কাগজে টিপসই দিয়ে জীবনের সমস্ত সঞ্চয়কে চিরকালের জন্যে বিকিয়ে দিয়ে ফিরে যায় অসহায় মানুষ—সেও এই হাটতলা থেকেই।

সপ্তাহের ছ'টা দিন ওরা অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে থাকে এই হাটের দিনটির জন্যে। অবাধ মেলামেশা আর প্রাণোৎসবে হাটের দিনে সবাই মাতবে বলে দিন গোনে। এই লোভে সমস্ত পরিশ্রম সব বঞ্চনাকে যেন ওরা ভুলে যেতে চায়। আজ আর কোন কাজ নয়। কেবল প্রাণবন্যায় ভেসে যাওয়া। তারপর তো আবার সেই ছ'টা দিন, প্রতিটি ক্ষণের সংগ্রাম-ভরা। জীবনের আহ্বানে মৃত্যুকে পরাস্ত করার সে এক কঠিন তপস্যা। এক একটি মুহূর্ত মৃত্যুর পাঁজর থেকে ছিঁড়ে এনে বেঁচে থাকা। সেইতো জীবন ওদের। তবে কেন মাতবে না আজ? কেন ভেসে যাবে না উৎসবের স্রোতে?

হাটের দিন ওদের উৎসবের দিন।

সকাল থেকে সাজ গোজের পালা শুরু হয়েছে। ঘষেমেজে পাথর-কালো বরণকে ওরা এমন রূপ দিয়েছে, দেখলে মনে হয়, কালোর চেয়ে আর কিছু যেন সুন্দর নেই। সুন্দর হয় না।

মোটাখাটো শাড়ী ক্ষার দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করেছে মেয়েরা। সস্তা সাবান দিয়ে মাথার চুলকে করেছে ফুরফুরে। কেউ বা আবার করঞ্জের তেল দিয়ে পাটি-

কেটেছে। আঁট করে সুন্দর ঢংএ খোপা তুলে দিয়েছে একেবারে নিখুঁত, যা দেখলে অতি আধুনিকার মনেও ঈর্ষা জাগা স্বাভাবিক। সে বাহারি খোপায় গুঁজেছে পলাস অথবা মহুয়া ফুলের গুচ্ছ। পায়ে রূপোর বেঁকিমল। গলায় ঝুটোমুক্তোর মালা। কারো কারো ওপর হাতে কাঁসার বাজুবন্ধ। মুখে প্রাণ ঢালা হাসি। দমকে দমকে সমস্ত অঙ্গ বারবার এঁকে বেঁকে ওঠে। কি অপূর্ব মানিয়েছে। চলনে বলনে হাসিতে যেন প্রাণে বন্যা ছুটিয়ে সবাই ধেয়ে চলেছে হাটের পথে। হাট যে ওদের কাছে কী মহা আকর্ষণ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। কোনো দিকে চেয়ে দেখবে না। কেউ ডেকে কথা বললেও শোনবার অবসর নেই। হাটে না পৌছলে হাঁফ ছাড়ার উপায় নেই।

তেমনি যুবকরাও। চুলে রং-বেরং এর ফিতে বেঁধে হাতে রূপোর বালা, গলায় মুগার মালা, নানা রংএর পালক দিয়েছে মাথায় গুঁজে। হাতে বাঁশি। সুর তুলে প্রায় ছুটে চলেছে হাটের পথে।

হাটুরের দল ছুটেছে। নানান বোঝা নিয়ে।

জিনিস কেনা-বেচাই এদের হাটের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। বিয়ে-শাদী, সমাজ ব্যবস্থার নানান সমস্যার সমাধান, সব কিছুই এদের হাটের দিনের জন্যে তোলা থাকে।

ধামায় কৃপণ মাটির বুকে ফলানো চালের বাহার। কোথাও শব্জি শাক্, তরিতরকারী, মহুয়ার সারি। কোথাও সস্তা রূপোর গহনা, সৌখীন পুঁথির আর মুগার মালা সাজানো। জোড়ায় জোড়ায় যুবক যুবতী ভিড় করে আছে সেখানে। কোন্ মালায় আংটিতে প্রেয়সীকে তার সব চেয়ে বেশি মানাবে তারই হিসেব করছে অনেকে। মনের মত সাজিয়ে চিবুক তুলে ধরে দেখাচ্ছে আর সবাইকে, দেখ আমার প্রেয়সীকে কেমন মানিয়েছে। এমন সুন্দর আছো আর কেউ ?

মেয়েটা হেসে গড়িয়ে পড়ছে। পিঠ জড়িয়ে ধরে পায়ের তালে তালে প্রিয়ের সঙ্গে উধাও হয়ে যাচ্ছে।

একধারে আম আর শালের গাছের ছায়ায় বসেছে পানোৎসব। বড় বড় জালায় আনা হয়েছে ডিয়াং। কাঠের হাতা ডুবিয়ে মাপ করে পাতার দোনায় ঢেলে দিচ্ছে নানান বয়সের মেয়েরা। দুজন বুড়ি কোঁচকানো চামড়ায় অস্পষ্ট

চোখে দাঁড়িয়ে দেখছে সব। উৎসাহ দিচ্ছে সবাইকে। কানে তাদের মোটা শোলার খিল।

দলে দলে মানুষ আসছে। আকণ্ঠ পান করছে। প্রাণভরে পান করাচ্ছে আপন আপন প্রিয়জনকে। আজ কোন বাধা নেই। আজ হাটের দিন। উৎসবের দিন। জীবনকে যেন ওরা এই একটা দিনেই সব দিক থেকে উপভোগ করে কতুর হয়ে যেতে চায়। ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে চায় যত গ্লানিভার।

বেলা একটু পড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মাদলের বোল উঠেছে খিতিং তানাং তানাং তানাং—যুবতীরা একে অপরের কোমর জড়িয়ে গোল হয়ে মাদলের তালে তালে নেচে চলেছে অবিশ্রাম। গাইছে। অফুরন্ত সে গান। যৌবনের স্তব গান। ফিরে আবার মাদলের নতুন বোল উঠছে, খিতাং তানাং খিং তাং খিং ·····

একদিকে এমনি যখন অভঙ্গ নাচ গান আর পানোৎসব চলেছে, তখন হাটের আরেক দিকে হঠাৎ এক হৈ-চৈ কাণ্ড বেধে গেল।

বেশ কিছু লোক, কেউ টাংগি হাতে, কেউ লাঠি হাতে, কেউ বা নিজের খালি হাতটাই শূন্যে বাঁই-বাঁই করে বীরদর্পে ঘোরাতে ঘোরাতে সেদিকে ছুটে চলল।

প্রত্যেকেরই চোখমুখ ডিয়াং-এর নেশায় টসটস্ করছে। ফেটে পড়ছে। তবু সবাই ছুটছে। টলতে টলতে ছুটছে।

ব্যাপার কি ?

ডেমোচন্ত্রির রোগা ছোঁড়াটা ধরা পরেছে। সে নাকি এতদিন প্রেমে ফাঁকি দিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল। আজ ধরা পড়েছে।

আজ সে তার নতুন প্রিয়ার সঙ্গে মহাআনন্দে আরেক দিকের নৃত্য উৎসবে যোগ দিয়েছিল। পূর্ব প্রেয়সীর ভাই আবার সেখানে মাদল বাজাচ্ছিল। নেশার জবর ঘোরেও রোগা ছোঁড়াটাকে তার চিনতে অসুবিধে হয় নি। মাদল নামিয়ে রেখে, তবে রে শালা, বোলে ছোঁড়াটার ওপর লাফিয়ে পড়েছিল। কথাটা খুলে বলবার আর কোনই দরকার ছিল না। সবাই বুঝে নিল। আর যাবে কোথায় ? হৈ-হৈ শব্দে সবাই ঘিরে ফেলল ছোঁড়াটাকে তার নতুন প্রেয়সী সমেত।

ছোঁড়াটাও নেশায় চুর। ঠিক মত দাঁড়াতে পারছে না। তার ওপর চড় চাপড় পড়তেই মাটিতে পড়ে গেল। নতুন প্রেয়সী কাঁদতে কাঁদতে তার হাত ধরে অতি কষ্টে টেনে তুলল। সকলের গালমন্দ শুনে সে বেচারি তো কেঁদে আকুল! নেশায় সে-ও টলছে।

পূর্ব প্রেয়সীর পিতা রক্ত চক্ষু বিস্ফারিত করে বললে, টাকা ফেল।

টাকা? বোকার মত অবাক হয়ে বলল ছোঁড়াটা।

হ্যাঁ, টাকা। ফেল শিগগির।

ছেলেটা হাত উল্‌টে জড়ানো গলায় অতিকষ্টে বললে, একটি কড়িও নেই বাপু। বিশ্বাস কর।

তবে জান্ দে।

এইবার নেশার ঘোরটা তার কিছুটা তরল হোল।

চম্‌কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, জান্?

হ্যাঁ, জান্।

সে তো আমার কাছে আর নেই।

নতুন প্রেয়সীর মাথায় হাতটা কোনরকমে তুলে দিয়ে বলল, এই, এর কাছে। আমার জান্ বন্ধিক্।

ততক্ষণ পূর্ব প্রেয়সী ছুটে এসেছে। সেও টলছে।

চীৎকার করে বলল, কি বললি? ওর কাছে? তারপর মাতাল মেয়েটা আর অপেক্ষা না করে একেবারে লাফিয়ে পড়ল ছোঁড়াটার ঘাড়ে। এলোপাথারি মারের চোটে ছোঁড়াটার মদ খাওয়া চক্‌চকে মুখটা আরো ফুলে উঠল। প্রাণভয়ে ভিড় ঠেলে মরিয়া হয়ে ছুট দিল। কোথায় তখন তার নেশার ঘোর, আর কোথায় নতুন আমেজ! ছুটছুট। এঁকে বেঁকে এদিক সেদিক পড়িমরি ছুট দিচ্ছে রোগা ছোঁড়াটা। ঠিক সমান বেগে তার পিছু পিছু ছুটে চলেছে প্রথম প্রেয়সী! হাটের মানুষের নাগালের বাইরে ওরা দুজনেই ছুটে পালিয়ে গেল।

কিন্তু জুয়াড়ীদের সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

তারা অবিরত হেঁকে চলেছে, লাল-কালো, কালা-লাল। হেই কালা। হেই লাল।

বাজী ধরেছে, চার আনা। আট আনা।

মোরগের লড়াই আরম্ভ হয়েছে।

অনেকে কোলে তাগড়া মোরগ নিয়ে অপেক্ষায় আছে। সাদা। চিত্তকাবরা।

লড়াইয়ে মত্ত দুটি মোরগের রং-এর ওপর ঘনঘন বাজী ধরা হচ্ছে। কেউ বলছে লাল জিতবে, কেউ বলছে কালা। বেশ, ধর বাজী।

খেলা জমে উঠেছে।

পায়ে বাঁধা ছোট্ট তীক্ষ্ণ ছুরিটা চতুর মোরগ বিপক্ষের লড়াকু মোরগের ঘাড়ে বারবার বসিয়ে দিতে ঝাপ্টা মেরে উড়ে-উড়ে যাচ্ছে। দাঁ করে আরেকটা পায়ে বাঁধা ছুরি ঝলকে উঠছে আক্রমনকারী মোরগের একবারে মাথার কাছে। লাল কালা আবার দূরে দূরে পালিয়ে এসে বসে বসে ধুঁকছে। আবার ছুটে গিয়ে মুখোমুখি লড়াইয়ে মাতছে। কেউ কম যাবে না। যাবার উপায় নেই। হয় ঘায়েল কর, নয় ঘায়েল হও। এছাড়া কোন উপায় আর তাদের নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে দুচার ফোঁটা রক্ত দেখা দিচ্ছে। পালক ঝরে পড়ছে। কারো হাতে কারো আজ যেন নিস্তার নেই। দু'তরফই ভাবছে, আর একবার। আর একটি বারের ঝাপটেই শেষ করে দিচ্ছি তোমার ভবলীলা। ফুঁসছে দুটোই। চোখের মণি কত তাড়াতাড়ি ঘুরছে ওদের। আতঙ্কেভরা সজল চোখ দুজোড়া!

হাট থেকে তবু নিরাশ হয়েই ফিরতে হল বাসব আর রতনমাঝির দলকে। নিবারণকুণ্ডু আর শাওজীদের সন্ধান তারা কোথাও পেল না। কুণ্ডু শাসিয়ে গেছিল বাসবদের। হাটেই হবে মোরগের লড়াই। মোরগের লড়াই হোল। নিবারণদের দলকে দেখা গেল না কোথাও। বাসবরাও তৈরী হয়ে উপস্থিত ছিল হাটে। সতীনাথ বলে দিয়েছিল, দল ভারি রাখিস, তাহলে আর ঘেঁসবে না ওরা। তবে মিছিমিছি খুন জখমের পথে না যাওয়াই ভাল।

রাত তখন খানিকটা হয়েছে।

বাসব আর রতনমাঝি এসে দাঁড়াল রেঞ্জ কম্পাউণ্ডে।

মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে নিয়ে উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করল সতীনাথ, কি হোল বাসব? কোন গোলমাল বাধেনি তো?

বাসব আর রতন আরো এগিয়ে এসে জানাল, দেখাই পাওয়া গেল না। আমরা ছিলাম প্রায় চল্লিশজন। যেমন আপনি বলে দিয়েছিলেন। চারধার খুঁজলাম, কোথাও নেই ওরা।

খুশি হয়ে সতীনাথ বলে, এই একতাকেই ভয় করে ওরা। একতা রাখিস। ওরা ঘেঁসতে সাহস পাবে না।

একটু থেমে বলে, সুদ পাবে তো আদালতে যাক। গলায় পা দিয়ে আদায় করবে, তোরা আর তা মেনে নিস না। তোদের মিত্তর সাব কি বলে?

রতন জবাব দেয়, তাঁরও সেই কথা। হিসেব ফেল আগে, তবে কড়ি। কবে কে কার কাগজে ছুটো টিপ দিয়েছে না দিয়েছে, সারাটা জীবন তাই দেখিয়ে ভাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে, এমন কাণ্ড আর তোরা হতে দিস না। দেখি না কি করে।

বাসব বলে, টিপ ওরা নিজেরাও দিয়ে নেয়। হাত-পায়ের বিশটা আঙুল ঝুলের কালিতে মাখিয়ে। যেখানে যেটা পারে বসিয়ে দেয়।

সতানাথ জিজ্ঞাসা করে, পায়ের আঙুল দিয়েও দেয়?

দেয় বই কি? একটা কাগজে কি সব লেখে, যেখানে যেমন পারে ছাপ দিয়ে দেয়, বলে এটা তোর রুক্কা। না বলার উপায় নেই।

হুঁ। সতীনাথ নতুন করে পাইপ ধরায়। আচ্ছা, তোরা ঘর যা। আমি সদরেও এসব কথা জানাবো। দেখি, কি করা যায়।

সতীনাথের একবার ইচ্ছা হল বাসবদের জিজ্ঞাসা করে, আরেক জনের কথা। তার কি মত। কারণ, সে জানতো সুলতার কাঁচ বাংলায় এই মানুষদের অবারিত দ্বার। সেখানে তারা নিজেদের দুঃখ বেদনার কথা, অভাব-অভিযোগের কথা জানাতে গিয়ে কোনদিন নিরাশ হয়ে ফিরে আসে নি। তাই নিয়েই কাঁচবাংলার যত কিছু দ্বন্দ্ব বিরোধ ধুঁইয়ে উঠছে গত কয়েক বছর। এসব গল্পও বহু বার বহু রকম করে সতীনাথের কানে এসেছে। তাই মোহন মিত্র খুব একটা অবাক সেদিন সতীনাথকে করে দিতে পারেন নি।

একদিকে যেমন সুলতার দৃঢ়তার গল্পকথা এ মুল্লুকে ছড়িয়েছে, তেমনি আরেক রকম মানুষের মুখে-মুখে তার অন্যরকম পরিচয়ের কথাও সতীনাথের জানতে বাকী নেই। তবে, কোনটা প্রকৃত আর কোনটা প্রক্ষিপ্ত, সেইটুকুই যাচাই করে নেবার ইচ্ছে মাঝে মাঝে সতীনাথের মনে হয়েছে। কিন্তু সে উৎসাহটা সব সময় সমান সজাগ থাকেনি।

ভেবেছে, কি লাভ? সে এসেছে সরকারী চাকরী করতে। কোথায় কোন্ ঠিকেদারের দজ্জাল মেয়ে কেমন করে চাবুক কষাল কাকে, বা কোথায় কোন্

বাসব আর রতন মাঝিদের নিয়ে মিটিং বসালে, আর তাই নিয়ে শেখর-সুন্দরমদের সঙ্গে গোপন লড়াইয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে চলল, সে ইতিহাস জানবার জন্যে সতীনাথ নিশ্চয়ই মাইনে পায় না। মানুষ সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। যেদিক দিয়েই হোক সে কৌতূহল যা-হোক খানিকটা মিটেই যদি যায়, কাজ কি সে সবের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খুঁটিনাটি নিয়ে গভীর গবেষণায় মত্ত হবার ?

হাজার ইচ্ছে হলেও সতীনাথ বাসবদের জিজ্ঞাসা করতে পারল না সুলতার কথাটা।

তবে, আমরা আজ আসি ?

রতনের এই প্রশ্নে সতীনাথ একবার মনে করল বলে, দাঁড়া, আরেকটা কথা ছিল। কি যেন বলব বলে মনে হচ্ছিল। ঠিক মনে পড়ছে না এখন। এই মুহূর্তে।

কিন্তু বলতে পারল না।

পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে বলল, বেশ। যা। কিন্তু আবার আসিস। ভুলিস না।

রতনমাঝি সালাম করে বলে, আপনার কথা কি ভুলতে পারি আমরা ? কি করে ভুলব ?

কেন ?

আপনি যে আমাদের দেব্‌তা।

সে কিরে ?

কেন ? দেখছি না এতদিন ? কবে লোকে এ জংগলে এত সুবিধে পেয়েছে বলুন ?

সতীনাথ বলে, জংগল তো আমার জমিদারী নয় রতন। সরকারী নিয়মে যেটুকু ছুট দেবার কানুন আছে, আমি শুধু তাই করি।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে বলে, ছিঃ, মানুষকে দেব্‌তা ভাবতে নেই। বলতে নেই রতন।

অবাক হয়ে রতন প্রশ্ন করে, কেন ?

সতীনাথ বলে, পাপ হয়। ওতে পাপ লাগে।

রতন আর বাসব তাকিয়ে থাকে সতীনাথের দিকে। অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারে না।

রতন বাসবদের মত মানুষরা কি করেই বা ভুলবে? আগে সেখানে পান থেকে চূণ খসলে কোমরে দড়ি পড়ত বনের এই মানুষদের, যেখানে নারী আর শিশুও বাদ যেত না সামান্য কোন কল্পিত অপরাধের দায়ে, আর সে দড়ি আল্‌গা হোত শুধু তখনই, যখন নতুন করে রুক্কা লিখে বা চাল বেচে নোটের গোছা পৌঁছে দিতে হোত বনরক্ষীদের হাতে, যখন ডিম দুধ বিনি পয়সায় পৌঁছে দিয়ে করজোড়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে হোত পরবর্তী কোন বেগারীর হুকুম তামিল করে কৃতার্থ হওয়ার জন্যে, সেখানে আজ এইসব আবহমান কাল থেকে সুযোগ আদায়কারীরা গলিত নখদন্তো অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে দাঁত পিষে আর হাত কচলেই নিবৃত্ত থাকতে বাধ্য হচ্ছে যে মানুষটার দৌলতে, তাকে ওরা ভুল করে না হয় দেব্‌তাই বলে ফেলেছে, কিন্তু ভুলবে তাকে কেমন করে?

তাই ওরা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। কথা বলতে পারে না।

সতীনাথ বলে, সরকারই বলে দিয়েছে তোরা জঙ্গলের সুযোগ সুবিধে পাবি। ঘর তুলতে কাঠ পাবি। কুয়োর লাঠা পাবি। জ্বালানি পাবি। আমি তো নিজে দেবার মালিক নই।

তবু ওরা চুপ করেই থাকে।

অনেক ভেবে বাসব বলে, দাঁতন ভাঙলেও আগে আমাদের বাচ্চাদের দড়ি বেঁধে আনা হোত। মিত্তর সাহেবের কড়া হুকুমে সে বন্ধ হয়েছিল।

এবার রতন বলে, আমরা বড় ভয় পেয়েছিলাম। মিত্তর সাহেব চলে গিয়ে নতুন যে আসবে, সে হয়তো আগের মতই হবে।

হেসে সতীনাথ বলল, না-না। আর কেউ আগের মত হবে না রতন। তোরা নিশ্চিন্ত থাক। আর তোদের বিনি পয়সায় দুধ ডিম মুরগী সাহেবদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে না কখনো।

বাসব আর রতন আর একবার সালাম জানিয়ে বিদায় নিল।

সতীনাথ আরাম চেয়ারে বসে নতুন করে পাইপ ধরাল। শত ইচ্ছা হওয়া সত্ত্বেও সে জিজ্ঞাসা করতে পারল না সুলতার কথাটা। অন্তত: তার মতামতটা। নিশ্চয়ই আজকের হাটে কুণ্ডু আর শাওদের মোকাবিলা করতে যাবার আগে রতনদের দল সুলতার কাছেও গিয়েছিল দল বেঁধে, যেমন সকাল হতেই তার রেঞ্জকম্পাউণ্ডটা লোকে ছেয়ে গিয়েছিল, সতীনাথের 'রায়' জানবার

জন্যে। তেমনি কাঁচবাংলার সাজানো বাগানেও নিশ্চয়ই ওরা গিয়ে অপেক্ষা করেছিল। সেখানকার খবরটা জানবার জন্যে বার বার চঞ্চল হয়ে উঠেছে সতীনাথ। কিন্তু কাউকে মুখ ফুটে একটা কথাও সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারে নি।

মোহন মিত্রের তারিফ না কোরে পারে না সতীনাথ মনে মনে। সামনা-সামনি দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলেছিল, এই আমাদের সুলতা। কাঁচ বাংলার মালিক। বেশি না হলেও কিছুটা অবাক হয়েছিল সতীনাথ। যার নামে দুরকমের কত গল্প এ অঞ্চলে জড়ো হয়ে আছে, সতীনাথের মনে একদিকে বিস্ময়, আর একদিকে বিতৃষ্ণা জাগিয়ে এসেছে যে এতদিন, সেই সুলতাকে একেবারে সামনে পেয়ে সতীনাথ প্রথমটা কোন কথাই বলতে পারে নি।

তরুবালা এগিয়ে এলেন, তোমরা বস ভাই। আজ আমার বড় ছেলের জন্মদিন। সামান্য একটু ব্যবস্থা করেছি। এখানে তোমারা দুজন ছাড়া আর তো আমাদের কেউ নেই। তাই ডেকে আনলাম।

প্রথম কথা বলে সতীনাথ, কই, দাদা তো সেসব কোন কিছু বলেন নি আমায় ?

তরুবালা বলে, কথাপাগল লোকরা আসল কথাটা ভুলে যায় বলেই নকল নিয়ে ফেনিয়ে বেড়ায় তারা।

সুলতার যে সম্পদ সেদিন সতীনাথকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছিল, সেটা তার শরীরের গঠন। দেহ নয়, শরীর। বাঙ্গালী পিতার কন্যা যে এত সুগঠিত শরীরের অধিকারিণী হতে পারে, সতীনাথ ভাবতেই পারে নি। বার বার চেয়ে-চেয়ে দেখতে হয়েছে।

বলেই ফেলেছে, আমি বাঙ্গালী মেয়ে দেখছি, না, কোন পাঞ্জাবী মেয়ে, তাই ভাবছি।

কথাটা না বোলে সতীনাথের উপায় ছিল না। প্রথম পরিচয়ের বেলায় অমনভাবে কোন নারীর (দেহ না-ই বললাম) শরীর খুঁটিয়ে দেখা নিশ্চয়ই সভ্যতার রুচির আর সৌজন্যের লক্ষণ নয়। মোহন মিত্র তরুবালা এবং সেই দেহের অধিকারিণীর মনে ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা অনুমান করেই সতীনাথ কথাটা বলে ফেলেছিল।

যে কোন মানুষকে বলতেই হত।

বর্ণের কথা ছেড়েই দিলাম, ছেড়েই দিলাম সুন্দর চোখ মুখ আর তিলফুল নাসার কথা। কিন্তু এমন সুগঠিত ঋজু দেহ, তার ভেতরে নারী সুলভ সমস্ত কোমলতার সঙ্গে বলিষ্ঠতার এমন অপূর্ব সংমিশ্রণ সচরাচর দেখা যায় না।

বনাঞ্চলের আদিবাসী মেয়েদের দেহের সৌষ্ঠব বলিষ্ঠতার বুনিয়াদের ওপরই মুখ্যতঃ গড়ে উঠেছে। সেখানে শক্তি যেন লাবণ্যকে একটু সামান্য ডিঙিয়ে গেছে। কিন্তু সুলতার দেহ এক অপরূপ শিল্পকর্ম যেন। যেখানে সব কোমলতা বজায় থাকা স্বত্বেও আবছা একটু বলিষ্ঠতা যেন প্রহরীর মত সে কোমলতাকে রক্ষা করতে ব্যস্ত। সুন্দরী কোন সুগঠিত এক পাঞ্জাবী মেয়ে বলেই ভুল হবে সুলতাকে দেখলে।

এক কথায়, সৌন্দর্য আর লাবণ্যের ভারে কুঁকড়ে-যাওয়া, নুয়ে-পড়া জড়োসড়ো তুলতুলে মেয়ে নয় সুলতা।

প্রথম দেখাতেই সতীনাথ সেটা স্পষ্ট অনুভব করল। তাই ব্যক্ত না করে থাকতে পারল না।

সুলতার কয়েকটা কথাও সতীনাথের বেশ মনে আছে। বলেছিল, আপনার কোন ভুল হয় নি। আমাদের অনেক ভুল-ত্রুটি, অনেক ইচ্ছাকৃত অপরাধ আর ফাঁকির কৌশল। আপনাকে আমি সেদিনও ভুল বুঝিনি সতীনাথবাবু।

কি একটা কথার জবাবে মোহন মিত্রকে বলেছিল সুলতা, আপনি তো জানেন, আমার এসবে মন নেই, কিন্তু কোন উপায়ও তো নেই কাকাবাবু।

সতীনাথ লক্ষ্য করেছিল, কথাটা সুলতা যেন হৃদয়ের গভীর থেকে উচ্চারণ করেছিল। তরুবালা একদৃষ্টে চেয়েছিল তার দিকে। সে দিকে ফিরে চেয়ে সুলতা হাসবার চেষ্টা করেছিল ব্যর্থভাবে।

সতীনাথের নজরে পড়েছিল সে ব্যর্থ হাসির রেখাগুলো।

অবিনাশের জীবনকালে যে সুলতা একটু বেশি রকম সজাগ ছিল, কয়েকটা বছরেই সে যেন কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। প্রতি কাজে প্রতি পদক্ষেপে শেখরচাঁদের কাছ থেকে যে সব বাধা সুলতার পথরোধ করে দাঁড়াতো, সে সব অতিক্রম করবার সাহস থাকলেও, ক্ষমতা থাকলেও, সুলতার মনের সে জোর আর ছিল না। শেখর না হয়ে অন্য কেউ হলে সুলতা সুলতাই থাকত।

এমন হয়ে যেত না। যখনই শেখরের গোপন প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছে সুলতা, অবিনাশকে মনে পড়েছে তার। মনে পড়েছে শোভারাণীকে। ঘরের দেওয়ালে ছবির দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে অশ্রু সম্বরণ তার পক্ষেও কঠিন হয়ে উঠেছে। শক্ত হাতে শাসনের যে দণ্ড সুলতা তুলে নিয়েছিল নিজের হাতে, বিখ্যাত, অবিনাশের ততোধিক বিখ্যাত কাঁচ বাংলাকে টিকিয়ে রাখতে, এমনি করেই অবিনাশের মৃত্যুর পর সে শাসনদণ্ড তার হাতে আপনা থেকেই প্রতিদিন শিথিল হয়ে এসেছে। এই দুর্বলতার সুযোগেই সুন্দরমের দল শেখরকে আরো বেশি উৎসাহিত করতে সমর্থ হয়েছে। সুলতা বুঝেছে। প্রতিবাদ করে নি। শেখরকে দেখলেই সুলতার অবিনাশকে মনে পড়তো। মনে পড়তো শোভারাণীকে। কর্তৃত্বের জায়গাগুলো শেখরের হাতে এমনি অনায়াসেই চলে যেতে লাগল। সুলতা আর বাধা দিত না।

চিন্তিত হয়ে সুধাময় বারবার বলেছে, এ তুই কি করছিস দিদি ?

একটু হেসে সুলতা বলেছে, কেন ? কি হোল ?

এমন করলে কি অবিনাশের অত সাধের এই কাঁচবাংলা বাঁচবে ?

অবিনাশের কথায় সুলতার মুখখানা একবার উজ্জ্বল হয়ে উঠে হঠাৎ নিভে গেল যেন।

কিছুক্ষণ পরে বলল সুলতা, কাঁচবাংলা রক্ষা করা তো আমার একার সাধ্য নয়।

সুধাময় চুপ করে থেকেছে। বিষণ্ণ হয়েছে। কোন উপায় খুঁজে পায় নি। লক্ষ্য করেছে মোহন মিত্র আসবার পর থেকেই যেন সুলতা কেমন হয়ে গেছে। যেটুকু না-করলে নয় তাই করেছে। মন তার পড়ে থেকেছে অন্য এক দুনিয়ায়, যেখানে বাসবরা থাকে। থাকে রতন মাঝির দল। যেখানে মিঠাপানি আজো জেগে আছে।

কিন্তু এসব কথা সতীনাথের জানবার তো উপায় ছিল না। মোহন মিত্র জানতো। জানতো তরুবালা। তাই সেদিন মোহন মিত্র বলেছিল, গোপন সুযোগ আদায় করার মেয়ে সুলতা নয় সতীনাথ। তুমি সুলতা আর কাঁচবাংলাকে একসঙ্গে গুলিয়ে ফেলো না ভাই।

কিন্তু অত কথায় সতীনাথের কাজ নেই। সে এসেছে সরকারী চাকরী করতে। এখানে কার জীবন কেমন করে পরিবর্তনের পথে চলেছে, সে গবেষণা করার ফুরসৎ তার নেই।

হঠাৎ সতীনাথের মনটা থমকে দাঁড়ায়। নিজেকে প্রশ্ন করে বসে, কি বলছ সতীনাথ? একথা কি তোমার মুখে সাজে? তাহলে ঐ মাতাল মেয়েটাকে গভীর রাতে পোড়াতে দেখে তুমি সারারাত ঘুমোতে পারলে না কেন বল? কেন মহুয়া তলার নতুন রক্তাক্ত কাব্য তোমায় এমন কোরে আনমনা করে রেখেছিল ক'দিন? কেন তুমি বাসব আর রতন মাঝির জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে যাও? কেন শঙ্করী আর নন্দিতার কথা ভাব মাঝে মাঝে? তুমি তো কাঠের রেঞ্জার। মানুষের কথা তবু ভাব কেন মাঝে মাঝে? কেন তারা এমনি কোরে চঞ্চল করে তোমাকে সতীনাথ? সেখানে সুলতা কি কেউ নয়? যে তোমার কর্তব্য সম্পাদনে, কাঁচবাংলার স্বার্থের বিরুদ্ধে হ'লেও, বারবার সাধুবাদ জানাবার মত সৎ সাহস দেখাতে পারে, তাকে তুমি এত তুচ্ছ কোরে ভাববার অধিকার কোন্ শিক্ষার জোরে অর্জন করে বসলে সতীনাথ? নন্দিতা বিকাশ যদি আজো তোমার হৃদয়ে মহত্বের আসন পেতে বসে থাকবার যোগ্যতা দেখিয়ে থাকে, সেখানে সুলতা এমন কোন্ মারাত্মক অপরাধে সে সামান্য অধিকারটুকুও হারিয়ে বসবে?

না-ই বা তুমি ভাবলে তাকে নন্দিতার সমান কোরে। তাতে সুলতার কতটুকু ক্ষতি? তুমি যদি ঝালুকপোখরে না আসতে, সুলতা কি থাকত না সেখানে তার দোষ গুণ সব কিছু নিয়ে? তোমার নিজের কাছে নিজে কি উত্তর দেবে সতীনাথ, অহেতুক একটা মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করার অপরাধের জন্যে?

তুমি নিজের কাছে নিজেই যে ধরা পড়ে যাচ্ছ সতীনাথ। ছিঃ!

নিভে যাওয়া পাইপটা অনেকক্ষণ দাঁতে চেপে বসে আছে সতীনাথ।

ক'দিন থেকে কর্তব্যবোধটা সতীনাথের মাথায় বড় বেশি করে যেন চাগাড় দিয়ে উঠছে। সেদিন সকালে উঠেই দুজন বনরক্ষীকে আদেশ করল, কাঁচবাংলায় যাও। মেম সাহেবকে সালাম দেবে। জরুরী কাগজপত্র সই করতে হবে।

বনরক্ষী দুজন সালাম জানিয়ে বিদায় নেবে, এমন সময় সতীনাথ বলল, হাঁ, শোন। তোমরা সাদা পোষাকে যাবে — উর্দিতে নয়।

এবার দুজন দুজনের মুখের দিকে চেয়ে অবাক হল। মাথা নিচু করে চুপ কোরে রইল।

তাদের ভাব দেখে সতীনাথ বলল, কি হোল ?

তবু ওরা নিরুত্তর।

কি হোল ? যাও তোমরা।

তবু ওরা নড়ে না।

যাব…।

কি ? বল ?

কাঁচবাংলার মেমসাব বড় খতরনাক্ ··

চ্যপ্। ওরা আমাদের ঠিকাদার। ভয় কি তোমাদের ? সালাম দাও।

উর্দিতেই যাব হুজুর।

কেন ?

উর্দিতে থাকলে আমাদের কোন ডর্ থাকে না।

সতীনাথের মনে পড়ল মোহন মিত্রের এক গল্প। সাদা বাঘ দেখা দিয়েছিল সে-বার শিলওয়ার পাহাড়ে, একেবারে বড় রাস্তার গায়ে। রোজ সন্ধ্যায় বাঘটা যেন হাওয়া খেতে আসত। শিকারী লাগল। সামনেই বন্যজন্তু এক্কা সপ্তাহ। হুকুম জারী হোল, বাঘ শিকার চলবে না। লোভী শিকারীর দল হুকুম মানে না। রোজ তাক্ করে। পাহারা বসল। একদিন সাহেব গিয়ে দেখে তারা আসল জায়গা ছেড়ে গাঁয়ের এক পানের দোকানে আড্ডা জমিয়ে বসে আছে। সাহেব তো রেগে আগুন। সরোষে হুকুম জারী করলেন, সব তোমরা ভীতু। যাও। সারারাত পাহারা দেবে। কেউ যেন সাদা বাঘ মারতে না পারে।

দোমনাভাব দেখে সাহেব আবার গর্জে ওঠে, বাঘ দেখে এত ডর্ ? জঙ্গলের চাকরী ছেড়ে কাঁথা শেলাই করগে যাও তোমরা চুড়ি হাতে দিয়ে।

দু'পা ঠুকে একজন খটাস্ করে আওয়াজ তুলে কড়া সেলাম দেগে বলল, নহী হুজুর ভয় কিসের ? আমরা ওয়ার্দিতে আছি। বাঘ আমাদের কি করবে ?

সে গল্প বনবিভাগের সব কর্মচারীর মুখে মুখে। কোন কঠিন কাজে যাবার বেলায় ওরা আগে উর্দি পরে নেয়। শক্ত কোরে পেটি বাঁধে। তাই কাঁচবাংলার মেমসাবকে সালাম জানাতে ওরা সাদা পোষাকে যেতে নারাজ। উর্দি হলে ওরা যমকেও যেন বেঁধে আনতে পারে, ভাবটা এই রকম।

সতীনাথ হুকুম দেয়, আচ্ছা। তাই যাও। ওয়ার্দিয়ে যাও।

কিন্তু ফল হোল ঠিক উল্টো। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে অপিসে এসে হাজির হোল সুন্দরম আর শেখরচাঁদ।

দেখে সতীনাথ বলে ফেলল, আপনারা?

হ্যাঁ। খবর পাঠিয়েছিলেন।

এগ্রিমেন্টের কোন্ সইয়ের নাকি গণ্ডগোল থেকে গেছে।

মুহূর্তে সতীনাথ নিজেকে সামলে নেয়। বলে ও, হ্যাঁ। শেখরের দিকে চেয়ে বলে সইতো করবেন আপনি?

হ্যাঁ। সে সংক্রান্ত কাগজপত্র গত সপ্তাহেই পাঠিয়ে দিয়েছি আমরা। বড় অপিস কি আপত্তি জানিয়েছে?

মনে পড়ল সতীনাথের।

মনে মনে লজ্জিতও হোল। সই করার মালিক এখন শেখর চাঁদ। আর সুলতা নয়। ছি ছি।

নিজের হঠকারিতার জন্যে বারবার নিজের মরণ কামনা করতে লাগল সতীনাথ। কি ভাবল সুলতা? এতবড় নির্লজ্জ মানুষ সতীনাথ?

লজ্জায় ঘৃণায় সারাটা দিন সতীনাথের মন-মেজাজ বিষিয়ে রইল। এমন নির্বোধের মত কাজ কোরে সকলের কাছেই সে যেন হাস্যাস্পদ হয়ে পড়ল। অবশ্য তার মনে তাই হচ্ছে।

সে জানত, মোহন মিত্রের আমলে সুলতা রেঞ্জ কোয়ার্টারে প্রায় প্রতিদিনই আসতো। আসতো মোহন মিত্র তার কাকাবাবু বলে। আসত তরুবালার কাছে।

কিন্তু এমনভাবে তাকে ডেকে পাঠাবার সুবাদ-সুযোগ বা অধিকার তো সতীনাথের ছিল না। তার ওপর কাঁচবাংলার কাগজপত্রও সে পেয়েছিল। সই করার মালিক একা শেখরচাঁদ। আর সুলতা নয়। কেমন কোরে ভুলে বসল সে এসব কথা?

শেখর চাঁদের সঙ্গে কাজকর্ম সেরে সতীনাথ সোজা গিয়ে ঢুকলো নিজের শোবার ঘরে। কোয়ার্টারে। একখানা চাদরে আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে পড়ে রইল সে।

সন্ধ্যা হতেই মোহন মিত্র এসে উপস্থিত। তাঁর হাঁক শুনে সতীনাথের

লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করছে। নিশ্চয়ই কথাটা এতক্ষণে মোহন মিত্র আর তরুবালাও জেনে ফেলেছে। সতীনাথের দুর্বলতা দেখে তারা তাকে কি ভাবছে? কিন্তু এমন কাজ সে করল কেমন কোরে? করল কিসের জন্যে?

ভাবনাটা এবার সতীনাথ উল্টো পথে চালান করে দিলে। শক্ত হয়ে ভাবলে, কি হয়েছে কি? ঠিকাদারকে ডেকে পাঠাবার অধিকার আছে তার একশো বার। যেখানে মেয়ে হয় ঠিকাদার, সেখানে তার লজ্জার কি থাকতে পারে। যেমন সে বলে থাকে, সালাম দো ফলানা ঠিকেদার কো। ডাকো সুগন চাঁদকো। বোলাও সুরজিৎ সিং কো, তেমনিই বলেছে, সালাম দো কাঁচবাংলামে। জরুরী কাগজ সই করবার থাকলে আলবাৎ ডাকবে রেল অফিসার যে-কোন ঠিকাদারকে।

ভেতর থেকেই বলে সতীনাথ, চলে আসুন দাদা।

মোহন মিত্র ভেতরে এসে বলেন, বিজলা কোথায় গেছে? তুমি এখনো বিছানায়? শরীর ভাল আছে তো?

সতীনাথ বলে, শরীর ঠিকই আছে। বসুন।

বেশ, যাও, হাত-মুখ ধুয়ে এসো। বিজলাকে বল একটু লিম্বু চা খাওয়াক আমাকে। তোমার বৌদির কড়া তলব আছে। চল।

সতীনাথ যেন নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচল।

বিজলাকে হাঁক দিয়ে চা করতে বলে সতীনাথ গিয়ে স্নান ঘরে ঢুকল। সুলতার কথাটাই তার সর্বাগ্রে মনে পড়ল। কাগজ সইয়ের গণ্ডগোল থাকতে পারে, একথাটা শেখরদের বলে সুলতা তাকে সমস্ত অপমানের হাত থেকে যেন মুক্ত করে দিয়েছে। সে তো বলতে পারত অন্যভাবে, অন্য কিছু। তাহলে আজ আর তার মুখ দেখাবার জায়গা থাকত না।

হয়তো সে মিছেই এসব ভেবে মরছে। যেমন শঙ্করীর কথা ভেবে ভেবে রাতের ঘুম বিসর্জন দিয়েছিল সেসব কালে।

সতীনাথ ভাবে এবার নিজের কথা। সত্যিই অদ্ভুত লাগে তার। মানুষ কতো অল্পে নিরেট বোকা ব'নে যায় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সে নিজে। নারীর প্রতি পুরুষের আর পুরুষের প্রতি নারীর যে একটা সহজাত আকর্ষণ আছে, থাকবে, এই সামান্য সোজা কথাটা যদি সে জীবনের প্রথম থেকেই মেনে নিতে পারত তাহলে অনেক অহেতুক যন্ত্রণা থেকে সে নিজেকে মুক্ত

রাখতে পারত। মানুষের মন। আহ্লাদে যেমন উদ্ভাসিত হয়, তেমনি দুঃখে ক্ষোভে ছোট হয়ে যায়। ক্রোধে তেমনি উত্তপ্ত হয়। এ-তো স্বাভাবিক। মোহন মিত্রের মুঙ্গেরের সেই অস্বাভাবিক মর‍্যাল্ গলিয়থ, অধ্যাপক বন্ধুটির কথা ভেবে সতীনাথ নিজেকে বারবার ধিক্কার দিতে লাগল।

এগারো

কয়েক মাসের মধ্যেই কাঁচ-বাংলার চেহারাটা একেবারে পাল্টে গেল। শেখর বলেছিল, আমার কোন আপত্তি নেই। অসুবিধে নেই। কাঁচবাংলাকে দুভাগে ভাগ করে মাঝখানে দেয়াল তোলা চলতে পারে। গেট থেকে নাক-বরাবর পাঁচিল টেনে একেবারে শেষ সীমানায় নিয়ে গেলেই হল।

সুলতার আপত্তি ছিল।

বলল, তা হয় না।

কেন হয় না?

সুলতা একটুখানি হেসে বলল, তা হয় না শেখর। এর বেশি আমার আর কিছু বলবার নেই।

শেখর বলে, তাহলে, কি হলে হয়?

সুলতা উত্তর দিল, কাঁচবাংলা যেমন আছে তেমনি থাকবে।

—কিন্তু আমি আর এভাবে কারবার চালাতে রাজি নই।

শেখর কথাটা সুলতার চোখের দিকে চেয়ে বলতে পারল না। আপনিই তার মাথা নিচু হয়ে এল।

শক্তি সঞ্চয় করে আবার বলল, আগে তবু যা হয় চলেছে। এখন একেবারে অসম্ভব।

সুলতা চুপ করেই ছিল। শেখরের কথাগুলো তার কানে সম্পূর্ণ অর্থবহন করে প্রবেশ করেছিল কি না, বলা শক্ত।

শেখর বলে, নতুন রেস্তোর আসবার পর থেকে আমাদের কাজের ধারা একেবারে বদলে দিতে হবে।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। ঠিকাদাররা যে তার কেনা গোলাম নয়, এটা তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দেবার সময় এসেছে। তার মত শতখানেক চাকর কাঁচবাংলার অধীনে কাজ করে। আমার ম্যানেজারের মাইনে ওর ডি-এফ-ও র চাইতেও বেশি। আর, সে কি না…

সুলতা বাধা দিয়ে বলে, সে যা-হয় তোমরা কোরো শেখর। আমি আর ওসবের মধ্যে নেই। আমি তোমাদের কাছ থেকে দূরেই সরে যেতে চাই। কাঁচবাংলা ভাগ করার প্রয়োজন হবে না।

কেন ?

ওতে অনেক কাঁচ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। অসাবধানে পা-ফেলে চললে তখন সকলেরই পা কাটবার ভয় থাকবে।

সুলতার এ কথায় শেখর যেন বেশ উৎসাহ বোধ করল।

আরো একটু সোজা হয়ে বসে বলল, তোমার এ ভয় একেবারে নিরর্থক। দেখো, আমি এমনভাবে দেয়াল টানবো…

শুষ্কমুখে সুলতা বলল, তা আমি জানি শেখর। তোমার হাতে এখন অনেক দক্ষ কারিগর। ভেঙে না পড়লেও ফেটে ফেটেও তো যেতে পারে কাঁচগুলো। সে বড় বিশ্রী হবে দেখতে।

এবার বিপুল উৎসাহে শেখর উঠে দাঁড়াল। বলল, একবার এসো। বাইরে। দেখ, আমার প্ল্যানটা হচ্ছে…

সুলতাকে চোখ বুজতে দেখে মাঝপথেই থেমে গেল শেখর। একটু কাছে গিয়ে বলল, তোমার শরীরটা বোধহয় আজ তেমন ভাল নেই, না ?

অবিনাশের অনেক সাধের এই কাঁচবাংলা।

নামটা অবশ্য এ অঞ্চলের লোকদেরই দেওয়া। মস্ত সেই বাংলো বাড়ীটার চারিদিকে প্রশস্ত বারান্দা। কাঁচ দিয়ে ঘেরা। কেন এই পরিকল্পনা ছিল অবিনাশের সে কথা কারো জানা নেই। এক এক খণ্ড কাঁচ যেমন দৈর্ঘ্যে, তেমনি প্রস্থে। তার ওপর রকমারি নক্সা। রং-হীন নক্সা কাঁচের গায়ে—গায়ে। পরিচ্ছন্ন রাখলে কত বাহারি ছবি ফুটে উঠেছে, স্পষ্ট দেখা যায়।

সুলতা চেয়ে চেয়ে দেখল অনেকক্ষণ।

বলল, শেখর তুমি তখন অনেক ছোট। আমিও খুব বড় নই। বাবার চোখের স্বপ্ন পড়বার বয়েস আমারো তখন হয়নি। বয়েস যখন বাড়ল, তখন বুঝলাম।

শেখর বলে, তুমি ভুল করছ। বাবার স্বপ্নকে সার্থক করার যে পথ আমি বেছে নিয়েছি, হয়তো সেইটেই যথার্থ। তুমি আরো একটু ভেবে দেখো।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে সুলতা বলে, আমি অনেক ভেবেছি শেখর। শক্ত হাতে সব কিছু বজায় রাখতে কোন ত্রুটি করিনি। কিন্তু…

—কিন্তু, কি? বল?

কিন্তু দেখলাম, সে হবার নয়।

কেমন করে বুঝলে তুমি?

সে আমি তোমায় বোঝাতে পারব না শেখর। আমার বিশ্বাস কাঁচ-বাংলাকে জীইয়ে রাখা সম্ভব নয়।

শেখর এবার শান্ত কণ্ঠে বলে, বেশ তো। আমি এবার চেষ্টা করে দেখি।

হাসল সুলতা। বলল, বেশ। তাই দেখ।

* * *

এ তোমার একেবারে ছেলেমানুষি সেন্টিমেন্ট শেখরচাঁদ। আমরা তো তাঁকে চলে যেতে বলিনি, তাঁকে ঠকাতেও যাচ্ছি না। সে বাসনাও আমাদের নেই।

শেখরের মুখের দিকে কিছুক্ষণ নীরবে চেয়ে সুন্দরম আবার বলে, আছে? বল?

সুন্দরম বলে, একেবারেই না। তাঁর সব প্রাপ্যই তো আমরা কড়ায়-গণ্ডায় চুকিয়ে দিয়েছি। মালিকের কাগজপত্রের এতটুকু অবমাননা আমরা করিনি। করবও না। লাভের অংশ এতটুকু তাঁর এদিক-ওদিক হবে না।

শেখর বলে আমি সে সব ভাবছি না। আপনি অন্যকথা বলুন।

হ্যাঁ, সেই কাজের কথাই তো বলতে এসেছি। আমাদের সদর অফিসে যেতে হবে। যেমন করেই হোক এই নতুন রেঞ্জারকে বদলী করতে হবে।

না। আমি সে পথে যেতে চাই না। ভয়টা কিসের শুনি? আমরা ওর মোকাবিলা করব।

সায় দিয়ে সুন্দরম বলে, ঠিক বলেছ। কতো সতীলক্ষ্মীই দেখলাম। এ তো নব্য ছোক্‌রা। গরমটা একটু মরতে দাও। দেখবে সোজা হয়ে গেছে। তাছাড়া বুঝছ না, বে-থা করেনি। সংসার বোঝেনি তো। চাপ পড়লে বড়

বড় রথী-মহারথী বাপ, বলতে পথ পায় না, এ ছার কোন্ দেব্তা ? চাঁদির জুতো, যাকে বলে ভিটামিন্ 'এম্' পড়লে কতো সোনার চাঁদের মগজ ঘুরে যেতে দেখেছি।

শেখর অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল বারবার।

সুন্দরম বলে। তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না। কর্তার আমলে সব কিছু তো আমিই সামলে এসেছি। এখনো তার কোন নড়চড় হবে না। বুঝছ না, আঁতুড়ের গন্ধ এখনো ওর গা থেকে যায়নি, তাই একটু যা অসুবিধে।

শেখর চাইল সুন্দরমের দিকে।

হ্যাঁ। ঠিক তাই। আঁতুড়ের গন্ধ। ঐ ডেরাডুনের গন্ধ আর কি!

আরেকটা কথাও ছিল শেখরচাঁদ। তাঁকে, মানে তোমার দিদিকে কোন অশ্রদ্ধা করবার স্পর্দ্ধা আমার নেই। কিন্তু তা হয় না। মেয়েছেলে মালিক হতে পারে, কিন্তু কর্মকর্ত্রী হতে গেলে সব নষ্ট হতে বাধ্য। তারওপর ওঁর যত দরদ, যাদের দিয়ে আমরা কাজ করাব তাদের উপর। তা কি চলে ?

শেখর চুপ করেই ছিল।

সুন্দরম বলে চলে, প্রথম প্রথম আমরা সবাই অবাক হয়ে গেছিলাম সত্যি। কিন্তু জানতো শেখর, মেয়েমানুষের দর্প বড় সাংঘাতিক জিনিস। সবকিছুকে রসাতলে পৌঁছে দিতে এমন কিছু আর নেই সংসারে। ঠিক সময় তুমি লাগাম টেনে ধরেছ।

শেখর বলে, দেখুন, আমি আর কিছু চাই না। বাবার আমলের সুনাম নষ্ট না হয় এইটুকু আপনি দেখবেন।

সে আর তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। তার জন্যে আমি তো রইলাম। কর্তাও ঠিক একদিন এই কথাই বলেছিলেন। সিংহের বিক্রম নিয়েই তিনি চলে গেলেন। কোথাও তাঁর সম্মান ক্ষুণ্ণ হতে কোন দিন দিই নি। আর, তাছাড়া জানো শেখর, একটা মায়া পড়ে গেছে আমার। মায়া এই কাঁচ-বাংলার ওপর। তার সুনামের ওপর। আজো এ তল্লাটের যত কোম্পানী, তারা হাঁ করে চেয়ে থাকে। দেখে, শেখে। আমাদের কাছেই শেখে। কেমন কোরে কাঠ পিটিয়ে সোনা ঝরাতে হয়, সে আর্ট তো সকলের করায়ত্ত নয়। সেখানে কিনা সতীনাথ রায়, কালকের ছোকরা, কেতাবী বুদ্ধি দিয়ে পদে পদে

বাধা সৃষ্টি করে চলেছে! ভেবে দেখ একবার, জঙ্গলগার্ডগুলো যারা এতদিন আমাদের দয়াদাক্ষিণ্যের ওপর হাতে ঘড়ি পড়ত, সাইকেল চাপত, একশ টাকা মাইনে পেয়ে তিনশ টাকা মনিঅর্ডার করত দেশের বাড়ীতে, মেয়ের বিয়ে দিত ঘটা করে, শহরের কলেজে ছেলেকে আই-এ বিএ পড়াত, মানে জঙ্গলের ছোট খাটো জমিদারের মত জীবন কাটাতো, তারাও ওর চক্কোরে পড়ে যেন সব তৈলঙ্গস্বামী সেজে নোলা গুটিয়ে বসেছে। কিন্তু চোখ দেখলে তো বুঝি। লোভের জিভ ওদের চোখ দিয়ে লক্‌লক্ করে বেরিয়ে আসে। ভেতরে ভেতরে সবাই আগুন হয়ে আছে। সেখানে সতীনাথের সতীত্ব কত দিন বজায় থাকতে পারে বল?

সুন্দরম বিজ্ঞের হাসি হাসে অনেকক্ষণ ধরে।

কিন্তু কি আশ্চর্য জানো, উনি, মানে তোমার দিদি যেন…

বাধা দিয়ে শেখর বলে আপনি ভুল করছেন।

সামলে নিয়ে বলে সুন্দরম, ঠিকই বলছিলাম শেখরচাঁদ, উনি যেন তোয়াক্কাই করতেন না ওসব। তুমি ঠিক ধরতে পারলে না শেখর।

যাক। সকলকে বলে দেবেন, অপিসের নিয়ম-কানুনগুলো যেন সবাই ঠিক মেনে চলে এবার থেকে।

সে আমি বেশ ভাল করে বুঝিয়ে বলে দিয়েছি সবাইকে। বলে দিয়েছি, ভুলে যাও আগেকার আমল। কাঁচবাংলা আর দাতব্যচিকিৎসালয় নয়। হেঁপো খোঁড়া, নুলো, চালসেওলা, এদের আর স্থান হবে না এখানে। সাতভূতে লুটেপুটে খাব আর কাঁচবাংলা গোল্লায় যাবে, শেখরচাঁদের আমলে সে দিবা স্বপ্ন যেন কেউ না দেখে। মনে করিয়ে দিয়েছি, শেখরচাঁদের নিশানা নির্ভুল।

শেখরকে নিয়ে অবিনাশের চিন্তাটা যে কোথায় ছিল, সুন্দরম ছাড়া সেকথা তেমন করে কেউ ধরতে পারে নি। নিরুপায় ঈশ্বরের মত অবিনাশের শেষ দিনগুলোর কথা একমাত্র সুন্দরমই জানে। তাই মাঝে মাঝে নিজের হারানো ব্যক্তিত্বের বেদনায় শেখর যখন সোজা হয়ে দাঁড়াতে চায়, সুন্দরম সতর্ক হয়ে ওঠে। সজাগ হয়ে ওঠে। বন্দুক, মদ আর অফুরন্ত যৌবন নিয়ে খেলা করা শেখরের রক্তে নেশা জাগায়। সম্বিত ফিরে এলে সে খেলার রসদের উৎস

সম্বন্ধে সাময়িক ভাবে হলেও শেখর যেন একটু বেশি সচেতন হয়ে উঠতে চায়। সুন্দরমের কাজ সেখানে একটু রাশ টেনে ধরা।

প্রকৃতির নিয়মে অক্ষম শিশুর হামা-দেওয়া কালে মাঝে মাঝে হঠাৎ দুপায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার নিস্ফল প্রয়াসের খেলা যেমন অনেকের কৌতুক আহ্লাদ সৃষ্টি করে মৃদু হাততালির সঙ্গে অনর্থক উৎসাহদানেরও খোরাক জোগায়, শেখরচাঁদের স্বাধিকার সচেতনতার, ব্যক্তিত্ব প্রকাশের এই নিরর্থক হঠাৎ-প্রস্তুতির খেলাও ঠিক তেমন সুচতুর সুন্দরমের মনে কৌতুকভরা কৃত্রিম সহযোগিতার সৃষ্টি করে তার নিজের আত্মবিশ্বাসকে যেন আরো কয়েকগুণ বাড়িয়েই দেয়।

সুন্দরমের বিশ্বাস, কাঁচবাংলার একমাত্র নিয়ামক আজ সে নিজে। রাখলে রাখতে পারে, ভাঙলে ভাঙতে পারে। বিশ্বাস করে, সুলতা পালিয়ে গেল! জানে না পালিয়ে যাওয়া আর ত্যাগ করে যাওয়ার মধ্যে পার্থক্য কতটা। বৈষয়িক তৎপর মানুষের কাছে অবিশ্যি সে পার্থক্যের মূল্য এক কানাকড়িও নেই। দুয়ে দুয়ে চার ছাড়া আর তাদের কাছে কোন হিসেব নেই। আর কোন হিসেবের কথা তারা বুঝতেও শেখেনি।

*　　　*　　　*

সুন্দরম সিগার ধরায়।

ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঘরের বাতাসকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আধবোঁজা চোখে চেয়ে দেখে যেন পাহাড়ী পথে মাইলের পর মাইল ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে আসছে সুলতা। কোথাও ক্লান্তির চিহ্নমাত্র নেই। অবিনাশের দৃঢ়তা দিয়ে গড়া সুলতা।· সাজ পোষাকে প্রতিপদক্ষেপে যার অনমনীয় দৃঢ়তার ছাপ পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট।

কি হোল? আজ তাড়াতাড়ি ফিরলে যে সুলতা?

আপনার ঘড়িটা কি বন্ধ?

অপ্রস্তুতের হাসি হেসে সুন্দরম বলে, একটুও থামোনি কি না, তাই।;

তাই বুঝি?

হ্যাঁ।

এগিয়ে গিয়ে লাগাম ধরে সুন্দরম।

সুলতা সেদিকে না চেয়েই ছুটে যায় বাড়ীর ভেতর।

রাশভারি অবিনাশ চোখ তুলে তাকান।

মৃদু হেসে বলেন, রাণী তোমায় বিরক্ত করে না আর?

না বাবা। রাণী এখন খুব শান্ত। খুব বাধ্য আমার।

হুঁ। অবিনাশ বুকভরা বিশ্বাস নিয়ে চুপ করে থাকেন। তৃপ্তি অনুভব করেন। অস্থির রাণী তাঁর বাধ্য হতেও মাঝে মাঝে অস্বীকার করে বসে। সুলতার কাছে সে শান্ত।

আবার চোখ তুলে তাকান মেয়ের দিকে রাশভারি অবিনাশ। জানো, রাণীকে আমি বিক্রি করে দেব ভাবছিলাম।

তাই তো আমারো জেদ চেপে গেল বাবা।

হুঁ।

অবিনাশ আবার চুপ করে যান।

সেই জেদ!

যে জেদ তাঁকে সকলের কাছে নমস্ত করে তুলেছে। যে জেদ তাঁর মাথা আজ এতটা উঁচু করে দিয়েছে।

সেই জেদ।

একদিকে অবিনাশের প্রাণ মন ভরে ওঠে সুলতাকে দেখে! আবার হঠাৎ কেন যেন অকারণ দুশ্চিন্তার ছায়া ভেসে আসে তাঁর মনের আকাশের একটি কোণে। অবিনাশ জানেন, এই জেদ হয় মানুষকে একেবারে ওপরে তুলে নিয়ে যায়, আর না হয় রসাতলে পৌঁছে দেয়। সুলতার ভাগ্যে কোনটা আছে, ভবিষ্যতের সমস্ত বুকটা চিরেচিরেও অবিনাশ তার হদিশ পান না। শেখরের দিকে চেয়ে দেখেন, কাঁচ-ঘেরা বারান্দায় বসে রাইফেলের নল পরিষ্কার করছে শেখরচাঁদ।

সিগারের ধোঁয়াগুলো হাল্কা হয় আরো। আস্তে আস্তে মিলিয়েও যায়। সুন্দরম শব্দ করে হেসে ওঠে।

অবিনাশের স্বপ্নগুলো খান খান হয়ে ভেঙে পড়ে কাঁচ-ঘেরা সেই বারান্দার শক্ত মেঝের ওপর।

গেলাসে চুমুক দেয় সুন্দরম।

নতুন করে সিগার ধরায়।

সুলতা!

বলুন।

তোমার মুখখানা দেখলে তোমায় মায়ের কথা মনে পড়ে আমার।

সুলতা সোজা চোখ তুলে তাকায় সুন্দরমের মুখের দিকে। বলে, সেই তো স্বাভাবিক।

তবু···। কি মনে হয় জানো ?

জানি।

বলত কি ? Please তুমি জাননা সুলতা, আমার স্বপ্ন···

You are my paid servant. আমি জানি।

চোখবুজে ফেলে সুন্দরম। অনেকক্ষণ পর চেয়ে দেখে, সামনে দাঁড়িয়ে সুলতা। হাতে তার ঘোড়ার চাবুক। চোখে মুখে অবিনাশের দৃঢ়তা।

সিগারের ধোঁয়াগুলো জানলা দিয়ে ভেসে যাচ্ছে।

সুন্দরম আবার শব্দ কোরে হেসে ওঠে। হঠাৎ চমকে ওঠে যেন। তার নিজের বিকৃত-স্বপ্ন কাঁচবাংলার শক্ত মেঝের ওপর গুঁড়িয়ে দিয়ে চাবুক হাতে সুলতা নেমে গেল। রাণীর পিঠে চড়ে এক নিমেষে সে উধাও হয়ে গেল। গেটের বাইরে মেঁঠো পথে একখণ্ড হাল্কা মেঘের মত কিছু ধুলো ভাসছে।

*   *   *

এই তো বেশ, মা। এই তো ভালো। এছাড়া আর তো কিছু হওয়া সম্ভবও ছিল না। কাঁচবাংলার মধ্যে তুমি বন্দী হয়ে ছিলে। মুক্ত মানুষের কাছে আকাশটা যে কতো বড়, কতো বিশাল এই পৃথিবী, সে খবর লক্ষী-ঠাকরুণের বন্দীশালায় থেকে তুমি কোনদিনও টের পেতে না। অথচ তোমার মন চাইছিল বাইরের তুনিয়া। সে বদ্ধ ব্যবস্থা যে কী যন্ত্রণাদায়ক, আমি বুঝি।

মোহন মিত্রের কথাগুলো সুলতার আজ বড় ভাল লাগছে। কিন্তু কাঁচ-বাংলার সঙ্গে শিশুকাল থেকে যত স্মৃতি জড়িয়ে আছে, কয়েকটা দিনে তা মুছে ফেলা তো সম্ভব নয়। মুক্তির নিশ্বাসের সঙ্গে মানুষ আরো একটা জিনিষের জন্যে কাতর হয়ে থাকে। তার নাম আশ্বাস।

ছোটবাংলার অপিস উঠে চলে গেছে কাঁচবাংলায়। সুলতা নিশ্চিন্ত হয়ে সব গুছিয়ে বসবে ভাবছে তুমাস থেকে। কিন্তু কিছু আর গুছিয়ে তোলা হয়ে ওঠেনি। বাসব-রতনমাঝির দল প্রায় সব সময় এখানেই থাকে আজকাল।

জীপ গাড়িটা গ্যারাজেই বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। পুরোনো দাসদাসীদের কেউ নেই এখানে। অনেক পরিচিতের মাঝেও সুলতার বড্ড একা মনে হয়। অবিনাশ আর শোভারাণীর ছবি দুটি সঙ্গে এনেছে সুলতা।

শুধু টাকা-পয়সা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, এই নিয়েই কি মানুষ তৃপ্তি পেতে পারে কাকাবাবু ? সুলতা প্রশ্ন করে।

মোহন মিত্র বলেন, জানতাম, এ প্রশ্ন তোমার জীবনে একদিন দেখা দেবেই। তুমি ঠিকই বলেছ মা, অনেকে সম্পদের চূড়ায় বসেও অতৃপ্তির আগুনে জ্বলে পুড়ে মরে। আবার মজা দেখ, সেই সম্পদ আহরণের অক্লান্ত আজীবন পরিশ্রমকে মানুষ তপস্যা নাম দিয়ে, সাধনা নাম দিয়ে ক্ষণিক আত্মতুষ্টির ব্যর্থ প্রয়াসে মত্ত থাকে। যখন শেষ সীমায় পৌঁছয়, তখন ভাবতে সে বাধ্য,— "এর পর" ? অবশ্য সে চিন্তা দেখা দিতে পারে তেমন মাত্র কয়েকজনের মধ্যে যাদের ভেতর সৃষ্টিকর্তা দু-চার ফোঁটা মানুষের রক্ত ভুল করে দিয়ে ফেলে থাকেন।

আবার বলেন মোহন মিত্র, মানুষের মন-সমুদ্রের অতল-তলে সবারই একটা কোরে গোপন চেম্বার আছে। সেইখানেই তার সত্যিকারের চেহারা। শুধু সেইখানেই সে নিজের কাছে খাঁটি সত্যি। বাইরে সবাই এক একজন সাজানো বাঁদর। বাঁদরের নাচ দেখেছ ?

লোভের ছড়িটার শাসনে কখনো সে বাঁদর 'শ্বশুরবাড়ী' যায়, আবার কখনো মাথায় দুহাত তুলে 'জল ভরতে' যায়। কখনো বা মাতোয়ালা হয়ে ধুলোয় লুটোপুটি খায়। সব খেল্-এর পেছনে উদ্দেশ্য কিন্তু এক। একমুঠি ভিক্ষে। পেয়ে গেলেই দাঁত মুখ খিঁচিয়ে নাচনদারের কাঁধে লাফ মেরে উঠে সরে পড়ে। এতক্ষণ তার নানান খেল্ দেখে যারা বারবার হাততালি দিলে, খুশি হয়ে ভিক্ষে দিলে, তখন সে আর তাদের কেউ নয়। তখন সে শুধুই ঐ নাচনদারের পোষা বাঁদর।...ঘরদোর গুছিয়ে ফেল। তোমার মত মেয়ের কি এমন মনমরা হয়ে পড়ে থাকলে চলে ?

মন আমার মরেনি কাকাবাবু। তা যদি হোত কোলকাতায় চলে যেতাম, যেখানে মরা-মনের হাট। হেমপিশি চিঠি লিখেছেন। আর এ জঙ্গলে থেকে কি কোরব। কোলকাতার বাড়ীতে বাদুড় আর মাকড়সার জাল।

কেন, শেখর তো মাসে তিনবার যায় সেখানে।

হাসল সুলতা। বলল, হেমপিশি যা লিখেছেন তাই বললাম।

মোহন বলেন, আর কি লিখেছেন তোমার হেমপিশি?

লিখেছেন, সুধাদাদুর এ বয়েসে বনবাস আর সইবে না। দরকার হলে তিনি আসবেন।

সুলতা সুধাময়ের দিকে চেয়ে বলে, সত্যিই ওঁর বড্ড কষ্ট হয়।

হেসে মোহন বলেন, কিন্তু পঞ্চাশোর্দ্ধেই তো বনং ব্রজেৎ।

সুধাময় বলে, ওসব কেতাবে আর শাস্ত্রে লেখে বটে। কিন্তু জীবনে ওকথাটা একেবারে অচল বলে মনে হয় আমার।

মোহন বলেন, আমি রয়েছি কি করে? আর, চেয়ে দেখুন, বুড়ো মানুষ কি নেই জঙ্গলে?

ওরা আদিবাসী।

আমরা কি অনাদিবাসী? অনাদিকাল থেকে বাস করে করে আমরা কি বাসি হয়ে গেছি?

সুধাময় বলে, সে কথা নয় মোহনবাবু। আমার শরীর আর বইছে না।

আর তাছাড়া দিদি আমার এখন সাবালিকা। ব্যবসাপত্তরের ঝামেলাও আর ওকে বইতে হবে না।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে সুধাময় আবার, অবিনাশের সে কাঁচবাংলাই যখন আর রইল না, আমার এখন আর এখানে মন টিকছে না মোহনবাবু।

সুলতার দিকে চেয়ে বলে সুধাময়, দিদিকে কতো বলছি, আর এখানে থেকে কি হবে? ফিরে চল কলকাতার বাড়ীতে। সে তো তোমারও পৈতৃক বাড়ী। এ বনজঙ্গলে একা একা আর পড়ে কেন থাকবে?

মোহন বলেন, সুলতা, সুধাময়বাবু ঠিকই বলছেন। কি বল?

হ্যাঁ। উনি ঠিকই বলছেন। কিন্তু জানেন তো কলকাতার বাড়ীতে কেবল বাদুড় আর মাকড়সার জাল।

সুধাময় বলে, কি যে বল দিদি! চক্‌চকে তক্‌তকে এমন সুন্দর সাজানো বাড়ী তোমাদের সেখানে। শেখর ভাই বলে, তার সখের আস্তানা। আর তুমি কিনা সেখানে কেবল বাদুড়ের ঝাঁক আর মাকড়সার জাল দেখ? জঙ্গলে

তোমার বাঘ ভাল্লুককে ভয় হয় না, কলকাতায় মাকড়সার জালকে হয় ভয়? এ তুমি কেমন কথা বলছ দিদি?

সুধাময়ের মন উঠে গেছে ঝালুকপোখর থেকে। অবিনাশের মৃত্যুর পর তিনি মনে করেছিলেন তাঁর তত্ত্বাবধানে শেখর আর সুলতা কাঁচবাংলার মান-সম্মান বজায় রেখে অবিনাশের স্বপ্নকে সার্থক করে তুলবে। সুধাময় জানতো, সে স্বপ্ন অবিনাশের-ও ছিল। কিন্তু নিরুপায় ঈশ্বরের মত কেটেছে তার শেষের দিনগুলো। সুধাময়েরও আজ সেই একই অবস্থা যেন।

মোহন মিত্র বলেন, সুধাময়বাবু, অনিবার্য যা, তা এমনি করেই ঘটে। স্বপ্ন অনেকের অনেক থাকে। সার্থক হলে তো কথাই ছিল না। তাহলে কি কোন সাম্রাজ্য ভেঙে পড়তো কোনদিন?

সুলতার দিকে চেয়ে বলেন, তোমার মন যেমন কাঁচবাংলা থেকে উঠে গেছে, সুধাময়বাবুরও তেমনি ঝালুকপোখর থেকে। ওঁকে আটকে রাখার আর কোন স্বপ্ন উনি নিজেও গড়ে তুলতে পারবেন না, তুমিও তাঁর জন্যে নতুন কোন কিছু অবলম্বন দিতে পারবে না।

সুলতা বলে, তা জানি। আমি শুধু ভাবছি, আমার মেয়াদই বা আর কতদিন এখানে, কে জানে?

মোহন মিত্র উঠে পড়লেন।

আজ চলি মা। কিন্তু হিসেবটা আমরা আরেক রকম করে সাজাতেও পারি। একটু ভেবে দেখো।

মোহন মিত্রের মনটা আজ আবার ছেলেমানুষ সাজাতে চায় তাঁকে। ফিরে আসার পথটা আজ বড় বেশি দীর্ঘ বলে মনে হচ্ছে তাঁর।

চড়া রোদের আচমকা ধমক খেয়ে পথের দুপাশের বনজঙ্গল যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। ঝাঁ ঝাঁ করছে ঐ দূরের ছোট মাঠটা, যেখানে গাছ-পালা নেই। দূরেদূরে কেবল কয়েকটা শুকনো কাঁটাঝোপ। আগাগোড়া ধুলোয় ভরা। বড় রুক্ষ।

পথেই দেখা হয়ে গেল সতীনাথের সঙ্গে।

সদ্য জঙ্গল দেখে পায়ে হেঁটেই ফিরছে সে। ঘামে ভিজে গেছে তার পোষাক। মাথার টুপিটা নামিয়ে নিতেই ঝরঝর করে ঘাম ঝরে পড়ল সারা মুখ বেয়ে। পকেট থেকে রুমাল বার করে সতীনাথ মুখটা বারবার মুছবার চেষ্টা করল।

ভেজা রুমালে কি আর ঘাম তেমন ধরে ভাই ?

সতীনাথ বলল, ঠিক বলেছেন। আজ রোদের ঝাঁজটা বড় বেশি। কিন্তু আপনি এমন সময় এপথে কেন?

মোহন মিত্র বলেন, কোন্ পথ কখন কাকে কোথায় টানে, সে কি আগে থেকে তেমন মালুম করা সব সময় যায় ভাই ? নইলে তুমি সতীনাথ, ঠিক এমনি সময় এই একই পথে উদয় হবে কেন বল ?

এক সঙ্গে দুজনে পথ চলতে চলতে এগিয়ে এলেন রেঞ্জ অফিসের দিকে।

সতীনাথ বলে, গরমটা আজ একটু বেশি মনে হচ্ছে। তাই না ?

মোহন মিত্র বললেন, সবে তো ফাল্গুনের শেষ। এতেই ধৈর্য হারাচ্ছ ? শরহুল্ পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

সতীনাথ বলে, কিন্তু আশ্চর্য। রাতটা বেশ ঠাণ্ডা।

তাই হয়। জঙ্গলের শুধু নিয়মকানুনই আলাদা নয়। এখানকার জল-হাওয়াও আলাদা। সমঝে না চললে পদে-পদে অসুবিধে। পদে-পদে বিপদ। আলো-অন্ধকার বিশ্বাস-ভালবাসা বেইমানী-হিংসা সবই এখানে জীবন্ত সতীনাথ। অরণ্যে সব কিছুই জীবন্ত। একথা তোমাকে আগেও বলেছি। মনে আছে ?

সতীনাথ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল মোহন মিত্রের মুখের দিকে। মনে আছে তার। একথা বহুবার শুনেছে সে। কিন্তু আজ যেন কথাটার কোন মানেই বুঝতে পারল না সতীনাথ।

শামু দাঁড়ানো-পাখা সামনে এনে হাওয়া দিতে লাগল দুজনকে।

মোহন মিত্র বললেন, তুই থাম তো শেমো। ঐ অতবড় পাখা চোখের সামনে আর দোলাস্ না। বড় অস্বস্তি লাগে আমার। মনে নেই, আগেও তোকে বলেছি একথা ? বারণ করেছি ?

শামুর মনে আছে। কিন্তু আজ যেন একথার কোন মানেই হয় না এসময়ে।

মোহন মিত্র বললেন, সরিয়ে নে ঐ ধুম্সো তালপাখা। ব্যাটা যেন চামর দোলাচ্ছে। সরা।

সতীনাথ বলল, আর হাওয়া দিতে হবে না তোকে। ভাল করে চা তৈরী করে নিয়ে আয়।

বেশ প্রেম-সে।

মোহন মিত্রের একথায় সায় দিয়ে সতীনাথ হেসে বলে, হ্যাঁ, বেশ প্রেম-সে।

মোহন মিত্র বলেন, প্রেম কথাটা অত খাটো কোরে দেখো না সতীনাথ। তন্ময়মন লাগিয়ে যে কাজই করবে, যে কাজে প্রেমের পরশ থাকবে, তাই হবে উত্তম। একখিলি পান বা ভাতের থালার একপাশে একটু নুন রাখার ব্যাপারেও প্রেম আছে কি নেই, ধরা পড়ে যায়। তুমি যে পাইপটা এখুনি সাজলে, প্রেম-সে সাজলে। তৃপ্তি পেলে। এলোমেলো করে সাজলে এমন জমাট ধোঁয়ার রাশি···

তাঁকে বাধা দিয়ে সতীনাথ বলে, দাদাকে আজ কিসে পেয়েছে শুনতে পাই ?

সেকথার কোন উত্তর না দিয়ে গরম চায়ে চুমুক দিয়ে মোহন মিত্র বলেন, চল, আমরা সবাই ঝালুকপোখর ছেড়ে চলে যাই।

আশ্চর্য হয়ে সতীনাথ প্রশ্ন করে, কি হোল আপনার ? এমন কথা আপনার মুখে শুনলে আমরা টিঁকবো কোন্ সাহসে ?

তাইতো বলছি, তুমিও চলো।

কোথায় ?

যেখানে দুচোখ যায়।

দুজনেই শব্দ করে হেসে উঠল।

শামু পাশ থেকে দেখে হাসি সামলে ঘর থেকে চলে গেল। তার দিকে চেয়ে মোহন বলেন, এ একটি চীজ্ রে ভাই! এই শেমোর কথা বলছি।

সতীনাথ বলে, ওঃ, জ্বালিয়ে মারে সব সময়। তবু তারই মধ্যে এমন আকর্ষণ সৃষ্টি করে, ওকে না-পেলে কেমন যেন অস্বস্তি লাগে।

ঠিক বলেছ সতীনাথ। অনেক রকম জ্বালার মধ্যেও আকর্ষণ থাকে।

চা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন মোহন মিত্র।

সতীনাথ শামুকে ডেকে বললেন, ছাতা নিয়ে এগিয়ে দিয়ে আয় মিত্তর সাহেবকে।

মোহন বাধা দিয়ে বলেন, দরকার হবে না সতীনাথ। এই মাথার ওপর দিয়ে অনেক ঝড়জল আর কড়ারোদ পার হয়ে গেছে। তাছাড়া, ঐ যে বললাম, অনেক জ্বালার মধ্যেও কিছু-কিছু আকর্ষণ থাকে।

বেশ, চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

আবার কষ্ট করে কেন তুমি যাবে সঙ্গে ?

হেসে জবাব দেয় সতীনাথ, জ্বালা আর আকর্ষণের কথাটা আমার দিক দিয়েও খানিকটা সত্যি হতে পারে তো ?

বেশ, চল। মোহন মিত্র হাসলেন।

কিছুক্ষণ নিশব্দে পথ চলার পর কথাটা মোহন মিত্র বলেই ফেললেন।

এতদিনে সব কথা শুনেছ নিশ্চয়ই ?

সতীনাথ প্রথমটা একটু অবাক হয়। পরক্ষণেই বলে ওঠে, কাঁচবাংলার কথা বলছেন বোধ হয় ?

হ্যাঁ।

হেসে সতীনাথ বলে, ওখানে আমার কোন জ্বালাও নেই, আকর্ষণও নেই। তাছাড়া, ঠিকেদারের সাংসারিক গোলমালে আমার কি ? থাকুক বা চুরমার হয়ে যাক সব। যতক্ষণ আমাদের সরকারী কানুনের বিরুদ্ধে না যাচ্ছে তাদের রদবদলের ফলাফল, ততক্ষণ আমার সে সব ঘটনার সঙ্গে সম্বন্ধই বা কি, দায় দায়িত্বই বা কি বলুন ?

মোহন মিত্র কিছুই বললেন না।

সতীনাথ আজ বেশ বুঝতে পারছে, মোহন মিত্রর মনটা কিঞ্চিৎ চঞ্চল হয়ে আছে। যেটা একটু অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে তার কাছে।

একটা গাছের নীচে দাঁড়ালেন মোহন।

সতীনাথও সামনে এসে দাঁড়াল।

মোহন মিত্র ধীরে ধীরে বললেন, সম্বন্ধ না থাকতে পারে, দায় দায়িত্ব কিছু আমাদের না-ও থাকতে পারে ; কিন্তু সেখানে একজন মানুষ ছিল, হয়তো আমরা তাকে হারাতে বসছি। আর কিছু নয়। তাতে একটু, কি বলো সতীনাথ, একটু চিন্তা হবেই। আজ যদি আমিই তোমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাই, পথ চলতে চলতে কোন এক প্রখর দুপুরে তুমি কি কোন দিনও এমনি কোন উদার স্নিগ্ধ গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেবার সময়, একটি বারের জন্যেও মনে করবে না আমায় সতীনাথ ?

সতীনাথ চেয়ে দেখে, মোহন মিত্রের চোখদুটি জেগে আছে উত্তরের প্রতীক্ষায়।

বারো

চৈত্রদিনের ঝরাপাতার বেলা অবসানের পর নব পল্লবের বান যখন ডাকে বনরাজির শিরায়-উপশিরায়, তখন অরণ্যবাসীদের উৎসবের দিন, শরহুল্।

সৃষ্টিরক্ষার উৎসব।

বসন্ত উৎসব।

সব উৎসবের পেছনেও যেমন, এ উৎসবের পেছনেও তেমনি। ধর্মবিশ্বাস তো আছেই। আর আছে সৃষ্টিরক্ষা, ফসল রক্ষা, সার্বজনিক কল্যাণকামনার আনুষ্ঠানিক অভিব্যক্তি, শরহুল উৎসবে।

জীবজগৎ সমেত বিশ্বসৃষ্টির কাজ যখন সম্পূর্ণ হয়ে গেল, তখন নাকি মা বসুন্ধরা তাঁর সন্তানদের বুদ্ধিমত্তা আর মাতৃভক্তির পরীক্ষা নিতে বসলেন।

স্বাভাবিক।

তাঁর এতবড় সৃষ্টি সম্পদ যাদের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছেন, তারা সে সব রক্ষা করার উপযুক্ত হয়ে উঠেছে কিনা, মা বসুন্ধরা তা বাজিয়ে দেখতে চাইবেন বৈকি!

সন্তানদের ডেকে মা বললেন, বৎস, এতবড় সৃষ্টি যে তোমাদের হাতে তুলে দিলাম, সে সৃষ্টি রক্ষা করার মত লায়েক তোমরা হয়েছ কি না, তার পরীক্ষা দিতে হবে।

সন্তানেরা ভক্তিভরে মা বসুমতীর পদচুম্বন কোরে বললে, মা ধরিত্রী, সবই তো তোমার। বেশ। পরীক্ষা নাও।

বসুন্ধরা এবার কিঞ্চিৎ কঠোর-কণ্ঠে বললেন, উৎসর্গ চাই। নিবেদন চাই। বলি চাই।

সন্তানেরা ততোধিক শ্রদ্ধাসহকারে বললে, আজ্ঞা হোক দেবী।

আমাকে সন্তুষ্ট কর।

আজ্ঞা করুন।

দু-পেয়ে প্রাণী বলি চাই।

মর্তের সন্তানেরা সৃষ্টি-লগ্ন থেকেই বেশ ধুরন্ধর। বলে, সেকি মা? তুমি হলে মা বসুন্ধরা। তোমার তুষ্টির জন্যে মাত্র দু-পেয়ে প্রাণী বলি দোব? আমরা তোমার পায়ে বারো-পেয়ে প্রাণী বলি দোব, দু-পেয়ে তো অতি তুচ্ছ।

বসুমতী বুঝলেন, সন্তানেরা লায়েক হয়েছে। দু-পেয়ে বলি এড়িয়ে গেল। ভক্তির মাত্রা ছ'ডবল করে বারো-পেয়ে বলির ব্যবস্থা করছে। অর্থাৎ দু-পেয়ে মানুষবধ এরা করবে না। এদের হাতে সৃষ্টি তবে নিরাপদ।

সন্তানদের এমন চালাকিতে সন্তুষ্ট হয়ে মা স্মিতহাস্যে বললেন, তথাস্তু।

সেই থেকে শরহুল্ উৎসবে বারো-পেয়ে কাঁকড়া বলি দেওয়া ধর্মীয় বিধান। পরে অবশ্য দু-পেয়ে প্রাণীও তারা বলি দেয়। দেয় মোরগ। বারো মাসের নামে মিশ্রিত রং-এর মোরগই তারা বেছে নিল। প্রাচীন বটগাছের তলায় বসুন্ধরাকে তুষ্ট করার জন্যে কাঁকড়া আর মোরগ বলি এ উৎসবের প্রধান ব্যবস্থা।

মা তৃপ্ত হলেন। এবার সৃষ্টিরক্ষার চিন্তা।

মহাতাপ তপনদেবের সঙ্গে ধরিত্রীর বিয়ে।

না হলে সৃষ্টি রক্ষা হয় না।

শ্রাবণের ধারাবর্ষণের আগে সূর্যের প্রখর তাপে ধরিত্রীর জঠরে জন্মে ধারকশক্তি। সেই হোল বসন্তকাল। সেই শরহুল্। গাঁয়ের পাহান-পাহানীকে সূর্যদেবতা আর ধরিত্রীর সাজে সাজিয়ে বিয়ে হবে। গ্রাম্য পুরোহিত সূর্যের প্রতীক। তার পত্নী, ধরিত্রীর।

দুজনকে বিয়ের বেশে বসতে হবে লাঙলের জোয়ালের ওপর। লাঙল কর্ষণের প্রতীক। গ্রামবাসীরা জলের ধারা বর্ষণ করবে সূর্য ও ধরিত্রীর বেশে পাহান-পাহানীর মাথায়। সিক্তবস্ত্রে চারজন গিয়ে কাছের কোন ঝরণা বা পাহাড়ী নদীর বুকে চারটি মাটির কলস একবারে ডুবিয়ে ভরে তুলবে। অতি সযতনে সেই চারটি পূর্ণকুম্ভ নিয়ে আসা হবে গ্রামের প্রাচীন বটগাছের নীচে বোংগা স্থানে। পুব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ, দিক নির্ণয় কোরে চারটি ভরা-কলস বসানো হবে। পরদিন পাহানের অধিকার কলস চারটি পরীক্ষা করার। যে কলসিটিতে জল কমে যাবে, ওদের বিশ্বাস, সেদিকের দুনিয়ায় হবে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ।

বোংগা স্থলে তারপর গ্রামের প্রত্যেক বাড়ী থেকে একমুঠি কোরে চাল

জড়ো করা হবে। সেই কলস চারটিতে সংগৃহীত চাল দিয়ে বনৌষধি 'রাণু' মিশিয়ে কলসীর মুখগুলি ভাল কোরে বন্ধ কোরে দিয়ে পুঁতে রাখবে। উৎসবের বারোদিন পর কলসীগুলি তুলে এনে পানোৎসবে মাতবে গাঁয়ের মানুষ। আদিবাসীদের অতিপ্রিয় পানীয় এই ডিয়াং আকণ্ঠ পান করে মাতোয়ালা হবে আবাল বৃদ্ধ বণিতা। সারারাত ধরে চলবে বনকাঁপান নাগাড়া।

সৃষ্টি, ফসল, আর জীবরক্ষার এই উৎসব সতীনাথের অন্য সব উৎসবের চেয়েও অর্থময় বলে মনে হয়। এ অঞ্চলের সেরা পরব শরহুল্।

সারা ঝালুকপোখরে যখন প্রচার হয়ে গেল, এবারের শরহুল্ উৎসবের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে রেঞ্জার সতীনাথ, তখন চতুর্গুণ উৎসাহে মেতে উঠলো উৎসবের পাণ্ডারা। নাগাড়ার সংখ্যা বাড়ানো হোল। হাটের নাচে যেমন মাদল, পরবের নাচে তেমনি নাগাড়া। একসঙ্গে ঐ বৃহৎ নাগাড়া যখন বিশ-পঁচিশ খানা ডুড্ডুম্···ডুড্ডুম্ডুম্···শব্দে আকাশ-বাতাস আর বনাঞ্চল প্রকম্পিত করতে থাকে তখন বহুদূরের ঘরেও মানুষ আর নিঃসঙ্গ একা বসে থাকতে পারে না। পরবের আঙিনায় অনেক আগেই ছুটে যায় তার মন এক লহমায়। দেহ ছোটে তার পিছে-পিছে। এমন কি, যারা বনরাজ্যের ঠিকেদার, চাকুরে, তারাও স্থির থাকতে পারে না। আবার এ-ও দেখা যায়, অনেক উন্নাসিকের দল উৎসবের সময় কোন বড় শহরে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন। তাঁরাই আবার ফিরে এসে নিশীথ-সঙ্গিনীর অন্বেষণে হন্তে হয়ে ঘুরে মরেন।

রাতের যে কোন প্রহরে যদি সুদূর কোন নির্জন বাংলোয় আপনি নিস্তার পাবার লোভে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা কোরবেন বোলে সরে গিয়ে থাকেন, তখনও কানে যাবে ঐ বিশাল নাগাড়ার একটানা শব্দ। ঘুম ভেঙ্গে যাবে। বুক দুরু দুরু কোরবে। মনে হবে, সমস্ত জগত যেন আপনাকে নিতান্ত অবহেলায় চরম অনাদরে অন্ধ গুহায় ঠেলে ফেলে দিয়ে বিজয় দামামা বাজাতে বাজাতে অনেক অনেক দূর এগিয়ে গেল। ওদের নাগাল আর পাওয়া যাবে না। আপনার নিঃসঙ্গ আর্তচীৎকার কারো কানে গিয়েই আর পৌঁছবে না।

দূরদূরান্তর থেকে সকলের আত্মবন্ধু এসে উপস্থিত। নানান রকমের চালের পিঠা আর মাংস। তার সঙ্গে বারোয়ারী ডিয়াং এরা ব্যবস্থা অঢেল। সারা গাঁয়ের সবাই মিলে ডিয়াং প্রস্তুত কোরে জড়ো করছে। ছেলে-বুড়ো-যুবক-

যুবতী, কারো কোন বাধা নেই। যে যতটা খুশি, যার শক্তিতে যতটা কুলোয়, যতক্ষণ না ডিয়াং-এর ঘোরে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে, ততক্ষণ চলবে পানোৎসব।

দিন পনের আগে থেকেই ঘর নিকোনোর কাজ আরম্ভ হয়েছে। এমনিতেই এদের ক্ষুদ্র তুচ্ছ মাটির ঘর পরিষ্কার। ঝকঝকে। হাজার টাকার বিলিতি বাড়ীর ছাঁটা স্যুট পরেও সেখানে বসতে কোন দ্বিধা জাগবে না। তার ওপর এখন উৎসবের আয়োজন। প্রত্যেকটি মাটির ঘর যেন কোন নিপুণ শিল্পীর তুলিতে আঁকা এক এক খানি ছবি হয়ে ফুটে উঠেছে। দেওয়ালে দেওয়ালে বাঘ, ময়ূর, আর তীর-ধনুকের রং-চিত্র।

উৎসবাগ্নি জ্বলবে এবার বেশি সংখ্যায়।

সারারাত যখন নৃত্যগীত আর সুরাপান চলবে তখন কাঠের আগুন জ্বালানো হবে কয়েকটা কুণ্ড কোরে। ডিয়াং-সমুদ্র পান কোরে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে অনেকে ঐ কুণ্ডের চারিধারে।

নাচ উৎসবের আখড়া স্থির করা হোল পরিষ্কার ও বিস্তৃত স্থান দেখে। কারণ, কত লোক নাচবে, ক্রমে ক্রমে সে দল কতবড় দলে পরিণত হবে তার কোন আন্দাজ পূর্বাহ্নে পাওয়া মুস্কিল। ভিন্-গাঁয়ে নেচে নেচে হয়রান হয়ে নেশায় গড়াতে গড়াতে যারা প্রেয়সীর হাতে বন্দী অবস্থায় ঘরের পথে টলতে টলতে কোন রকমে চলবে, পথিমধ্যে একবার যদি দৈবাৎ তাদের চেতনা একটু ফিরে আসে, এবং এ গাঁয়ের নাচ গানের আসর যদি তখনো জমজমাট দেখে, তবে আর রক্ষে নেই। পথিক আর পথ প্রদর্শিকা উভয়েই তখন সব ভুলে আবার নতুন উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়বে এ-গাঁয়ের জীবন্ত উৎসবে। তাই, প্রত্যেক গ্রামেই আয়োজন থাকে প্রয়োজনের ঢের বেশি।

নিভু-নিভু শুক্নো কাঠের সেই অগ্নিকুণ্ডের আলোয় যারা বনাঞ্চলে শেষ রাত্রে পরবের নাচ দেখেনি, তাদের জীবনই বৃথা। কৃষ্ণকালো পাথরের মূর্তি ঐ যুবক-যুবতীদের দল কেমন কোরে সকল কামনা-বাসনাকে নাচের মধ্যে মোমের মত গলিয়ে নিঃশেষ কোরে দেয়, সে কথা লিখে বোঝানো অসম্ভব।

গাঁয়ের পূজারী দিওরী-ঠাকুরের আঙিনায় এসে বাঁশি-নাগাড়া আর নানান রকম তারের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে যুবক যুবতীর দল হাজির। বারোয়ারী পূজো শুরু হয়।

বনাঞ্চলই এদের দেবালয়। বনস্পতিই এদের দেবতা। মানুষের কল্যাণ কামনাই এদের পূজার মন্ত্র। বলে, বনবাসীর কল্যাণ কর। বনের কল্যাণ কর। হে বনদেবতা, সারা বিশ্বে যেখানে যে জীব আছে, সবার কল্যাণ কর।

তুমি এমন ভাবে মেতে উঠবে আমি ভাবতেই পারিনি, বলেন মোহন মিত্র।

সতীনাথ বলে, মেতে যখন উঠবো তখন আর কোন বাধা নিষেধ মানব না, এইটেই আমার সব চেয়ে বড় অসুবিধে দাদা। তাই যতটা পারি মাতামাতি থেকে প্রাণপণে দূরেই থাকতে চেষ্টা করি। জলে নামলে ডুব না দিয়ে আর ছাড়ি না।

একেবারে বনবাসীর চরিত্র। কিন্তু একটা মস্ত ত্রুটি থেকে যাচ্ছে।

একটু চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে সতীনাথ, ত্রুটি ?

হ্যাঁ।

কেন ? বাসব রতন, এরাই তো সবদিক দিয়ে ওদের মত কোরে ব্যবস্থা করছে।

তা তো কোরছে। ওদের নয়, ত্রুটিটা আমাদের থেকে যাচ্ছে।

বলুন, সুধ্‌রে নিই।

মোহন মিত্র বলেন, দেখ, প্রত্যেক পরবের সময় এখানকার আমরা সবাই, মানে, যারা 'ওরা' নই, চাঁদা দিয়ে থাকি।

হ্যাঁ তা দেখেছি।

এবার তুমি একাই সব ব্যয়ভার বহন করতে এগিয়ে এলে কেন, ঠিক বুঝতে পারছি না।

সতীনাথ কোন উত্তর না দিয়ে নিঃশব্দে একটু হেসে মাথা নিচু কোরে রইল।

মোহন বলেন, বন্ধু বান্ধব সবাইকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠিও দিয়েছ।

হ্যাঁ, দিয়েছি।

বেশ করেছ। কিন্তু যাদের আমন্ত্রণ জানালে না, তারা তাহলে আসবে কি কোরে ?

সতীনাথ বলে, কেন ? এ-তো সকলের উৎসব। সবাই আসবে।

না। তা আসবে না। ঠিকাদার গোষ্ঠী বেঁকে বসেছে। তাদের ধারনা, তুমি তাদের অপমানিত করছ।

আমি ?

হ্যাঁ। তাদের ধারনা। প্রত্যেক পরবে তারা চাঁদা দেয়, সহযোগিতা করে। যোগ দেয়। এবার তা থেকে তুমি তাদের বঞ্চিত করতে চাইছ, এই তাদের ধারনা। এটা অপমান।

কিন্তু ধারনা তো সত্যি নয়। আমি কাউকেই বঞ্চিত কোরতে চাই না। অপমানিত করা তো দূরের কথা।

একটু ভেবে নিয়ে মোহন বলেন, আচ্ছা, আমার কাছে খুলে বলতো ? হঠাৎ এ খেয়াল তোমার হোল কেন ?

সতীনাথ বলে, আপনি তো গোড়া থেকেই উৎসাহ দিয়ে আসছেন। আর, জানেন তো, কেমন একটা সখ জাগলো। আমার নিজের মনে রাখার মত কিছু কোরব।

সতীনাথের মুখের দিকে চেয়ে মোহন বলেন, এর মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন অহংকার যে কাজ করেনি, সে কথা বলতে পার কি জোর কোরে ?

কি বলছেন আপনি ? আমার অহংকার ?

ওহে বালক। ভাল কোরে বুঝে দেখ।

সতীনাথ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে, এক তিল নয়। আপনি বিশ্বাস করুন।

মোহন বলেন, শুধু আমার বিশ্বাসকে মূলধন কোরে একটা বারোয়ারী উৎসবকে নিজস্ব কীর্তি বোলে জাহির করবার তো তোমার কোন অধিকার ছিল না ভাই।

কি বলছেন আপনি দাদা ?

আমি ঠিক বলছি। এতে তোমার ক্ষতি হবে। তোমার বনজীবন সুখের হবে না।

তাহলে, আপনি কি বলেন, সব বন্ধ কোরে দেব ?

না না। বন্ধ করবার তুমি আমি কে ? উৎসব হবেই। তবে মূলাধার সাজবার চেষ্টা না করলেই ভাল করতে। এতে তোমার ক্ষতি হতে পারে। রতনের কাছে শুনে আমি ছুটে এসেছি।

রতন তো আমাকে উৎসাহই দিয়েছে।

নিরুৎসাহের কোন কথা সে আমাকেও বলে নি। বরং গর্ব করেই বলেছে, তুমি একাই খরচ করবে।

তবে ?

শুধু অরণ্যসন্তানদের নিয়েই বনাঞ্চল নয় সতীনাথ। জানোতো, পশুর চেয়েও হিংস্র কিছু মানুষও থাকতে পারে এখানে। তাদের এতদিনের দাপট তুমি একের পর এক এমনি কোরে ভেঙ্গে যাবে, আর তারা চুপটি কোরে বসে বসে তামাসা দেখবে, বিষয়টা এত তরল বলে ভাবতে পারলে কি কোরে ভাই ?

সতীনাথ চিন্তিত মুখে চুপ কোরে রইল। মোহন বলেন, দেখো, আমরা চাকুরেরা আজ আছি কাল নেই। কিন্তু যাদের কায়েমী স্বার্থ জড়িয়ে আছে প্রত্যেকটি গাছের শেকড়ে-শেকড়ে, তারা বংশানুক্রমে চিরকাল থাকবে এখানে। প্রতিপক্ষকে পরাস্ত কোরতে এমন কোন অস্ত্র নেই যা তারা হানবে না। সরকারী নিয়মে যা চলে তাতে কোন দোষের নেই। কিন্তু তুমি এবার এমন একটা জায়গায় হাত দিয়েছ যাতে ওদের গর্বিত মাথাগুলো বাসব-রতনদের কাছে হেঁট হয়ে যাবে। ওরা ছেড়ে কথা কইবে না। তোমার ক্ষতি কোরবে। তুমি চলে গেলে ঐ নিরীহ মানুষগুলোর কষ্টের সীমা রাখবে না ওরা।

তাই বোলে আমার একটা সাধ……

মোহন বলেন, ঠিক তাই। তোমার একটা মাত্র সাধ মেটাতে গিয়ে আর দশজনের সব সাধ নষ্ট কোরে বসবার অধিকার তোমায় কেউ তো স্বেচ্ছায় দেবে না ভাই।

ব্যথিত কণ্ঠে সতীনাথ বলে, বেশ। উৎসবের আগেই আমি চলে যাবো এখান থেকে তাহলে।

মোহন বলেন, এমন অবুঝ অভিমান তোমার তো সাজে না সতীনাথ।

সত্যিই সাজে না।

অন্ততঃ সাজা উচিত নয়। মোহন মিত্রের কথাগুলো সতীনাথের মনকে চঞ্চল করে দিয়ে যায়। সে একাই এমন কোন্ পরাক্রমশালী মহাপুরুষ যে প্রত্যেকের বহুদিনের অধিকার আর মুরুব্বিয়ানা এক আঘাতে ভেঙ্গে দিয়েও নিজে অক্ষত অবস্থায় বহাল ভবিষ্যতে বজায় থাকবে ? এই যে প্রবল ক্ষমতা

আর অর্থের অধিকারী ঠিকাদার গোষ্ঠী, যাদের কথায় এ অঞ্চলের মানুষ হাজার অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওঠে-বসে, সরকারী চাকুরের দল, যারা ওদের দয়া দাক্ষিণ্যের প্রসাদে ফুলে-ফেঁপে দিগ্বিজয় করে বেড়ায়, সবার স্বার্থে, সবার অন্যায়-অধিকারের মূলে আঘাত হানবার চেষ্টা নিশ্চয়ই তার অরণ্যজীবনে শান্তির অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

একটা হেলান-দেওয়া চেয়ারে বসে সতীনাথ নিজের সখের গোলাপ বাগানের দিকে চেয়ে একমনে পাইপ টানে।

ইতিমধ্যেই ঠিকাদারের দল তার ওপর অসন্তুষ্ট। তাদের অন্যায় লোভের বিষ দাঁত তুলে ফেলার ক্রমাগত প্রচেষ্টা তাদের অনেক বেদনার সৃষ্টি করেছে। কাঁচবাংলা ওদের সকলকে পথ দেখাচ্ছে। বাসব-রতনের দলকে, অর্থাৎ এ অঞ্চলের অরণ্য সন্তানদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করার অভিযোগও হয়েছে সতীনাথের বিরুদ্ধে। যতদিন সুলতা ছিল কাঁচবাংলায়, ততদিন সে অভিযোগটা এমন খোলাখুলি আলোচিত হতে পায় নি। কারণ স্থানীয় লোকদের অভাব-অভিযোগ জানাবার প্রধান আশ্রয়স্থল ছিল তখন কাঁচবাংলা। আজ সেখানে প্রত্যেকটি ঠিকাদারের মজলিশ। সন্ধ্যায় বসে মহ্‌ফিল। শেখরচাঁদ আমন্ত্রণ জানায় সবাইকে। সতীনাথও বাদ পড়ে না। তবে কোনদিন সতীনাথ শেখরের কাঁচবাংলায় মহ্‌ফিলে যোগ দিতে যায় না। বাসব-রতনের দলও বেগার দিতে যায় না। তাতে কিছু এসে-যায় না। সুন্দরমের কোন ব্যবস্থায় ত্রুটি থাকবার জো নেই। পয়সার লোভে সব কিছু কোরতে তৈরী থাকে, এমন মানুষের অভাব হয় না অরণ্য অঞ্চলেও। কয়েকটা দিন জমজমাট মহ্‌ফিল চলে কাঁচবাংলায়। স্ফূর্তির ঘোর কেটে গেলে শেখরচাঁদকে বিষণ্ণ দেখায়। যা কোনদিন কাঁচবাংলায় ঘটেনি অবিনাশের কাল থেকে, তাই ঘটতে হুকুম জানাচ্ছে সে নিজে।

সুন্দরম বলে, বারবার তোমার কলকাতা যাবার দরকারটা কি শরীরটাকে কষ্ট দিয়ে? কলকাতাকেই এখানে এনে বসিয়ে দেব। ভাবনা কি?

সে ভাবনা শেখরের ছিল না। তার জন্যে যা কিছু প্রয়োজন তা আছে তার অফুরন্ত। তার ভাবনা ছিল অন্যত্র। ভাবনা ছিল ছোট বাংলা। যেখানে সুলতা থাকে। যে সুলতা কাঁচবাংলায় আর কোনদিন একটিবারের জন্যেও এসে দাঁড়াল না। শেখরের ভাবনা ছিল সুলতা।

তবে সে ভাবনার আয়ু বড় স্বল্প। বড় বড় ঠিকাদারদের ঘন ঘন আনা-গোনা, খানা-পিনা শলা-পরামর্শ আজ কাঁচবাংলাকে যেন আরো ব্যস্ত, আরো বিখ্যাত কোরে তুলেছে। তারা বলে, এই যে বোহেমিয়ান জীবন আমাদের, তার মধ্যে বৈচিত্র্য না হলে বাঁচব কি কোরে আমরা বলুন শেখরবাবু ?

শেখর ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দেয়, নিশ্চয়ই।

ওরা বলে, কাঁচবাংলা আজ আমাদের টেন্ ডাউনিং স্ট্রিট্।

শেখর ম্লান হাসি হাসে। বলতে পারে না, নিশ্চয়ই।

ওরা বলে, আমাদের পূর্বপুরুষদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর তপস্যাকে আমরা এই কাঁচবাংলা থেকেই সারা দেশময় ছড়িয়ে দেব।

এবার শেখর একটু জোর দিয়েই বলে, নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই।

ওরা বলে, আমাদের সকলের কো-অরডিনেটেড্ এ্যাকশানের সামনে, ঐ একটা তুচ্ছ মানুষ ? তৃণখণ্ডের মত ভেসে যেতে কতক্ষণ ?

শেখর চুপ কোরে থাকে।

এবার সুন্দরম বলে, যেন তামাম এলাকার মৌরসী পাট্টা নিয়ে এসে হাজির হয়েছে সতীনাথ। সবাইকে শাসন দিয়ে কাট্ টু সাইজ করার স্বপ্ন দেখে লোকটা। এই দশ পনেরটা বনেদী কোম্পানীর আয় কমিয়ে দিয়ে তার গর্বের সীমা নেই। তুমি কিছু ভেবনা শেখরচাঁদ। সব ঠিক হয়ে যাবে।

অন্যান্য সকলে চলে যাবার পর সুন্দরম বলে, সুলতাকে কাঁচবাংলা থেকে সরিয়ে নেওয়ার সমস্ত ফন্দীটা সতীনাথের।

শেখর সোজা হয়ে জিজ্ঞাসা করে, তার মানে ?

সুন্দরম বলে, তাকে আলাদা করে পাওয়ার···

চীৎকার করে উঠে দাঁড়ায় শেখরচাঁদ। সুন্দরম্, নো ফারদার।

এই জবাবের জন্যে সুন্দরম ভেতরে ভেতরে আজ যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। বলল, সকলের মুখ তুমি আটকাতে পারবে না শেখর। এটা আমাদের কলঙ্ক। কাঁচবাংলার কলঙ্ক।

ঘরময় অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়াতে থাকে শেখরচাঁদ। গেলাসটায় শেষ চুমুক দিয়ে নতুন সিগারেট ধরিয়ে সুন্দরম বলে, নইলে একটা প্রতিবাদ জানালেন না তিনি ? সমস্ত এলাকায় আমাদের মাথা হেঁট করে দেবার

জন্যে এবারের শরহুল উৎসব, মনে রেখ শেখরচাঁদ। পুরোন আমল থেকে সব উৎসবের আগে এই কাঁচবাংলায় ভিড় লেগে থাকত। এবার একটা কাকের দর্শনও কি পেয়েছ বলতে পার? আমরা যে আর কিছুই নই, শুধু ঠিকাদার, তাও তারই দয়ার ওপর নির্ভর, এই কথাটা সদম্ভে প্রমাণ কোরতে উঠে পড়েছে লোকটা। সব কোম্পানী এটা অপমান বোলে মনে করে। সে ক্ষেত্রে ছোট বাংলা...

কথা শেষ হবার আগেই শেখরচাঁদ ভেতরের দিকের দরজাটা সজোরে ঠেলে নিজের বিশ্রামের ঘরে চলে গেল।

সুন্দরমের মুখে যেন চাবুক পড়ল। সে দিকে চেয়ে একা দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর মুখে অপ্রস্তুতের হাসি টানবার চেষ্টা কোরে বাইরে যেতে যেতে বিরক্তিভরা চাপা স্বরে বলল, রাবিশ্।

নিবারণ কুণ্ডু আর শাওজীদের আনা-গোনা শুরু হয়েছে আজকাল। না অবিনাশের কালে, না সুলতার কালে, কাঁচবাংলার চৌহদ্দী পেরোবার অধিকার ছিল না তাদের।

নিবারণ বলে, কোথায় আব জানবো সুন্দরি সাহেব? তোমরা থাকতে এরকমটা ঘটে যাবে আমরা দেখব কেমন কোরে? গাঁয়ের লোকগুলোকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে নতুন কাঠ-ঠ্যাংগা রেঞ্জার। নইলে বাসবের এতবড় দেমাগ্? রতনাটার এত শেখি? এত মেজাজ ওদের? যে সুদের টাকা ওরা ঘরে পৌঁছে দিয়ে পায়েব ধুলো নিয়ে ফিরে যেত, সেই টাকা আদায় করতে এখন নিদেন পাঁচ সের ছোলা খরচ? টাট্টুটাতো আর খালি পেটে গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরতে পারে না?

সুন্দরম বলে, সেতো ঠিক কথাই।

নিবারণ আর শাওজীরা একটা কথা এড়িয়ে যায়। সুলতার আমলের কাঁচবাংলার কথাটা। তারা পাস কাটিয়ে যায়। মনে মনে জানে, সতীনাথ আসবার আগে থেকেই কাঁচবাংলা তাদের গর্বকে অনেকখানি খাটো করে ফেলেছিল। তখন থেকেই এই জংলীগুলো ঘাড় সোজা করে কথা বলতে সাহস পেয়েছে। কথায় কথায় ওরা বলত, কাঁচবাংলার মেমসাহেবের হাতে ঘোড়ার চাবুক আছে। চাবুকের ছায়াটা সুন্দরমের চোখের সামনে আজো মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে।

সতীনাথ আসবার পর থেকে ওদের জোর যেন দ্বিগুণ। জোরজুলুম করে হুকের টাকা আদায় করতে গেলে বলত, রেঞ্জার সাহেবের কাছে চল! চল কাঁচবাংলায়!

তুমি সুন্দরি সাহেব সব সামলে দিয়েছ। আর তো কাঁচবাংলায় মিটিন্ হয় না।

সুন্দরম বলে, ছোট বাংলায় হয়।

নিবারণ বলে, মিটিন্ না। এখন ইস্কুল হয়। মেম সায়েব এখন মাস্টারনী হয়েছেন। ছেলেবুড়ো সবাইকে টেনে এনে অ-আ ক-খ পড়াচ্ছে।

সুন্দরম বলে, একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো? ভদ্দরলোকের দেখা আর কোথায় পাবে? ওদের নিয়েই গুলতানি কোরে সময় কাটায়।

নিবারণের সাহস বাড়ে। আমরা ভুলিনি সুন্দরি সাহেব। হাটে সেদিন যে মূর্তি নিয়ে রতনের দল এসেছিল, সে কথা আমরা ভুলব না। এক মাঘে শীত পালায় না। আমরা বেঁচে আছি। মরিনি। আর বেঁচে আছে তোমার এই কাঁচবাংলা। আমাদের আর ভয় নেই। ডর নেই।

*　　　*　　　*

সুধাময়ের মুখে সব বৃত্তান্ত শুনে কলকাতায় আর একদিনও স্থির থাকতে পারেন না হেমপিসি। কোলের মেয়ে টুলটুল আর পাড়ার ছেলে কিঙ্করকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন।

কিঙ্করকে প্রলোভন দেখান হেমপিশি,—দেখবি চল। কি জায়গা।

কিঙ্কর বলে, একটা খবর দিয়ে গেলে ভাল হোত না?

হেমপিসি ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, তুই থামতো। খবর দেব কাকে? আমি কতবার গেছি, তখন টুলটুল এত্তো টুকুনটি।

কথাটা একদিক দিয়ে কিছুটা সত্য বটে। কিন্তু 'কতবার গেছি' নয়, একবার তিনি গেছেন। শোভারাণীর মৃত্যুর পর যখন আত্মীয় স্বজনের দল অবিনাশের কাছে গিয়ে জুটেছিল। তাঁকে বুঝিয়েছিল, আবার তুমি বিয়ে কর অবিনাশ। নইলে বাচ্চা দুটোকে দেখবে কে? সংসার টিকবে কেমন কোরে? রাশভারি অবিনাশ সেদিন ওঁদের কলকাতায় ফিরে যেতে কোন্ গাড়ি বেশি আরামদায়ক হবে সেকথা ভাল কোরে বুঝিয়ে বিদেয় কোরে দিয়েছিলেন, তারপর থেকে আর কেউ ওমুখো হন নি এতদিন।

সুধাময়ের মুখে শেখর আর সুলতার পৃথক হয়ে যাওয়ার কথা শুনে হেমপিসি আর স্থির থাকতে পারলেন না।

কিঙ্করকে বললেন, ভয় কি? আমি সব চিনি। গোয়েলকেরা ইষ্টিশনে নাববো। খবর পাঠালেই গাড়ী আসাবে।

কিঙ্কর প্রশ্ন করে, ইষ্টিশন থেকে কতদূর?

—তা মাইল পঞ্চাশেক হবে।

চমকে উঠে বলে কিঙ্কর. ওরে বাবা। পঞ্চাশ মাইল জঙ্গলের ভেতর?

হেমপিসি বলেন, ইষ্টিশনগুলোও তো সব জঙ্গলের ভেতর। ভয়টা কিসের? চনা দেখবি।

॥ তেরো ॥

এমন সব সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড শুনে আমি কি আর কলকাতায় চুপ কোরে বসে থাকতে পারি শতু? তুই বল? পারি?

হেম পিসিকে শান্ত কোরে সুলতা বলে, বেশ করেছ। আমারও একা একা আর ভাল লাগছিল না।

বন-বাদাড়ে তাই কি ছাই কারো লাগে?

কিঙ্কর বলে উঠল, as a matter of fact দু চার দিন ভাল লাগে। বেশ লাগে। যারা আমাদের কলকাতায় একবার গেছে তাদের জঙ্গলে সবদিন ভাল লাগতেই পারে না।

সুলতা জীপ চালাতে চালাতে একবার কিঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে সোজা সামনের দিকে চেয়ে গাড়ি চালাতে লাগল। উঁচু নিচু পাহাড়ী পথ দিয়ে জীপ ছুটে চলেছে।

হেম পিসি কিঙ্করকে পিঠে একটা মৃদু আঘাত দিয়ে বলে, দেখ! পারবি এমন গাড়ি চালাতে?

টুলটুল উচ্ছসিত হয়ে বলে ওঠে, কখনো না। এমন রাস্তায় কিনুদা কখনো গাড়ি চালাতে পারবেই না। কলকাতার রাস্তাতেই···

কিঙ্কর বলে, তুই থামতো। কলকাতার রাস্তায় কত ভিড়। As a matter of fact এখানে তো ফাঁকা রাস্তা। ট্রাফিক নেই।

টুলটুল বলে, দাও তো ওকে ষ্টিয়ারিংটা লতুদি। দেখি, ট্রাফিক বড় না পাহাড় বড়? উঃ গায়ে আমার কাঁটা দিয়ে উঠছে যখন লতুদি তুমি পাহাড়ের গা বেয়ে জীপ নিচের দিকে চালাচ্ছো! কি ঘোরানো রাস্তা। মাথা ঘুরে যাবে। কিনুদা, পেছনে তাকিয়ে দেখ আমরা কোন জায়গা ছেড়ে এলাম। দেখ এখন সেটা কতো উঁচু আর জঙ্গলে ভরা। মনেই হচ্ছে' না ওখানে কোন রাস্তা ছিল। কেমন কোরে নেমে এলাম আমরা।

হেমপিসি মেয়েকে বলে, দেখবি। আরো কতো দেখবি। বলেছিলাম না চ দেখবি কেমন জায়গা? হ্যাঁ লতু, কাছে-পিঠে কোন ঝরণা টরণা নেই? সেদিক দিয়ে নিয়ে চ না মা। টুলি আমার ঝরণা দেখতে বড়ো ভালবাসে।

কিঙ্কর বলে as a matter of fact…

তার কথা শেষ না হতেই সুলতা টুলটুলকে বলে, তোমার ভাল লাগছে?

টুলটুল চোখবুঁজে মাথা নেড়ে বলে, খুউব। খুউব ভালো।

সুলতা বলে, আচ্ছা। তোমাকে রোজ নিয়ে বেরোব, কেমন?

টুলটুল সুলতার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলেওঠে, সত্যি? তাহলে আমি কোন দিন তোমাকে ছেড়ে যাবো না লতুদি। সত্যি বলছি।

মৃদু হেসে সুলতা বলে, তোমার মা যদি চলে যান?

টুলটুল বলে, তবু আমি যাব না। দেখো।

কলকাতার জন্য মন কেমন কোরবে না?

কখনো না।

হেমপিসি বলে, দেখলি মেয়ের কাণ্ড? কলকাতার জন্যে মন কেমন কোরবে আবার না। সে বার গেছলি তো ঝাড়গ্রামে। সাতটা দিনও থাকলি না। বললি, কলকাতায় না গেলে বাঁচবি-ই না।

কিঙ্কর বলে, as a matter of fact, একঘেয়ে কোন জিনিষই ভাল লাগে না।

সুলতা বলে, তুমি ঠিক বলেছ ভাই।

জীপ থামিয়ে বলে সুলতা, এবার একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক সবাই মিলে। কি বল?

কৃত্রিম অনিচ্ছা প্রকাশ কোরে টুলটুল বলে, না লতুদি। কেন থামালে? চা পরে হবে।

হেসে ওঠে সুলতা।

হেম বলে, কত ঘুরতে পারিস দেখা যাবে। এখন নাব দিকি। গলাটা একটু ভেজাই।

টুলটুলকে নামতে হোল। জীপের গদিগুলো নামিয়ে পেতে বসল সবাই। ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে সকলের সামনে রাখল সুলতা।

বিস্কুট?

টুলটুল বলে, না বাবা। যা পেটপুরে তোমাদের ইস্টিশেন মাস্টার সাত সকালে খাইয়ে দিলে লুচি-হালুয়া, তার ওপর আর বিস্কুটের জায়গা নেই।

হেমপিসি বলে, যাই বল, তোদের মাস্টার মশাই লোকটি খুব ভাল। খুব ভদ্র। যেই বললুম, কাঁচবাংলায় যাবো, একটা খবর পাঠাতে পারেন? ভদ্রলোক যেন হাতে-পায়ে নেচে উঠল। নিশ্চুই নিশ্চুই। কত গাড়ি-লরি যাচ্ছে। খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। বললুম, আমরা তাহলে টুরিং বাংলোটায় গিয়ে থাকি? মাস্টার মশাই বললেন, তাও কি হয়? আমি ফ্যামিলিম্যান। আপনাদের কোন কষ্ট হবে না, বোলে হাঁক-ডাক কোরে আমাদের মালপত্তর আনিয়ে তুললেন নিজের কোয়াটারে।

টুলটুল চায়ে চুমুক দিয়ে কপালে উড়ে-পড়া চুলগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলল, তাই অমনি সে ভাল লোক হয়ে গেল!

নয়তো কি? বৌ ছেলেমেয়েরাও খুব ভাল। সে কথাও বলছি। আমাদের পেয়ে খুব খুশি।

আর আমরা যে ওদের পেয়ে বেঁচে গেলাম, সেকথাটা বলছ না? টুলটুল বলে।

হেম বলে, তা তো বাঁচলুমই। রাতটা কাটল নিশ্চিন্তে। তা বাংলোতেও কাটতো।

সুলতা একটু হাসল। বলল, আগে রিজারভেশন্ করা না থাকলে ওখানে থাকা যায় না।

কেন? সে বার যে ছিলুম?

সে বার যখন হেমপিসি এসেছিলেন, তখন সুলতা ছোট। সবে শোভারাণীর

মৃত্যু হয়েছে। অবিনাশই আগে থেকে ব্যবস্থা কোরে রাখায় হেমপিসিদের দল সেখানে থাকতে পেয়েছিলেন, সুলতার এ কথায় হেম বলে, তবে যে সবাই বলে, যখন ইচ্ছে গিয়ে ওসব বাংলায় উঠলেই হোল ?

টুলটুল বলে, হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমিও পড়েছি কোথায় যেন…

সুলতা বলে, ভুল। ওটা হয় না। মাস্টারমশাই সত্যি ভালমানুষ না হোলে রাতটা আপনাদের ওয়েটিং রুমেই কাটাতে হোত।

কয়েকদিনের মধ্যেই হেমপিসি সুলতাকে উৎসাহ দিয়ে নিজে সোৎসাহে হাত লাগিয়ে অগোছালো ছোটবাংলাকে সাজিয়ে গুছিয়ে তুললেন। টুলটুল আর কিঙ্কর নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। শালফুলে কখন মধু হয়, মধু ঝরে গেলে ফুলে সুগন্ধ হয়; না মধুভরা কালে, এই নিয়ে তুমুল তর্ক জুড়ে দেয়। কখনো বা আমলকি গাছের পাতা নিয়ে বিনুনি গাঁথে টুলটুল। বেণীর চারধারে জড়িয়ে দেয়। কিঙ্করকে সাবধান কোরে দিয়ে বলে, ছুঁয়ো না কিনুদা, খুলে যাবে। সত্যি, ভারি রাগ করব কিন্তু তাহলে।

কিঙ্কর বলে, আমার বুঝি রাগ হয় না ? তুই সবার সামনে আমাকে কিনুদা বলে ডাকিস কেন ?

যা বলে এতদিন ডেকেছি, তাই বলেই ডাকি। তাতে কি হয়েছে ? টুলটুল প্রশ্ন করে। বলে, তোমার ডাক-নাম তো কিনু।

কিঙ্কর বলে, না। কিনুদা বলে ডাকবি না। কিনু নামে গোয়ালা-গোয়ালা গন্ধ। দেখলি না তোর লতুদির লাইব্রেরিতে ? কখনো আর ওনামে ডাকবি না, বলে দিলাম।

কিছুক্ষণ টুলটুল চেয়ে রইল কিঙ্করের মুখের দিকে অর্থহীন ভাবে। তারপর হঠাৎ সশব্দে হেসে উঠে দুহাতে মুখ ঢেকে একরকম ছুটেই পালাতে যাচ্ছিল। কিঙ্কর তার আঁচলের একপাশটা চেপে ধরে।

টুলটুল চঞ্চল হয়ে বলে ওঠে, এই ছাড়। এটা কলকাতা নয়।

দুজনে ঘরের পথে ফিরে চলে।

একসময় টুলটুল নিজেই হেসে যেন গড়িয়ে পড়তে চায়।

অবাক হয়ে কিঙ্কর বলে, কি হোল ?

একটা কথা মনে পড়ে গেল।

কি কথা ?

একটু ভেবে নিয়ে টুলটুল জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, বলত কিঙ্কর মানে কি ?

তার মানে ? পাল্টা প্রশ্ন করে কিঙ্কর।

তাই তো জিজ্ঞেস করছি।

অনেকক্ষণ মাথা খাটিয়েও কিঙ্কর নিজের নামের মানে বলতে পারে না।

তার অসহায় অবস্থা দেখে টুলটুল আরো হাসতে থাকে। বলে, পারলে না তো ?

গম্ভীর হয়ে বলে কিঙ্কর, সকলেই কি নিজের নামের মানে জানে ?

নিশ্চয়ই। সব্বাই জানে।

কিঙ্কর চুপ্ কোরে থাকে।

তবু কিঙ্করকে নিরুত্তর দেখে বলে টুলটুল, গম্ভীর হচ্ছ কেন ? তোমার যে নাম ধরে সবাই ডাকে, তাতে তুমি গোয়ালার গন্ধ পেলে। কিন্তু তোমার আসল নামের মানে খুব দারুন, বুঝলে ?

এবার জিজ্ঞাসু চোখ দুটো তুলে ধরলো কিঙ্কর টুলটুলের মুখের ওপর।

তুমি ভাবছ কেন ? তুমি Kingmaker.

আশ্চর্য হয়ে কিঙ্কর বলে, কেমন ?

ওমা, এটুকুও জানো না ? King করোতি যঃ, সঃ কিঙ্করঃ।

এটা কি হোল ?

সংস্কৃত।

অসম্ভব। এ কি সংস্কৃত হোল ?

হেসে টুলটুল বলে, হোলো না বুঝি ?

মোটেই না।

না হোক সংস্কৃত। রাজা তো করে দিলে।

কাকে ? As a matter of fact............

আর কোন জবাব না দিয়ে টুলটুল ছোট বাংলোর সিঁড়ি দিয়ে দ্রুতপায়ে বারান্দায় উঠে চলে যায়। পেছন ফিরে চেয়ে দেখে না।

বেশ স্বাগতভাবেই হেমপিসি বলল, এমন সব সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড আমি কিছুতেই মেনে নেব না সতু। তুই হাজার বললেও না। শেখরকে মানতেই হবে। কেন ? আমরা কি কেউ নই ? সাবালক হয়েছে তো কি হয়েছে ? কতবার

কলকাতায় বলেছি, হঁ্যারে, আত্মীয়স্বজন কি বলবে বলত? যে দিদি মাথার ওপর থেকে তোকে বড় করে তুলল, তাকে এমনভাবে দূরে সরিয়ে দিলি? তা বলে কিনা, আমিতো চলে যেতে বলিনি। স্বেচ্ছায় চলে গেছে।

সুলতা বলে, শেখর ঠিক কথাই বলেছে পিসি। তাকে থামিয়ে দিয়ে হেমপিশি বলে, তুই থামতো। স্বেচ্ছায় চলে গেছে! হতে পারে কখনো? কলকাতার বাড়ীতে গিয়ে কি হুল্লোড়, কি মোচ্ছব। শেষে পাড়ার লোকে অতিষ্ঠ। আমি বলি, শেখর, বনজঙ্গলে বসে যা পারিস করিস। এখানে গায়ে গায়ে বাড়ী। হাজারটা চোখ আসে-পাশে। টুলটুল কতবার বলে, নিয়ে চল আমায় লতুদির কাছে। কিন্তু কোন কথা কি শোনে? কই, তোর বাপও তো হামেশা কলকাতার বাড়ীতে যেত। তোর মা যেত। এমন সব সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড তো দেখিনি কোন দিন।

হেমপিসির আক্ষেপ-তরঙ্গের মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে সুলতা জিজ্ঞাসা করে, পিসি, কিঙ্কর ছেলেটি কি তোমাদের পাড়ার? কই কখনো তো দেখিনি সেখানে?

একগাল হেসে হেম জবাব দেয়, ওমা, তা জানিস না? তা, জানবিই-বা কি কোরে? তুই তো কত বছর আর যাস নি। ঐ যে রে নিতুঠাকুরপোর শালী? হেরম্বভবনটা কিনেছিলো। তাতেই ওরা গেল অঘ্রাণ মাসে নতুন ভাড়াটে এসেছে। বড় ভাল মানুষ ওর মা। ওর বাবা যুদ্ধের কি কাজ করে বাবা, অতশত জানিনা। তবে ইয়া জঁাদরেল চেহারা। পুরুষ্টু একজোড়া লম্বা গোঁফ। মাঝে মাঝে আসেন ভদ্রলোক। তিনিও খুব ভাল।

সুলতা বলে, তাই বুঝি?

হঁ্যা তাই। বললুন, চল কিনু, তোকে জঙ্গল-টঙ্গল দেখিয়ে আনি। ছেলেটা আমার খুব ন্যাওটা। বুঝলি? আব্দার-জুলুম করে। চেয়েচিন্তে কেড়ে-বেড়ে খায়। একেবারে ঘরের ছেলের মত। তা আবার নাড়ুর সহ্য হয় না। বলে, মা, তুমি কিনুকেই বেশি ভালবাস দেখছি। আমি বলি, মা ষষ্ঠীর কথায় আছে, নিজের ছেলেকে মাটিতে বসিয়ে পরের ছেলেকে কোলে তুলে নিতে হয়, জানিস?

নাড়ু এখন কি করে?

ওমা! সে এখন মস্ত লেখক। আমার কোলের ছেলে সেই নাড়ুগোপাল। ভেবে দেখ একবার। ওতো রাইটার্স বিল্ডিং-এ ঢুকেছে।

কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে সুলতা বলে, সে কি রকম?

সগর্বে হেম বলে, রাইটার। রাইটার। তবেই না রাইটার বিল্ডিং-এ কাজ পেয়েছে। পাঁজা-পাঁজা কাগজ। তাড়াতাড়া। লিখে লিখে নাড়ুর আমার আঙুলে কড়া পড়ে গেছে। তবু বলি দেশের কাজ, তাতে তো আর বাধা দিতে পারি না। তারও পর রাইটার হয়ে শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র শুনেছি কত নাম করেছে। আমার নাড়ু……

বাধা দিয়ে সুলতা জিজ্ঞাসা করে, আর রবি ঠাকুর?

এবার হেমপিসি যেন চটেই ওঠে। বলে, রবি ঠাকুরের কথা আর বলিস নে লতু। সবার মুখেই ঐ এক রবি ঠাকুর। আমি সব জানি। তখনকার সায়েব-সুবোর সাথে ভাবসাব ছিল, তাই এত নাম। ওর শেষের কবিতাও পড়েছি, শেষের উপন্যাসও পড়েছি। কিছু আর বাকি রাখিনি। গাদা গাদা বই তো আলমারিতে তোর ঠেসে রেখেছিস। পড়ে দেখিস। এখন সব সায়েব-সুবো চলে গেছে। কই, হোক তো দেখি আরেকটা তোদের রবিঠাকুর। তারাই না দয়া কোরে বিলেতে এক ছড়ার চটি বই নিয়ে গিয়ে একগাদা টাকা পাইয়ে দিয়েছিল? তাই নিয়েই না শান্তিনিকেতন! আমরাও অত টাকা পেলে পাড়ায় পাড়ায় ওমনি শান্তিনিকেতন করে দিতে পারি কলকাতাতেই। তার জন্যে ঐ এঁদো পাড়াগাঁ বোলপুর খোলপুর যেতে হবে না।

সুলতা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে হেমপিসির মুখের দিকে।

হেম বলে, আমারো সাত আটটা ছেলেমেয়ে হয়েছে লতু। আমার আর কিছু জা'নতে বাকি নেই।

সুলতা বলে, না না। আমি তা বলছি না। আমি বলছি তুমি ওকথাটা ঠিকই বলছ। অত টাকা থাকলে রবিঠাকুরের মত সবাই শান্তিনিকেতন গড়ে দিত। আমাদের টাকা থাকলে আমরাও পারতুম। কি বল হেমপিসি?

হেম বলল, ওকথা তোদের মুখে মানায় না লতু। টাকা তোদের কাঁড়ি কাঁড়ি। তবু তো তোরা ভাইবোনে মিলে কি অশান্তি নিকেতনটাই না গড়ে তুললি। বনজঙ্গল বলেই সব সয়ে গেল। শহরটহর হোলে মুখ দেখাবার জায়গা থাকত না। রোস্ না। যাচ্ছি শেখরের কাছে। সব বাঁদরামি ভেঙ্গে দিচ্ছি।

সুলতার বুঝতে বাকি থাকে না কেন অবিনাশ এইসব তথাকথিত আত্মীয়-স্বজনকে কাছে বেশি ঘেঁসতে দিতেন না। কলকাতাতেও না। ঝালুকপোখরেও

না। সুলতা নিঃশব্দে নিজের পড়ার ঘরে উঠে যায়। আর কোন কথা বলে না। বোঝে, এঁরা পারেন না এমন অনিষ্ট সংসারে জানা নেই। নানা আশঙ্কায় তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। গায়ে পড়ে আত্মীয়তার দাবীতে কৃত্রিম স্নেহের অধিকারে সব কিছুর ওপর দুষ্ট আধিপত্য বিস্তার কোরে এঁরা শুধু অন্যের স্বাধীন জীবনযাত্রাকে বিঘ্নিতই কোরে তোলেন না, পদে পদে অশান্তির বেড়াজাল সৃষ্টি কোরে অপরের সহজ জীবনযাত্রাকে বিষময় কোরে তোলাতেই এঁদের স্বার্থ-সিদ্ধির পথ খুঁজে পান। তাতেই তৃপ্তি পান। এঁদের প্রতিবাদ করতে গেলে যে মহা অশান্তির সৃষ্টি হয়, সংসারে অনেক শান্তিপ্রিয় মানুষ তা থেকে বিরত থাকাকেই অপেক্ষাকৃত কম বিপজ্জনক মনে করে। সুলতা এই প্রকৃতির হওয়ায় হেমপিসি ঝালুকপোখরে নিজের আসন এবার মাত্র কয়েকটা দিনেই বেশ কায়েমী করে নিয়েছেন। আশে-পাশের সবাই জানল, হেমপিসি অবিনাশের সহোদরা। নূতন বাসবরা জানল, সুলতার ওপরেও কেউ কথা বলার আছে। তারও নিজের বলতে অন্ততঃ হেমপিসি আছেন। কলকাতায় থাকেন বলে ঝালুকপোখরের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব কম হবার কথা নয়।

সেই থেকে হেমপিসি নিয়মিত কাঁচবাংলায় যাওয়া আসা আরম্ভ করলেন। কখনো টুলটুলকে সঙ্গে নিয়ে আবার কখনো বা একাই। শেখর তাঁকে শ্রদ্ধা না করলেও সমীহ করে। সুন্দরম অন্তরঙ্গ ব্যবহার করে। কলকাতায় যতবার তারা যায়। হেমপিসি স্বেচ্ছায় তাদের দেখাশোনার ভার নিজের হাতে তুলে নেন। ওদের তেমন কিছু প্রয়োজন সেখানে না থাকলেও হেমপিসিকে সবকিছু থেকে নিরস্ত কোরতে পারে এমন শক্তি শেখরের নেই। সুন্দরমের সে প্রয়োজনও নেই। বরং হেমপিসির নিরর্থক এই হাঁক-ডাক আর ক্ষণস্থায়ী মেকী অভিভাবকত্ব বেশ উপভোগ্যই মনে হয় সুন্দরমের। সবার ওপর টুলটুল মেয়েটা এসে ছটফট করে, ঘরময় ছুটোছুটি করে। মায়ের আদেশে নতুন নতুন নাচ দেখিয়ে আনন্দ দেয়, এসব উপভোগ কোরতে ভালই লাগে সুন্দরমের। এখানেও তাই হেমপিসিকে ভালই লাগে সুন্দরমের। টুলটুলকেও ভাল লাগে। আর কিঙ্কর? সে তো আজ্ঞাবহ অনুচর মাত্র হেমপিসির। অর্থাৎ সুন্দরম্-কে সে সমীহ কোরেই চলে। শেখরকে দাদা বলে। সুন্দরমের কোন আপত্তি থাকবার কথা নয়।

শেখর বলে তুমি আমার মাসী।

হেম বলে, সে কিরে? তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? বার বার মাসী মাসী করিস? পিসিকে কি কেউ মাসী বলে?

শেখর জোর দিয়ে বলে, সে যাই হোক, তুমি আমার মাসীই।

হেমপিসি বলে, আমি তোর মনের কথা বুঝতে পারি শেখর, আমাকে তুই লতু পাসনি। একেবারে ফেল্না সম্বন্ধ নয়, বুঝলি? তোর বাপ তো আর তোর পর ছিল না। তার খুড়তুতো বোনের ননদের বড়জা' মেনকার বকুলফুলের সাক্ষাৎ ছোটকাকা আমার বাপ স্বর্গীয় শ্রীগদাধর সামন্ত। তাঁরই বড় মেয়ে আমি। আমি তোর মাসী হলাম কি কোরে? আমি পিসি। হেম পিসি। তোদের সকলের।

না। মাসী।

তোর এই বেয়াড়াপনাই তো লতু সহ্য করতে পারে না। বোন পিসি বলে ডাকুক, আর তুই তার ভাই হয়ে আমায় মাসী বলে ডাক। লোকে কি বলবে বলতো?

কথা ফিরিয়ে শেখর বলে, আজ টুলাকে আনলে না কেন?

হেমপিসি বেশ গম্ভীর হয়ে বলে, জানিস তো সে কেমন অভিমানী মেয়ে। বললে, দু'দিন গেলাম শেখরদার কাছে, একদিনও নিজে এল না। আর যাব না।

শেখর হাসতে লাগল। বলল, যাব। যাব। বড্ড ব্যস্ত থাকি। কাজকর্ম এমন সব ছড়িয়ে আছে চারিদিকে যে ফু ফেলতে ফুরসৎ পাচ্ছি না। বাবার আমলে তো কথাই নেই, দিদির আমলেও কিছু দেখতাম না। এখন……তাকে বাধা দিয়ে হেমপিসি জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁরে লতুকে তুই বড্ড ভয় করিস। তাই নাকি?

কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে হঠাৎ বলে ওঠে শেখর, তুমি এ প্রশ্ন আমাকে কলকাতাতেও অনেকবার কোরেছ হেমপিসি। আমি দিদিকে ভয় মোটেই করি না। সে ভয় দেখাবার মানুষ না। এর চেয়ে আর বেশী কিছু শেখরচাঁদ সুলতা সম্বন্ধে বলতে পারল না। আজ বোলে নয়, কোনদিনও কারো কাছে বলতে পারল না। শিশুকাল থেকে যে তার একমাত্র খেলার সাথী, শৈশবে যে ছিল তার একমাত্র আগলে রাখার মানুষ, যৌবনে এসে যে হোল তার একমাত্র অভিভাবক, সেই সুলতা সম্বন্ধে শেখরচাঁদ এর চেয়ে বেশি আর কিছু বলতে পারল না। কোন দিনও কারো কাছেই না। সুন্দরম তাকে বোঝালো বলেই

নয়, সে নিজেও নিজের বিচার দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছে, এই বনরাজ্যে নারীর কর্তৃত্বকে মাথায় বয়ে নিয়ে খুব বেশিদূর স্বাধীনভাবে সসম্মানে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আরো দশটা কোম্পানী আছে। তাদের মালিকের দল আছে। তাদের কাছে, শেখরচাঁদ পুরোদস্তুর একজন সবল সক্ষম পুরুষ হয়েও, নিষ্কর্মা অপদার্থের পরিচয় নিয়ে, নাবালকের অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়াতে পারে না। সেটা তার পক্ষেও যেমন অবমাননাকর, তার দিদির পক্ষেও তেমনি খুব একটা গৌরবের নয়। তারওপর সুন্দরমের মত দক্ষ চৌকোস লোক যখন আজও তারই অধীনস্থ থেকে স্বীকৃতি পেতে চায়, তখন আর অসুবিধেটা কোথায়? তবে হ্যাঁ, সমস্ত কিছু ভাগাভাগির যে ব্যাপারটা সেটা আইনগত বিষয়। ওটা পাকাপাকি হয়ে যাওয়াই ভাল। তাই সে-কাজটা শেখর ফেলে রাখতে চায় নি। না হলে নিজের সম্পূর্ণ স্বাধীন সত্তা ফিরে পাওয়া অসম্ভব। তাই বোলে সুলতার কোন অসম্মান হয়, এমন কাজ সে নিজেও করেনি, অপরের বিন্দুমাত্র তেমন চিন্তাকেও বরদাস্ত করেনি কোনদিন। সুন্দরমের মত তার একমাত্র সহায়সম্পদকেও নির্বাক কোরে দিতে ছাড়ে নি। বুঝিয়ে দিয়েছে, শেখরচাঁদের কাছে সুলতার ভালমন্দ কোন কথাই বলবার কারো অধিকার নেই। সে স্পর্দ্ধা কখনো কারো না হয় সে দিকে শেখরচাঁদ সত্যিই সজাগ।

সে নিজের দুর্বল স্থানটিকে ভাল কোরেই চেনে। জানে নিজের ক্ষমতার পরিধি। তাই সুন্দরমকে না হোলে তার চলে না। এই মাত্র। নিজে একথাও জানে, বৈষয়িক হয়ে ওঠার শত চেষ্টাও তার সার্থক হবার নয়। তবে বিষয় নষ্ট হয়, তেমন ব্যবস্থাকেও সে নিশ্চয়ই মেনে নিতে পারে না। এ অঞ্চলে তারা একটা বিশেষ মান মর্যাদার অধিকারী। পুরুষানুক্রমে সেটা বজায় রাখার দায়দায়িত্ব তারই।

এসব অবশ্য শেখরের নিজের কাছে নিজের জবাবদিহি। আসলে সে নির্ভর করতে চায় এমন একজনের ওপর যে তার সবরকম খেয়ালখুসির রসদ জুগিয়ে চলবে বিনা প্রশ্নে। সুন্দরমের ভেতর সেই নির্ভরতার আশ্বাস পেয়ে আসছে শেখরচাঁদ। অন্য কোন পথ তাই তার কাছে অপরিচিতও বটে, অসহ্যও বটে।

এক এক সময় তার মনে হয়, জীবনটাও অসহ্য। কলকাতাতেই স্থায়ীভাবে থাকবে। যা পারে সুলতা করুক ঝালুকপোখরে। সুন্দরম ঠিক সেই সময় এগিয়ে আসে।

তা হয় না শেখর। তাহলে কলকাতাতে তোমার বসবাসও যেমন ক্ষণস্থায়ী হয়ে পড়বে কিছুদিনের মধ্যেই, তেমন কাচবাংলা চিরদিনের জন্যে ধ্বংস হয়ে যাবে। তোমার দাঁড়াবার আর জায়গা থাকবে না কোথাও।

শেখরের মনের মত না-হলেও কথাটা সে ভেবে দেখেছে বহুবার। একেবারে মিথ্যা হয়তো সুন্দরম বলছে না।

শেখর তখন চুপ কোরে থাকে।

. বেশি অসহ্য হলে, বিশ্রামের ঘরে গিয়ে গেলাসে চুমুখ দিয়ে-দিয়ে ভেঙে পড়ে। সুন্দরম অপ্রস্তুতের হাসি ঢাকতে গিয়ে চাপাকণ্ঠে বোলে ওঠে, রাবিশ্।

চৌদ্দ

ওদিকে শরহুলের আর বেশি দেরী নেই। সমস্ত ঝালুকপোখর মেতে উঠেছে গাঁয়ের প্রতি ঘরে-ঘরে সকলের স্বজন-বন্ধুদের ভিড় যেমন লেগেছে, তেমনি রেঞ্জকোয়ার্টার আজকাল সারারাত আলোয় আলোময়। বিন্দু, দিগম্বরের দল তো আছেই, আর এসেছে হেমেন। সতীনাথের স্কুল-কলেজের সহপাঠী। জামালপুর রেল কারখানায় চাকরি করে। সতীনাথের চিঠি পেয়ে হেমেন এসেছে। তাকে নিয়ে ক'দিন সতীনাথ একটু যেন বাড়াবাড়িই করে চলেছে। তরুবালার কাছে নিয়ে গেছে। বলেছে, হেমেন আমাদের দার্শনিক। ছেলেবেলায় আমরা ওকে পুঁচ্কে দার্শনিক বলতাম। বৌদি, হেমেনও আপনার এক নতুন ঠাকুরপো।

মোহন মিত্র বলে উঠলেন, আর কতো ঠাকুরপো গছাবে ভাই? বোনপো ভাইপো মালপো ঠাকুরপো—এর কোনটাই আমার পছন্দ নয়। অন্য কোন সম্বন্ধ তোমাদের মুখে আসে না? যাতে আমারো খানিকটা সুবিধে থাকে? তরুবালা হেমেনের সামনেই মোহন মিত্রকে যেন একটু শাসনের ভঙ্গিতে বলে, আর তোমার কোনো সুবিধের বয়েস কি আছে যে অন্য সম্বন্ধ পাতাবে? আমার ঐ ঠাকুরপোই বেশ ভাল লাগে।

তাতো লাগবেই। কোঁচা দুলিয়ে ঠাকুরপো সাজতে আমারও কি সাধ যায় না ভেবেছ? বয়েস কি কোরবে? জানো না, ভাসুরে করিলে মন দেওর হতে কতক্ষণ?

তরুবালা সতীনাথের দিকে চেয়ে বলে, আচ্ছা বলত ভাই এঁকে কি করবো? ঘরে তালা বন্ধ কোরব?

সতীনাথ বলে, সারা জীবনটা আপনার কাছে যিনি বন্দী হয়ে রইলেন, তিনি কি আর তালা চাবির ভয় করবেন?

হেমেন উপভোগ করে। বলে, বেশ আছ সতীনাথ। দাওনা একটা সুযোগ কোরে। কাটাই তোমাদের সঙ্গে। সতীনাথ বলে, জানেন বৌদি হেমেন আবার লেখেটেখে। পাটনায় ওদের একটা পত্রিকা আছে। ওদিকে খুব চলে। হেমেন তার একজন মাতব্বর।

হেমেন লজ্জিত হয় না। বলে লেখা কি অপরাধ?

মোহন মিত্র বলেন, অপরাধ কেন হবে? তবে যে বললে জামালপুরে কারখানায় চাকরি কর?

তাও করি।

বেশ ভাল কথা। এবার জঙ্গল ঘুরে গিয়ে আমাদের নিয়ে লেখো দিকি। এদিকের কথা তো কেউ লেখে না।

হেমেন নিঃশব্দে হাসল।

মোহন বললেন, কেন? কথাটা মনে ধরল না বুঝি?

তা নয়।

তবে? এ তুচ্ছ এলাকার কথা লিখে কি হবে, তাই ভাবছ বুঝি?

হেমেন বলে, না। তাও নয়।

এ-ও নয়, সে-ও নয়। তবে কি?

হেমেন বলে, সাতদিন জঙ্গল বেড়াতে এসে এদের কথা লেখবার চেষ্টা করা অপরাধ ছাড়া আর কিছু মনে হয় না আমার। সেটা উচিত নয়।

কেন?

সব না দেখলে জানলে,…

কেন? এই তো উৎসব এসে গেল। ক' দিন ঘোর। দেখ। তারপর লিখবে। আমার বড় ইচ্ছে, আমাদের কথা লিখে বাইরের জগতকে জানাও।

হেমেন বলে, সাতদিন দশদিন বা দু দশ মাসের পুঁজি নিয়ে সে কাজে এগোন কি ভালো হবে মনে করেন? এদের চিনতে হবে। জানতে হবে। দেখতে হবে। দু-দশ মাসেও কি আমার পক্ষে সেটা সম্ভব হবে?

কেন ?   তাতেও কি তোমার লোক দেখবার সাধ মিটবে না ?

না। তেমন তো রেলজংশনের স্টেশনমাস্টার লক্ষ লক্ষ লোক নিত্য দেখে থাকেন ট্রেনের কামরায়। প্লাটফর্মের ওপর। বলুন, কোন্ স্টেশনমাস্টার কবে কোথায় মাত্র সেই পুঁজির বলে মস্ত সাহিত্যিক হয়ে উঠেছেন ? সময় আর সংখ্যাটা খুব একটা কিছু নয়। আমি নিজে তার ঠিক উপযুক্ত কিনা, সেই বিচার-শক্তিটাই বড় কথা। কি বলুন ?

হেমেনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে মোহন বলেন, তুমি তো বেশ স্পষ্ট কোরে কথা বোলতে পার হেমেন। বাঃ।

সামান্য হেসে হেমেন বলে, কথা দিয়েই যখন বোলতে হবে তখন স্পষ্ট কোরে বলা ছাড়া আর তো কোন অন্য উপায় আমার জানা নেই।

সতীনাথ বলে ওঠে, বলেছিলাম না দাদা, হেমেন আমাদের দার্শনিক। ছেলেবেলা থেকেই।

হেমেন আবার বলে, কেন বারে বারে দার্শনিক বল ? ও-কথাটার অর্থ সেদিনও বুঝতাম না, আজো বুঝি না। স্পষ্টকথা বলতে দার্শনিক না হলেও বোধহয় চলে। আবার তোমাদের সব দার্শনিকই যে সব সময় স্পষ্ট কোরেই কথা বলেন, তাও ভাই আমার তেমন জানা নেই কিন্তু।

তরুবালা বলে, তবে না-ই লিখলে ভাই। ওসব গোলমালের মধ্যে আমি তোমায় এত সব শুনে আর যেতে বলতে পারব না। ফিরে গিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে গল্প-টল্পও তো কোরতে পারবে।

নিঃশব্দে হাসে হেমেন। বলে, তা হয়তো পারব।

অসময়ে সেদিন হেম একাই এসে হাজির।

উঃ, দমবন্ধ হয়ে মরে গেলাম মিত্তির মশাই। আর পারি না।

গরমের দুপুরে মোহন মিত্র আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করছিলেন। দিবানিদ্রার একটা হাল্কা আমেজ তাঁর চোখ দুটোকে একটু ঝিমিয়ে দিয়েছিল। হরি দরজা খুলে দিতেই একরকম ছুটেই সে-ঘরে প্রবেশ কোরে তরুবালার বিছানায় বসে আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, দমবন্ধ হয়ে মরে যাবো মিত্তির মশাই। উঃ, আর পারি না। ধড়ফড় কোরে উঠে বসে মোহন বলেন, সে কি কথা ? মরে যাবেন কেন ? বসুন বসুন। আমি আপনাকে হাওয়া করি।

তারপরই হেঁকে ওঠেন, হরি, গামছা ভিজিয়ে আন দেখি। একঘটি জলও। বলে, নিজে দাঁড়িয়ে উঠে সাঁই-সাঁই কোরে জোরে জোরে তালপাখার বাতাস করতে লাগলেন।

তরুবালা উঠে তাঁর হাত থেকে পাখাটা প্রায় কেড়ে নিয়েই বলে, আঃ আমায় দাও না। হেমপিসিকে বলে তরুবালা, এই দুপুরে কি বেরোতে আছে ? কি গিরিস্তি দেখছেন না! চারিদিকের পাহাড় তেতে ফুটে পড়ছে। ধান ফেলে দিলে খই হয়ে যাবে। এমন তপ্ত-খোলা। তার মধ্যে……

তরুবালার কথা শেষ না হতেই হেম বলে, সাধ কোরে কি আর মরতে এসেছি দিদি ? দম আমার বন্ধ হয়ে গেল যে।

মোহন বলেন, সে কি কথা ? খোলা-মেলা জায়গা। আপনার দম বন্ধ হচ্ছে কেন ?

সেই আর বোঝে কে বলুন ? দাদার সবকিছু এবং দু ভাইবোনের রেশারেশিতে একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে বসেছে। এখন আপনারা একটু এগিয়ে না এলে আমি একা তো আর পারিনে মিত্তির মশাই। আমারও তো একটা দায়িত্ব আছে।

হ্যাঁ। তাতো আছেই।

ওদিকে আমাব নিজের সংসারও আছে।

হ্যাঁ। তাতো আছেই।

এদিকে আমি চিরদিন তো আর বসে থাকতে পারি না।

না। তাতো পারেনই না।

হরি ভেজা গামছা আর জলের ঘটি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল।

তরুবালা তাকে বলল, রাখ্, মেঝের ওপর।

মোহন বলে, আগে মুখে মাথায় একটু জলের ঝাপটা দিয়ে নিন। ইস্, একেবারে রক্তচণ্ডীকা মূর্তি হয়ে উঠেছে আপনার। বাড়ীতে কোন কলহ টলহ…

হেম বলে, সে তো দিনরাত লেগেই আছে। দু'বাড়ী সামলাতে আমার জীবনান্ত।

তরুবালা হেমকে বারান্দার সিঁড়ির কাছে নিয়ে গিয়ে মুখেচোখে জল দিয়ে, ভেজা গামছা মাথায় চাপা দিয়ে ভেতরে এনে বসিয়ে পাখার বাতাসে শান্ত কোরতে লাগলেন। মোহন হরিকে ডেকে আদেশ করলেন, একটু সরবতের ব্যবস্থা কোরতে।

শোভারাণীর মৃত্যুর পর যখন হেমপিসি আর কয়েক জন আত্মীয়ের সঙ্গে ঝালুকপোখরে এসেছিলেন, তখন মোহন মিত্র এখানে ছিলেন না। তাতে কোন অসুবিধে হয় নি। এবার যখন এসেছেন তখন প্রায় প্রতিদিনই তিনি টুলটুল, সুলতা আর কিঙ্করের সঙ্গে এবাড়ী এসেছেন এবং ঘনিষ্ঠতা স্থাপন কোরে নিয়েছেন। প্রায়ই বলতেন, দম আটকে মরবার জোগাড় মিত্তির মশাই। পা বাড়াবার জায়গা নেই। কারো ওখানে গিয়ে দু দণ্ড যে দুটো মনের কথা বলে খালাস হব, জঙ্গলে দেখছি আপনাদের সে সুবিধে নেই। এই তো ক'খানা বাড়ী। আর তো জংলী ভূতের ছাউনি। উঃ। আপনারা থাকেন কি কোরে? দমবন্ধ হয়ে আসে না? ইত্যাদি।

কিন্তু আজ তাঁর নতুন কোরে দমবন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম কি কারণে ঘটলো ঠিকমত বুঝতে না পেরে মিত্তির মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু, আজকের বিষয়টা কি বলুন তো?

ততক্ষণে সাদা পাথরের গেলাসে সরবৎ পানান্তে হেমপিসি কিঞ্চিৎ শীতল হয়েছেন। ধীরে ধীরে বললেন, শোনেন নি?

না তো।

শেখর বাবাজীদের কাণ্ড কারখানা! কোত্থেকে সব বাঈ আসছে। নাচ হবে। আপনাদের কি সব উৎসব বুঝিনে। বলল, নওটংকী-যাত্রা হবে। জংগলে বসে এত কাণ্ড মানুষ করে তা তো জানা ছিল না।

মোহন একটু হাসলেন।

তরুবালা বলে, আপনি নাচ দেখতে আসবেন তো?

হেমপিসি বলে, ক্ষেপেছো দিদি? স্পষ্ট বলে দিয়েছি শেখরকে, ওসব হলে আর তোর কাঁচ বাংলায় পা দেব না।

তাঁকে বাধা দিয়ে তরুবালা বলে, ও নাচ নয়। কাঁচবাংলার নাচ নয়। শরহুলের নাচ। আর তো মাত্র তিনদিন? আসবেন তো?

চোখ প্রায় কপালে তুলে হেমপিসি বলে, ঐ ভূতের নাচ? রাম বল। আমিও আট ন' টি ছেলে পুলের মা। আমার কোলের ছেলে নাড়ুগোপাল আর কোলের মেয়ে টুলি। আমার আর কিছু জানতে বাকি নেই। তাই তো বললাম, দমবন্ধ হয়ে মরে যাবো। কাল সন্ধ্যেয় ওবাড়ী গিয়ে দেখি এলাহি কাণ্ড কারখানা। ন' দশটা তাগড়া খাসি বাঁধা। শেখরকে জিজ্ঞেস করলাম,

মধুবন—৮

শেষে খাসি পুষবি নাকি? বললে, পুষবো কেন, খাবো। সামনে তিনদিন ভোজভাত। বললাম, কিসের? তা বলে কিনা উচ্ছব। শরহুল উৎসবের দাদামশাই এবার মক্‌বরহুল উৎসব। অবাক হয়ে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম, ওমা এমন সব উৎসবের নাম তো কোনকালে শুনিনি। শেখর বললে, জঙ্গলে কত রকম উৎসব হয় তুমি কি সব জানো? তা জানিনা বটে, কিন্তু নরবলি তো বুঝি। শেখর বলে, মক্‌বরহুল উৎসবে না কি নরবলি হবে। হ্যাঁ মিত্তির মশাই, একি সত্যি?

মোহন মিত্র হেমপিসির মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। কোন কথা বলতে পারলেন না।

তরুবালা বলে, মকবরহুল উৎসব আবার কি? ওসব বাজে কথা। শেখর আপনার সঙ্গে তামাসা করেছে।

না দিদি, না। তামাসা নয়। জ্যান্ত দশটা খাসি তো তামাসা নয়। সামিয়ানা, ঝাড়ের বাতি, মখমলের জাজিম, কার্পেট, লোকজনের হৈ চৈ, এসবই তো নিজের চোখেই দেখে এলাম।

মোহন এবার বলেন, তা হবে কিছু। তবে মক্‌বরহুল বোলে কোন উৎসব নেই।

না থাকে সেই ভালো মিত্তির মশাই। কিন্তু লতুর কাছে সব বলায় ও বললে, বেশতো, তুমি আমাদের সঙ্গে যেও। নাচ দেখবে। শরহুলের নাচ।

তরুবালা বলে, আমিও তো তাই বলছি।

ও-ম্যা-গো: ঐ ধুম্বো ধুম্বো জোয়ানগুলো বুকখোলা সব জোয়ান মাগীদের কোমর জড়িয়ে মদ খেয়ে নাচবে, তাই দেখবে, তাই দেখতে আসব আমি? ছ্যা ছ্যা। তাই তো লতুকে বললুম, তোদের কিসে ধরেছে বলতো? বে-থার কথা বললে তো মুখ ফুলিয়ে উঠে যাস। যেমন তুই, তেমনি শেখর। আর বাঈ নাচাতে, ভূত নাচাতে তোদের বাধে না? আমি কোনটার মধ্যেই নেই। মরবি তোরা, মর। আমি এবার পালাবো কলকাতা। বাব্বাঃ। এসবের মধ্যে সভ্য মানুষ থাকে? তাইতো দম বন্ধ হয়ে মরবার জোগাড়। ছুটে এলাম আপনাদের এখানে। এখানে এসেও শুনছি আপনারাও শরহুল দেখবেন। এখন আমি যাই কোথায় বলতে পারেন?

মাথার টাঁদি হাতের চেটোয় হাতিয়ে হাতিয়ে মোহন মিত্র হয়তো

জবাবটা ভাবছিলেন। হেমপিসি বললেন আবার, বলুন। আমি তাহোলে যাই কোথায় ?

ধীরে ধীরে মোহন মিত্র বলেন, সে-ওতো এক সমস্যা।

হেমপিসি মিথ্যা বলেন নি।

কাঁচবাংলা আজ নতুন সাজে সেজেছে।

মারুকগঞ্জের নামকরা মেহেরাবাঈ-এর তাঁবু পড়েছে একদিকে, অন্যদিকে মুনেরীবাঈ-এর। নওটংকী-যাত্রাদলের তাঁবু আরেক দিকে। সওকৎ আলির সানাই-ও বাদ পড়েনি। তল্লাটের যত বড়-ছোট সব কোম্পানীর মালিকরা মুক্তহস্তে খরচ কোরছেন। নানা অঞ্চল থেকে আমন্ত্রিতের দল এসে পৌঁছেছেন। তারমধ্যে কোন কোন বিশেষ ধরণের সরকারী পদস্থ ব্যক্তিরাও আছেন। অবশ্য তাঁরা আস্তানা গেড়েছেন নানান বাংলোয়। গিল্‌হেট সাহেবের পরিত্যক্ত পোড়ো-বাংলাটাও এই সুযোগে সিমেন্টের স্পর্শে বেশ গর্বের সঙ্গে মুখ উঁচু কোরে দাঁড়িয়েছে। হেমপিসি শুধু খাসি আর কার্পেট, মখমল আর ঝাড়বাতি দেখেই দমবন্ধ হয়ে দুপুর রোদে ছুটে বেড়ান নি। তিনি যে সব কারণে দমবন্ধ হয়ে মরতে বসেছেন, তার মধ্যে বিশেষ দুটি কারণ আছে। এবং সেই কারণ দুটিই একেবারে মুখ্য। জ্যান্ত খাসি আর ঝাড়লণ্ঠন দিয়ে তিনি সে কারণ দুটি সুকৌশলে যতখুশি ঢাকবার চেষ্টা কোরে থাকলেও ঢাকা পড়েনি। অন্ততঃ সুলতার কাছে তো নয়-ই।

হেমপিসি ধরেই রেখেছেন, আজ হোক, কাল হোক, তাঁর কোলপোঁছা মেয়ে টুলটুল শুধু কাঁচবাংলার নয়, কাঁচবাংলার সমগ্র সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী রূপে দেখা দেবেই। নইলে তাঁর এতদিনের এত পরিশ্রম কি বৃথাই যাবে ? শেখর কলকাতায় গেলে হেমপিসির সমস্ত পরিচর্যা সব তদারকি সজাগ পাহারা কি কেবলই পণ্ডশ্রম ? টুলটুলের এত গান এত নাচ, শেখরের এত কাছাকাছি থাকা কি নিরর্থক ? হেমপিসি মানতে মোটেই রাজি নন যে শেখর একেবারে বিরূপ। শেখরের মদ্যপানে তাঁর কোন আপত্তি নেই। আগেই তিনি বলেছেন, আহা, পুরুষ মানুষ একটু-আধটু খেলেই বা, পুরুষ তো বামুনের সাবেকি বিধবা নয় যে গঙ্গাজল ছাড়া আর কিছু ছোঁবে না। শেখর সে কথায় খুশিই হয়েছে। বলেছে, তুমি মাসী খুব আধুনিকা। শেখরের ভুল ধরিয়ে দিয়ে বলে:ছন, মাসী নই পিসি।

শেখর বলেছে, সে যাই হোক, তোমার মনটা খুব উদার। হেমপিসি বলেছেন, উদার কি আর সাধে কেউ হয় শেখর? যাকে দশ দিক দেখে চলতে হয় সংসারে, তাকে উদার হতেই হয়। নইলে কি চলে?

কলকাতার জীবনই শেখরের সবকিছু নয়। তার আরেকটা জীবন পড়ে আছে ঝালুকপোখরের জঙ্গলে। তাই হেমপিসিকে এই বনবাদাড়েও ছুটে আসতে হয়েছে। কোন ফাঁক-ফোকর রাখতে তিনি রাজি নন। সোজাসুজি কথাটা এখনো অবশ্য শেখরের সঙ্গে পেড়ে বসেন নি, কিন্তু মানুষের মন টের পেতে তাঁর দেরি হয় না বলেই তাঁর বিশ্বাস। নইলে তিনি এত দূরে এই জঙ্গলে এসে পৌঁছতেন না। কিন্তু একি কাণ্ডকারখানা? অপব্যয়ের বন্যা যেমন কাঁচবাংলায়, তেমনি ছোটবাংলায়। সুলতা মেয়ে। তাকে একদিন না একদিন যেতেই হবে সব ছেড়ে পরের ঘরে। আইনের বলে যত ভাগাভাগিই হোক না কেন, সুলতাকে সরে যেতেই হবে একদিন। হেমপিসি জানেন। কিন্তু সে-ও অপব্যয়ের কসুর করে না। তোর কি কাজ ঐ ভূতগুলোর অপগণ্ডদের ইস্কুল বসানোর? কি দরকার ঐ খুন্‌খুনে বুড়ো লিয়াকৎ-কে সন্থুয়া থেকে ধরে এনে বাড়িতে বসিয়ে তার ঐ জোড়াতালি দেওয়া খোঁড়া মেশিনে অত জামা শেলাই করবার?

না, শরহুলের সময় ওদের ছেলেমেয়েরা গায়ে দেবে! আরে, যারা তিনশ' চৌষট্টি দিন সম্পূর্ণ ন্যাংটো থাকে তাদের আবার জামা-পিরেণ? আদিখ্যেতা আর বলে কাকে? হাতজোড় কোরে সব মেমসাহেব—মেমসাহেব বলে, সেই অহংকারেই হাত দরাজ। চোখের সামনে সেদিন দিয়ে দিলে একগোছা টাকা। নিতে চাইছে না ভূতগুলো। বলছে রেঞ্জার সাব সব খরচ নিজেই কোরবে, তা এঁর গরজের পরিসীমে নেই। বললে, চাঁদা নয় বাসব। তাতে না হয় তোমাদের সাহেবের মানা আছে। এ তোমাদের সব গাঁয়ের মানুষদের একদিন ভোজভাতের খরচ। তাতে তাঁর মানা নেই নিশ্চয়ই। বলছে লোকটা, তাঁর কিছুতেই মানা নেই। তবে এবার তিনি সব খরচ কোরবেন জানতে পেরে আর সবাই হাতগুটিয়ে নিয়েছেন। আর সবাই ভিন্ন কোরে মজলিস বসাচ্ছেন। তবু বলে লতু, তোমরা তবু তাঁকে একবার বলে নিও কথাটা, নইলে হয়তো মনে কিছু কোরবেন। বরাবর দিয়ে এসেছি। এবার না দিলে আমার মনটাই বা কি বলবে, বল রতন। দুদিন পরে আবার ঐ বুড়ো ডাকাতটা এসে হাজির। সুলতা জিজ্ঞাসা করে, বলেছিলে?

হ্যাঁ।

কি বললেন?

বললেন, ভালকথা। বেশ তো।

বলবেনই তো। টাকা পয়সার ব্যাপারে এমন কোন গবেট মুখ্যু দুনিয়ায় আছে যে বলবে, মন্দ কথা? এই যে এত অপব্যয়, এতো সবই টুলটুলেরই খরচান্ত বলতে গেলে। তাহলে তাঁর দমবন্ধ হবে না কেন? কেন তিনি গরমের দুপুরে ছুটোছুটি করবেন না? মনের কথা কোথাও বোলে খালাস হবার তাঁর যে কোন উপায় নেই। দমবন্ধ তাঁর হবে না তো কি তরুবালার হবে? মিস্তির মশায়ের হবে? সর্বনাশটা হচ্ছে কার?

নষ্ট করার মত আর সময় হেমপিসির হাতে নেই। টুলটুল আর কিঙ্করকে নিয়ে তিনি সেইদিনই বিকেলে কাঁচবাংলায় গিয়ে হাজির হলেন। শেখর অবশ্য বলেই দিয়েছিল, কটা দিন পিসি তোমরা সবাই এখানে এসেই থেকো। খুব খুসি হব।

যাবার আগে হেম সুলতাকে বললেন, এমন সব সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড দেখে আমি কি আর চুপ কোরে থাকতে পারি লতু? চললাম কাঁচ বাংলায়।

পনেরো

ওগো পবন, তুমি যেমন ইচ্ছে ব'য়ে চলো।

কিন্তু যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করো, তবে, আমার একান্ত প্রার্থনা, তুমি ধীরে বও। মৃদুমন্দ। আমার আঁচল উড়িয়ে নিয়ে আমাকে বে-সরম কোর না।

যদি তুমি আমার সে প্রার্থনা না-ও শোন, ওগো পবনদেবতা, তবে তুমি উন্মত্ত ঝড়ের বেগেই বও। আষাঢ়ের দুরন্তবর্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে যাও বসুন্ধরার প্রতিটি কোণে। কিন্তু সে ঝড়ের বেগে শালফুলের মতো আমাকে বিচ্ছিন্ন কোরে নিয়ে যেও না।

যদি আমার এই মিনতিও তোমার কানে না পৌঁছয়, পবনদেবতা, যদি আমাকে শালফুলের মতো উড়িয়ে নিয়েই যাবে, তবে আমাকে কোন গভীর বনমাঝে কোন সু-উচ্চ পর্বত শিখরেই স্থান দিও। আর সেই সুগভীর অরণ্যের

উচ্চ পর্বতশিখরে নবীন আর সুদৃঢ় বৃক্ষের সঙ্গেই আমাকে অনন্তবন্ধনে বেঁধে রেখো, হে পবন দেবতা, তোমার কাছে এই আমার শেষ প্রার্থনা জানাই আমার জীবন-যৌবন দিয়ে।

আজ এই প্রার্থনা তাদের গানে-গানে জানাচ্ছে প্রত্যেকটি বনকন্যা। নবীন সুদৃঢ় আশ্রয় আজকের এই বসন্ত উৎসবে প্রত্যেক যুবতীর যেন একান্ত কামনা। অন্তরের শেষ বাসনা।

সারা বনাঞ্চল থেকে-থেকে কেঁপে উঠছে।

সবল বাহুর কঠিন আঘাতে একাধিক নাগাড়ায় যে শব্দ উঠছে, তাকে প্রকাশ করি এমন ভাষা আমার জানা নেই। বনপাহাড়ে যে কাঁপন লেগেছে তা শুধু সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যায়, তাতে অবগাহন করাও হয়তো যায়। কিন্তু প্রকাশ করা যায় কিনা, আমার জানা নেই। সে নিরন্তর শব্দের প্রবাহ, গাছপালা পাহাড়-পর্বতে যেখানে সামান্যতম বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, সেইখানেই শুধু আরো দ্বিগুণতর হচ্ছে তাই নয়, এক প্রবাহ তখন শতমুখী হয়ে যেন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। তরঙ্গের পর সে তরঙ্গের আর যেন শেষ নেই। অরণ্যের ধ্যানগম্ভীর মৌন মূর্তির তাতে বিন্দুমাত্র প্রশান্তি বিঘ্নিত হয় না। সে নিমগ্নতার মাঝে আরো গভীরতা আরো তন্ময়তার এক অপূর্ব মোহজাল সৃষ্টি কোরে চলে। মনে হয়, শব্দের গতি যেমন দ্রুত, তেমনি সুদূর প্রসারী হয়ে সে অঞ্চলের যত কিছু সব যেন একই মাতনে মাতিয়ে নিয়ে চলেছে কোন স্বপ্নলোকে।

নিঃশ্ছিদ্র অন্ধকার রাতের দ্বিতীয়প্রহরে গভীর অরণ্যের মাঝে নিঃসঙ্গ কোন মানুষ যদি উৎসব আঙ্গিনার পথে চলতে থাকে, সে তখন আর নিজেতে থাকে না। সমস্ত প্রকৃতির শিরায়-উপশিরায় যে মাতন লাগে তারই সঙ্গে মিশে যায় সে নিজেও। ধ্যানগম্ভীর মৌনস্তব্ধ অরণ্যের তখন সে নিজেই এক অবিভাজ্য অংশ। কোন পৃথক অস্তিত্ব থাকে না।

অবশ্য সে যদি অরণ্যের সন্তান হয়।

অপরের কাছে উৎসবমুখর সে রাত্রির রূপ কেমন আমার জানা নেই।

সমস্ত গ্রাম এসে জড়ো হয়েছে উৎসব প্রাঙ্গনে। হেমেন সতীনাথ বিন্দু দিগম্বর সকলে উৎসাহিত করছে ওদের। জীবনকে যারা আকণ্ঠপান করছে নাচে-গানে সমস্ত সত্তা দিয়ে চোখের সামনে, তাদের কাছে আজ শুধুমাত্র দর্শক

সেজে থাকতে এরা পারে নি। রেঞ্জ কোয়ার্টার্সের সামনে সামিয়ানায় তারা শুধুই দর্শক হয়ে বসে থাকতে চায় না।

সুলতা, মোহন আর তরুবালা যখন এসে পৌঁছল, হেমেন আর সতীনাথ তখন গ্রামবাসীদের ভিড়ে মিশে আছে। মোহন মিত্র, তরুবালা আর সুলতাকে আসনে বসিয়ে নিজেও এগিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ তাদের নানাভাবে উৎসাহিত কোরে সবাই ফিরে এসে বসলেন।

ভাদরীর নাচ আর গান সকলের প্রশংসা আদায় কোরে নিচ্ছে। এতো দেহ নয়, এ এক উচ্ছল তরঙ্গ! সঙ্গীতময়। হেমেন অবাক বিস্ময়ে কখনো মুখর, কখনো স্তব্ধ। সৃষ্টিকর্তার অপরূপ ছন্দময় সৃষ্টি এই দেহ, যার প্রতি ভঙ্গিমায় নিবেদনের অভিব্যক্তি।

মোহন ডেকে বললেন, কি ভাই। নাচবে নাকি?

হেমেন বলে, জানলে এত দেরি হোত না।

ঠিক বলেছ।

ওদিকে নতুন কোরে নাচের পালা আরম্ভ হয়। সামনে উৎসবাগ্নির কুণ্ডগুলো দাউ-দাউ কোরে জ্বলছে। নাচগানের সঙ্গে গগনভেদী বিশপঁচিশখানা নাগাড়া বেজে চলেছে।

এতক্ষণে হেমেনের নজব পড়ল সুলতার দিকে। অবাক হয়ে চেয়ে দেখল।

সতীনাথ তাব কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, নাও হেমেন সিগারেট ধরাও।

অপ্রস্তুত হয়ে হেমেন বলে, আর তুমি?

সতীনাথ বলে, আমার রাবণের চিতা তো সর্বক্ষণই প্রজ্জলিত ভাই। পাইপে টান দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ে সে।

হেমেন সিগারেট ধরায়।

সতীনাথ উঠে গিয়ে সুলতার সামনে বলে, সত্যিই খুব আনন্দিত হয়েছি। আপনারা সবাই এসেছেন।

মোহন বলে, একি তোমার মেয়ের বিয়ে যে গলবস্ত্র হয়ে আপ্যায়ন শুরু কোরেছ? গিয়ে বোস।

সুলতা বলে, প্রতিবারই আমি আসি। এবার আপনার ব্যবস্থাপনায় সত্যিই সব কিছু সর্বাঙ্গ সুন্দর। বেশ ভাল লাগছে।

সতীনাথ বলে, আমার বন্ধু হেমেনও তাই বলছে। ও। হ্যাঁ এঁদের

সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি। এই হেমেন, বিন্দু, দিগম্বর তোমরা এগিয়ে এস। …এই, এই আমার বৌদি। এই দাদা।

বলতেই বিন্দুলাল দিগম্বর সবাই হেসে উঠল। বিন্দু বলে, দাদাকে আর চেনাবে কি রায় দা?

তা বটে। আর, আর ইনি ·

মোহন বলে ওঠে, আমার মেয়ে সুলতা।

বিন্দু দিগম্বর সবাই জানে, কাঁচবাংলার সুলতা শেখর চাঁদের দিদি। তবুও সবাই নমস্কার জানালো সুলতাকে নতুন কোবে। সুলতাও প্রতিনমস্কার জানালো।

হেমেন নমস্কার জানালেও সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো কয়েকবার। কই, কয়েকদিন সে গেছে মোহনেব বাড়ী। বৌদির হাতে চা জলখাবার সবই খেয়েছে। শুনেছে তাঁদের ছেলেমেয়ে মুঙ্গেরে মামাদের কাছে থেকে পড়ে। মাঝে মাঝে আসে। হবে হয়তো। মেয়ে এসেছে এবার।

সবাই নিজের আসন দখল কোরে বসল।

ওদিকে সমানে চলেছে নৃত্যগীত। সারারাত ধরেই চলবে।

কাঁচবাংলার আসরও জমজমাট।

মারুকগঞ্জের বিখ্যাত মেহেরাবাঈকে তিনরাতের জন্যে আনাবার সাহস এ অঞ্চলে একা শেখরই দেখাতে পারে। বড় বড় রাজা নামধারী পুরুষসিংহদেরই সে ক্ষমতা আর সাহস দেখা গেছে। অরণ্য অঞ্চল। মেহেরাবাঈয়ের চার্জ দ্বিগুণ।

শেখর বলেছে, বহুৎআচ্ছা। তবু তাকেই চাই। বেনীপুরের হরনাম সিং যাকে নিয়ে যেতে পারে, ঝলুকপোখরের শেখরচাঁদও পারে। দেখুক সতীনাথ। গাঁয়ের লোকদের ডিয়াং খাইয়ে শরহুল্ নাচান নয়। এ হোল কায়দা-মাফিক বনেদী মহ্‌ফিল। একা মেহেরাবাঈ নয়, গয়ার বিখ্যাত মুনেরীবাঈও আছে। যার গান শুনতে হাজার হাজার লোকের ভিড় হয় বড় বড় শহরে। আর সওকতের সানাই। দরাজ-দিলের লোকেরা জানে সওকতের সানাই বসানো সরু পকেটের কাজ নয়। সরকারী চাকরী কোরে শরহুল চলে, সওকতের সানাই 'বলে' না।

তারপর আছে নওটংকী যাত্রার দল। যেখানে পড়বে নোটের মালার পর মালা।

হেমশিসির শান্তি নেই। মনের মধ্যে কেমন এক বিষময় যন্ত্রণার আগুন চাপা দিয়ে মুখে হাসি টেনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই যে আজ কাঁচবাংলার

উৎসব-আয়োজন তাতে আর দশজনের মধ্যে শেখরচাঁদের আজ বিশিষ্ট এক স্থান। হাঁক-ডাক হৈ-চৈ সর্বাগ্রে শেখরের। যাকে তিনি মনে মনে টুলটুলের ভাবী স্বামী বলে এঁকে রেখেছেন। কেন রেখেছেন, কোন্ আশ্বাসের বলে রেখেছেন, তার কৈফিয়ৎ হেমপিসি দিতে পারেন না। নিজের কাছেও না। তবু তারই জন্যে তাঁর সকল পরিশ্রম, সব প্রস্তুতি তাঁকে আজ এমন এক স্থানে এনে হাজির কোরে ছেড়েছে, যেখান থেকে হাজার অস্বস্তিতে মনে প্রাণে পালাই-পালাই কোরেও তিনি কিছুতেই সরে যেতে পারছেন না। এই কারণেই তিনি সুলতার কাছে থেকেও শান্তি পান না, শেখরের কাছেও না। মোহন মিত্রের কাছে, বা তরুবালার কাছেও না।

ওদিকে যখন সব আয়োজন সমাপ্তপ্রায়, তখন হেমপিসি শেখরকে একান্তে ডেকে নিয়ে এলেন শেখরের বিশ্রামের ঘরে।

কাঁচবাংলার পশ্চিমদিকের সাজানো দিকটায় হেমপিসি টুলটুল আর কিঙ্কর চারখানা ঘর জুড়ে আছেন।

কি বলবে বল পিসি? দেখছনা আমার ফু ফেলবার ফুরসৎ নেই?

তবু হেমপিসিকে নিরুত্তর দেখে শেখর বলে, কেমন ব্যবস্থা হয়েছে বল? তোমরা তো কলকাতার লোক। মনে ধরছে?

এবার হেমপিসি বললেন, সবই তো ঠিক আছে শেখর। কিন্তু এমন কোরলে তোর আখেরে কি হবে বাবা?

কি বলছ তুমি পিসি?

আমার সব দেখে সত্যি ভয় করছে।

হেমপিসির কণ্ঠস্বর কেমন অদ্ভুতভাবে কাঁপল। বললেন, কেন যেন, কেমন যেন অকল্যাণের কথা বারবার মনে আসছে শেখর।

শেখর আলমারি থেকে পানীয় বের কোরে পিসির সামনেই গলা ভেজাতে ভেজাতে বলল তোমাদের কি কোরে বোঝাবো? আমাদের বোহেমিয়ান জীবনে এসব যে একান্ত অপরিহার্য পিসি। তারপর আছে মান-সম্মান। সেটুকু বজায় না রাখতে পারলে এদিকে টিঁকে থাকাই অসম্ভব পিসি। তুমি কিছু ভেবো না।

কলকাতার বাসায় শেখর যখন হেমপিসির সামনে মদের গেলাস মুখে ঠেকাতে সংকোচ বোধ কোরেছে, হেমপিসি তখন বলেছেন, সে আবার কি? পুরুষ

মানুষ কি বামুনের সাবেকি বিধবা যে গঙ্গাজল ছাড়া ছোঁবে না ? একটু আধটু খাবে বৈকি কিন্তু আজ নির্জন অরণ্যের মাঝে নিঃসঙ্গ একটি বাংলোয় এত সমারোহ, এত উৎসব এত আলোর বন্যা যেন থেকে-থেকে তাঁকে প্রেতপুরীর এক অহেতুক দুঃস্বপ্নের মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে।

শেখর বলে, টুলি কই ?

কোমরের চাবির গোছাটা বার বার স্পর্শ কোরে হেম এবার শুকনো হাসি টেনে বলেন, ওর শরীরটা আজ খারাপ তাই শুয়ে পড়েছে।

হেম সত্যকথা বলতে পারলেন না। তিনি নিজেই টুলটুলকে আগে-ভাগে তার খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে ঘরে রেখে বাইরে থেকে তালা বন্ধ কোরে দিয়েছেন। এজাতীয় মহ্‌ফিলে কোনো সংসারের কোনো নারীর বধুর বা গৃহিনীর স্থান হয় না। সেখানে কেবল পুরুষের আনন্দস্রোতে পূর্ণ অবগাহন। সেখানে আজ সকল পুরুষ নিজেদের মুখোস খুলে পরিপূর্ণ আদিম পুরুষরূপে আত্মপ্রকাশ কোরবে। সম্পূর্ণ নগ্নতা না থাকলেও মনটাকে তারা যেমন ইচ্ছে মেলে ধরবে, যা ঘরের কোন নারীর সামনে সম্ভব নয়। হেমপিসির হুকুম তামিলে সবাই প্রস্তুত কিন্তু তাঁকে বাধ্য হয়েই একটু আড়ালে তাই থাকতেই হয়েছে আজ।

রাত যতই গভীর হয়, হেমপিসির অস্থিরতা ততই বাড়তে থাকে। বারবার তিনি ঘর থেকে নিঃশব্দ পায়ে উঠে আসেন। এদিক ওদিক গোপনে ঘোরেন। তারপর আবার গিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দেন।

অনেকক্ষণ টুলটুল জেগেছিল। এখন সে-ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

হেমপিসি আবার ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ে এ বাড়ীর দুই ভৃত্য সদা আর ভিখু, শেখরের বিশ্রাম ঘরে চোরের মত গিয়ে ঢুকল। আস্তে আস্তে হেমপিসিও দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন। ভেতরে সদা ও ভিখু খুব চাপা গলায় কি বলছে ?

হেমপিসি সাহস সঞ্চয় কোরে ঘরে ঢুকলেন। আলোটা বাড়িয়ে দিলেন। অবাক হয়ে দেখেন আলমারী থেকে পানীয় বার কোরে ওরা দুটিতে বেশ সোফায় বসে নিশ্চিন্তে পান কোরছে, বোতলে চুমুক দিয়ে-দিয়ে।

—ছি ছি ছি। তোদের ঐ এঁটো জিনিষ তোদের সাহেব আবার খাবে তো ? তোরা কি রে ? এ্যাঁ ?

সদা আর ভিখু হাতে-নাতে ধরা পড়েই ·উঠে পড়ল। হেমপিসির পা জড়িয়ে ধরে বলল, মাপ কোরে দাও মাজী, এই কান ধরছি। বড্ড লোভ হয়েছিল। তাই বিলিতি জিনিষ···

হেমপিসি বলেন, এমন লোভ তো তোদের তাহলে মাঝে মাঝেই হয়ে থাকে ?

না মাজী···

মিথ্যে কথা। দাঁড়া, কাল সকালে বলছি।

এবার যেন কেঁদে ফেলল সদা, রক্ষে কর মাজী। সাব তাহলে গোলীমেরে কলজে কানা কোরে দেবে।

এতই যদি ভয় তো এমন কাজ করলি কেন ?

খুব গুনাহ হয়ে গেছে মাজী। আর কখনো হবে না। বলতে বলতে ওরা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

হেমপিসি চেয়ে দেখলেন, বোতলটা সোফায় গড়িয়ে পড়েছে, কার্পেটটা ভিজে গেছে তরল পানীয়তে। একটা উগ্র গন্ধ ঘরময় ছড়িয়ে পড়ছে। সেদিকে একদৃষ্টি চেয়ে থেকে হেমপিসি ধীরে ধীরে আলোটা কমিয়ে দিলেন।

বাইরে তখন·সওকতের সানাই বাজছে।

* * * *

ভাদরীর নাচ অভিভূত কোরে দিয়েছে হেমেনকে। সবাইকে। গোটা দলটার মধ্যে সে-ই যেন একটি বিশেষ আকর্ষণ। মাঝে মাঝে নাচ একএকটা শেষ হলে সতীনাথ, হেমেন আর মোহন মিত্র ওদের মাঝে গিয়ে নানাভাবে উৎসাহ দিয়ে আসছেন।

আবার নতুন কোরে নতুন দলের নৃত্যগীত নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করে তুলছে।

সতীনাথ হেমেনকে বলে, ঘুম পাচ্ছে ?

হেমেন উত্তর দেয়, না।

এমন সময় একজন বনরক্ষী ছুটতে ছুটতে এসে সতীনাথের সামনে সালাম কোরে দাঁড়ায়। সতীনাথ মুখ তুলে চাইতে সে বলে, হুজুর, সাব এসেছেন। বড় সাব।

সতীনাথ ভ্রু কুঞ্চিত কোরে বনরক্ষীর দিকে তাকায়। কথাটা হয়তো ঠিক ধরতে পারে না।

বনরক্ষী আবার বলে, ভিকো সাব।

সতীনাথ আশ্চর্য হয়। বলে, সাহেব? এত রাতে?

হ্যাঁ হুজুর। ঘণ্টা তিনেক হোল ওদিকের জঙ্গলের পাশে তাঁর মোটর খারাপ হয়ে তিনি আটকে পড়েছেন। আরদালী এসে রেঞ্জ অপিশে খবর দিল।

হেমেন বলল, তবে ওঠ।

কিছুক্ষণ সতীনাথ নিজের মনে চিন্তা কোরে বলল, না। আমি গাড়ীর মিস্ত্রিও নই, রাতের চাকরও নই।

বনরক্ষীকে আদেশ দিল সতীনাথ, গাড়ী এখন যেখানে আছে পড়ে থাক। কাল সকালে যা হোক ব্যবস্থা হবে।

বনরক্ষী কিন্তুভাবে খানিক চুপ কোরে থেকে বলল, হুজুর, ডিফো সাব গাড়ী ছেড়ে আসতে চাইছেন না।

সতীনাথ আর বনরক্ষীর কথাগুলো সবার দৃষ্টিই আকর্ষণ কোরেছে। সুলতা তরুবালা, মোহন, সবাই শুনছে মন দিয়ে। সতীনাথ চলে যায় এখন, সেটা কেউ হয়তো পছন্দ কোরবে না। তাদের সবারই মুখচোখে হঠাৎ বিরক্তির চাপা ভাব ফুটে উঠেছে।

শান্তকণ্ঠে সতীনাথ বলে, তাহলে তিনি যাতে আজকের রাতটুকু গাড়ীতেই ভালভাবে কাটাতে পারেন, তার ব্যবস্থা কোরে দাও গে।

বনরক্ষী তবুও দাঁড়িয়ে রইল। আরো হয়তো কিছু বোলতে চায় সে। তাকে আর সুযোগ না দিয়ে বেশ কঠিন কণ্ঠে হেঁকে উঠল সতীনাথ, যাও।

জী হুজুর।

বনরক্ষী সালাম জানিয়ে অপিসের দিকে পা বাড়াল।

কিছুক্ষণ পর অপর একজন এসে জানালেন, হুজুর, ডিফো সাব সালাম দিয়া।

প্াইপটা সজোরে জুতোয় ঠুকে পোড়া তামাক ঝাড়ার ফাঁকে সতীনাথ আরো কঠিন স্বরে বলে, খবর দাও। কাল সকালে দেখা হবে।

এ অঞ্চলের বনরক্ষীর দল এতদিনে সতীনাথের মেজাজ জেনে নিয়েছে। বনরক্ষী আর দাঁড়াতে সাহস পেল না। কিন্তু ঐ জবাব গিয়ে বড় সাহেবের সামনে দেবে, তেমন মাথা তার ঘাড়ে নেই।

অবস্থাটা বুঝতে কারো বাকী রইল না।

সতীনাথ অনেকক্ষণ চুপ কোরে বসেই রইল। তাকে দেখলে বেশ বোঝা

যায়, যত উৎসাহ নিয়ে সে আজ যেতে উঠেছিল তার সবটুকুই যেন নিভে গেছে। ভেতরে অদম্য ক্রোধ যেন ফুঁসে উঠতে চাইছে। অপমানটা সবার চোখেই ধরা পড়েছে।

সুলতা উঠে দাঁড়াল।

মোহন বলে, যাবে নাকি ?

হ্যাঁ, শরীরটা তত ভাল নেই। যাবেন আপনারা ?

মোহন বুঝলেন, তাল কেটে গেছে সবার। সতীনাথ আর তার ওপরওয়ালাদের মধ্যে যে একটা বিরোধের সম্বন্ধ আগে থেকেই চলে আসছে সেটা সকলের সামনে পরিষ্কার হয়ে যেতেই সতীনাথ কিছুটা অন্যমনা হয়ে পড়েছে। একটু লজ্জিতও বা বোধ করছে। তেমন পরিবেশে সুলতা বসে থাকতে চায় না। সতীনাথের অবস্থাকে আরো অসহনীয় করে তুলতে তার মন চাইল না।

তরুবালাও ঠিক এইটেই চাইছিলেন।

উঠে বললেন, ঘণ্টাখানেক আর রাত আছে। চল, এবার ওঠা যাক।

সমস্ত অবস্থাটা বুঝতে মোহন মিত্রের অসুবিধে হোল না। সুলতারও নয়। উভয়েই দয়াল সাহেবের কর্মচারী নির্যাতনের সুনামের সঙ্গে অনেক দিন থেকেই বেশ পরিচিতই ছিলেন। সতীনাথের সঙ্গেও যে দয়ালের সংঘর্ষ বাধছে এটা যখন সুলতা বুঝতে পারল, তখন সে অবস্থায় নিজেকে আর উপস্থিত রাখতে তার মন কিছুতেই প্রস্তুত হতে চাইল না।

সতীনাথ তাঁদের যেতে দেখে বলল, একি ? আপনারা চললেন ?

সতীনাথ উঠে এল তাঁদের সামনে। মুখখানা তার লাল হয়ে আছে। সুলতা চেয়ে দেখল। মোহন বললেন, হ্যাঁ ভাই। আবার তো কাল আছে। বয়েস হয়েছে। রাত জাগা ঠিক পোষায় না।

সতীনাথ শুষ্কমুখে বলে, ও, হ্যাঁ, তাও বটে। কিন্তু, এঁরাও চলে যাবেন ? কি বৌদি ?

হ্যাঁ ভাই, আজ যাই। আবার কাল আছে তো। কাল একটু সকাল সকাল তোমরা আরম্ভ কোর।

মোহন বলেন, সকাল থেকেই আরম্ভ করুক আর বিকেল থেকেই করুক, যাদের উৎসব, তারা নেচে পাট না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত থামবে না। সে তো আর আমাদের ওপর নির্ভর করবে না। এতো আর বায়না-করা নওটংকী নয়

যে বলে দিলাম, খামোশ, আর ব্যস্, ঢোলোক থেমে গেল। নাকের নোলোক খুলে ফেলে যশোদা হয়ে গেল রামজী সিং। ব'লে, নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগলেন। সতীনাথ সে হাসিতে আজ যোগ দিতে পারল না। শুকনো মুখে নিভে যাওয়া পাইপটা দাঁতে চেপে ধরেই অসংলগ্নভাবে বললে, হ্যাঁ। তা তো বটেই।

পরদিন খুব সকালেই সতীনাথ তৈরী হয়ে রেস্ট হাউসে গিয়ে পৌঁছল।

সাহেব তখন সবেমাত্র 'পালং-চায়্' সমাপ্ত কোরে স্লিপিং গাউনটা গায়ে জড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন।

তাঁকে সুপ্রভাত জ্ঞাপন কোরে সতীনাথ আরো কাছে সরে এল। কিন্তু দয়াল সাহেব সতীনাথকে দেখতে পেয়েই বিরক্তিভরে মুখ বাঁকিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেলেন কোন কথা না ব'লেই।

আবার দ্রুত বেরিয়ে এসে বেশ রাগতভাবে বললেন, কালরাত্রে তোমার সহায়তা আমার দরকার ছিল। কিন্তু পাইনি।

সহজভাবেই উত্তর দিল সতীনাথ, অতরাত্রে আমার আসা সম্ভব ছিল না।

বটে?

বেশ কড়াভাবেই দয়াল প্রসাদ বলেন, শোন রেঞ্জার, তুমি বলতে-গেলে এখনও নতুন। ডিপার্টমেন্টের আদবকায়দাটা একটু শিখো।

আমাকে মাফ্ কোরবেন। অতরাত্রে অধীনস্থ কর্ম্মচারীকে ডেকে পাঠানোটাও কি বিভাগীয় আদব-কায়দার মধ্যে পড়ে? আর, তাছাড়া, কাজটাও বিভাগীয় কর্তব্য ছিল না বোধহয়। ছিল আপনার একান্তই ব্যক্তিগত। তাই নয় কি?

সতীনাথের এই উক্তি যত বিনীতস্বরেই উচ্চারিত হয়ে থাক, তার অন্তর্নিহিত কঠিনতা দয়ালের বুঝে নিতে দেরি হোল না।

তিনি বেশ উচ্চগ্রামে গলা তুলে বললেন, রাতে তো নাচ দেখছিলে।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

And, that also with a woman.

সতীনাথ বেশ শক্ত হয়ে এবার সোজা দয়াল প্রসাদের মুখের দিকে তাকাল। দাঁতে দাঁত দিয়ে সে যেন নিজেকে সংযত কোরবার চেষ্টা কোরছে।

তার মুখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই দয়াল প্রসাদ ঘরের ভেতর ধীরে ধীরে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

তাঁকে অনুসরণ কোরে সতীনাথও ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। অফিস-টেবিলের ওপর একটা কালো রুল ছিল। সেটা হাত দিয়ে নাড়াচাড়া কোরতে কোরতে দৃঢ়কণ্ঠে বলে সতীনাথ, আপনাকে আমি শ্রদ্ধা কোরতাম। আশা করি ভবিষ্যতে তার অন্যায় সুযোগ আর কোনদিন নেবেন না।

চমকে উঠলেন দয়াল প্রসাদ।

আজ প্রায় তেইশ বছর বনবিভাগে ডি-এফ-ও-গিরি করছেন। মিষ্টকথার মোড়কে এমন কড়া জবাব শুনতে তাঁর কান অভ্যস্ত নয়। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, কি বললে ?

সতীনাথ বলে, যা বললাম, তার অর্থ বুঝতে আপনার মোটেই বেগ পেতে হয় নি। আমি জানি। কারো ব্যক্তিগত জীবনের ওপর আধিপত্য বিস্তারের অন্যায় লোভ এবার থেকে আপনাকে সম্বরণ কোরেই চলতে হবে।

সতীনাথ যেমন সোজা হয়ে এসেছিল, তেমনি মাথা উঁচু কোরেই ফিরে যাচ্ছিল।

দয়াল প্রসাদ চেঁচিয়ে উঠলেন, ফিরে যাচ্ছ ?

এ প্রশ্ন কোন উত্তরের অপেক্ষা রাখে কি ?

তোমার এই দুর্বিনীত ব্যবহারেব ফল কি জান ?

এবার সতীনাথ ফিরে দাঁড়াল।

হেসে বলল, এমন ওপরওয়ালার ব্যক্তিগত পরিচর্যা করবার জন্যে আমি সরকারী মাইনে নিশ্চয়ই পাই না। আমার কাজের অন্য কোন ত্রুটি থাকে তো বলুন।

দয়াল প্রসাদ হেঁকে উঠলেন, কৈ হ্যায় ?

সতীনাথ চুপ কোরে দাঁড়িয়ে রইল।

কোন বনরক্ষীই এগিয়ে আসতে সাহস করে না। এমন কি দয়াল প্রসাদের খাস আরদালিটিও অবস্থা বুঝে লোটাহস্তে চুপিচুপি গা-আড়াল দিয়ে বোধহয় 'ময়দানের' দিকেই অগ্রসর হোল।

স্বর কিছুটা নরম হোল দয়াল প্রসাদের।

বললেন, আমি তোমার নামে বহুদিন থেকে অনেক রিপোর্ট পাচ্ছি। তাই

সারপ্রাইজ ভিজিটে এসেছিলাম। দেখলাম, সেসব রিপোর্টের চেয়ে সত্য আরো সাংঘাতিক।

একটু থেমে আবার বললেন, আমি তোমার সঙ্গে কোন আলোচনা আর কোরতে চাই না। তুমি নিজের কাজে যেতে পার।

ধন্যবাদ।

সতীনাথ মাথায় টুপি দিয়ে বুটের কড়া আওয়াজ তুলে নেমে গেল।

সোজা নিজের কোয়াটার্সে ফিরে এল।

হেমেন এখনো ফেরেনি। প্রতিদিনের মত আজও সে সূর্যোদয়ের আগেই বেরিয়ে গেছে। ফিরবে একেবারে দুপুরে। কাল সন্ধ্যায় শরহুলের নাচে উপস্থিত ছিল হেমেন। নইলে বিকেলে বেরিয়ে রাত দুপুরেই ফিরত। যে ক'দিন এসেছে হেমেন, বনে জঙ্গলে এমনি কোরে ঘুরেই বেড়ায় কেবল। সঙ্গে কাউকে নিতে বললে বলে, তাহলে বেড়ানোটাই হবে। দেখা হবে না কিছু। নিজে আর নিজের মনছাড়া আর কেউ থাকলে আমি যা দেখতে চাই তা দেখা হবে না। সতীনাথ বোঝে। বাধা দেয় না। কিন্তু আজ যেন সতীনাথের একজন দোসর চাই। সে তার সঙ্গে থাকবে। কথা বলবে। নইলে বড়ই একা মনে হচ্ছে। শামুদের দল চারপাশে নানা কাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তবু তার বড় একা মনে হচ্ছে। দয়াল সাহেব যে অকারণ অপমান কাল রাতে তার ওপর গছিয়ে দিয়েছিল, তার কিছুটা জবাব সে দিয়ে আসতে পেরেছে বোলে একটু শান্তি হয়তো পেয়েছে সতীনাথ। কিন্তু সবার সমক্ষে যেমন দয়ালপ্রসাদ তাকে ছোট করার চেষ্টা করেছিল, সতীনাথের আজকের জবাব যদি তাদের সামনে সে দিতে পারত তবেই তার মনটা আরো একটু হাল্কা হোত বোধ হয়। মনে পড়ে, মোহন মিত্র বারবার তাকে বলেছেন, ওপরওয়ালার সঙ্গে পাঞ্জা কষ্‌তে যেও না সতীনাথ। ওতে কোন ফল নেই। কিন্তু কেন্নো যদি গায়ে ওঠে তাকে সরিয়ে-নামিয়ে দিতেই হয়। অন্য কোন উপায় আর থাকে না।

সতীনাথ জানে, সুলতা অনেক পরোক্ষ-নিষেধের বাধা ঠেলে কাল শরহুলের উৎসবে এসেছিল। শুধুমাত্র এ অঞ্চলের মানুষদের সে ভালবাসে বলেই। সোজাসুজি দয়ালপ্রসাদ সুলতাকেই অপমানিত করল অমন কথাটা বোলে। সহ্য করতে পারেনি সতীনাথ। প্রতিবাদ তাকে করতেই হয়েছে। কঠোর ভাবেই, তীক্ষ্ণভাবেই কোরতে হয়েছে। এছাড়া প্রতিবাদের আর কোন ভিন্ন

উপায় ছিল বোলে সতীনাথ সেই মুহূর্তে সেখানে দাঁড়িয়ে ভাবতেই পারে নি। দয়ালের ঐ হীন উক্তি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সতীনাথের চোখের সামনে ভেসে উঠল সুলতার বিষাদে মাখা করুণ মুখখানা। সতীনাথ যেন প্রথমবার উপলব্ধি কোরল, যে নারী সব কিছুর অধিকারিণী হয়েও, সব দখলের লাগাম স্বেচ্ছায় ত্যাগ কোরে এক কোণে শুধু নিজেকে সম্বল কোরে পড়ে আছে, অযথা তার অপমান ঘটতে দিয়ে নিজের অপরাধ সতীনাথের আর বাড়ানো ক্ষমার অযোগ্য হবে। বিশেষ কোরে, যার ওপর অহেতুক কটাক্ষ হেনে এমন নীচ উক্তি উচ্চারিত হচ্ছে, প্রতিবাদ করার জন্যে, সে অন্যায় হীনতার উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্যে যখন সে নারী নিজে সেখানে উপস্থিত নেই, এবং যখন সতীনাথের নামের সঙ্গেই তার নামটাও জড়িয়ে দেবার জঘন্য প্রবৃত্তির প্রকাশ পাচ্ছে, তখন তাকেই এগিয়ে এসে সে মুখ যে-কোন আঘাতে বন্ধ কোরে দিতেই হবে। নইলে পদমর্যাদা হয়তো তার সুরক্ষিত থাকে। কিন্তু আর কোন মূল্যই থাকে না। নিজের কাছেই থাকে না।

সুলতা জানতেও পেলনা সে কথা। না জানুক। সতীনাথ চাকরিকে নির্বিঘ্ন কোরতে মনুষ্যত্বকে বিপন্ন করতে পারবে না। কিছুতেই না। সত্যকে রক্ষা কোরতে ভীষ্মকে তাঁর গুরুদেবের বিরুদ্ধেই অস্ত্রধারণ করতে হয়েছিল। পরাস্ত কোরতে হয়েছিল। এ-তো কোন ছার্ এক নিকৃষ্ট জীব। চাকরির সুবাদে এক ধাপ উঁচুতে আসন পেতেছে মাত্র। কিন্তু হেমেনকে সামনে পেলে সতীনাথ যেন একটু তৃপ্তি পেত এখন। কিছুটা শান্তি পেত। হাল্কা হতে পারত।

হেলান দেয়া চেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে একমনে পাইপ টানছে সতীনাথ। দেখলে মনে হবে, বিশ্রাম কোরছে বুঝি লোকটা। কিন্তু ভেতরে তার ঝড় বইছে। মনে হচ্ছে, তবু উপযুক্ত জবাব দেওয়া হোল না। উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোল না।

সাধের গোলাপ বাগানের দিকে চেয়ে-চেয়ে একমনে পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে চলে সতীনাথ। দয়ালপ্রসাদের কাল্পনিক ছায়াকে বারবার চাবুক কষাতে থাকে মনে-মনে। রক্তাক্ত সেই ছায়া সুলতার কাছে যেন নতজানু হয়ে ক্ষমাপ্রার্থী। মুখ ফিরিয়ে নেয় সতীনাথ।

হেমেন বলে, তুমি অহেতুক লোকটাকে গুরুত্ব দিচ্ছ। মিথ্যে কষ্ট পাচ্ছ।

বল কি! এমন কুৎসিত উক্তিতে আর কিছু তাকে ভাবতে পারছি না। জঘন্য। নিকৃষ্ট।

তুমি আমার কথাটা বুঝলে না সতীনাথ। আমি এই ধরণের জীব চিনি। ওরা নিজেকে ছাড়া আর কাউকে মানুষ বোলেই গণ্য করে না। তাই পদে পদে ওদের পশুত্ব ধরা পড়ে। ওরা নিজেকে ছাড়া আর কাউকে সম্মানের উপযুক্ত বোলে মনেই করে না। তাই ওরা পদে পদে হয় অপমানিত। তবে, কেউ সেটা সামনেই প্রমাণ কোরে দেয় প্রতিবাদ জানিয়ে, কেউ চুপ কোরে থাকে।

কি বলছ হেমেন? তুমি সাহিত্যিক। তোমাদের সেক্সপীয়ার সাহেবই তো বলেছেন, Tell the truth and shame the devil.

হেমেন হেসে উঠল। বলল, তুমি এই ধরণের জীবদের devil এর স্থানটুকুই বা দিচ্ছ কেন বন্ধু? এই শ্রেণীর জীবরা কোন এক নির্দিষ্টস্থানেই বাসা বাঁধে না। জগতের কতো জায়গায় এরা ছড়িয়ে থাকে। কেউ চাকরি জগতে, কেউ হেঁসেলে। আবার কেউ বা দেব-মন্দিরে। তুমি চুপ কোরে থাকলেই পারতে।

সতীনাথ বলে, সব ক্ষমতা তো সকলের সমান থাকে না বন্ধু। এমন কি, মহাতাপ মহা শক্তিধর, সকল শক্তির জন্মদাতা সূর্যেরও না। সকলেই সব কিছু পারে না হেমেন।

কি রকম?

—সূর্যের আলো দেবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু নিজের সেই আলো গোপন করার শক্তিতো তার হাতে নেই।

হেমেন সতীনাথের মুখের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে সপ্রশংস হাসি হাসতে থাকে।

পাইপটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সতীনাথ উঠে দাঁড়ায়। বলে, চল, এবার বিগত-মধ্যাহ্ন ভোজনটা সেরে ফেলা যাক। আবার তো আজ রাত জাগতে হবে।

ষোল

আমি তোমায় কোনদিন ভুল বুঝিনি শেখর। ভুল বুঝবার সম্বন্ধ তোমার সঙ্গে নয় আমার। আমি বিশ্বাস করি, একদিন তুমি বুঝবে, তুমি নিজের ওপর কত অবিচার কোরে চলেছো। না বুঝে নিজেকে তুমি কেবল শাস্তি দিয়ে চলেছো।

শেখর বলে, তুমি আর বোলো না। আমায় তুমি ক্ষমা কর।

সুলতা বলে, ক্ষমা? কেন? তুমি তো কোন অপরাধ করনি।

অপরাধ করিনি?

না। নিজের ওপর অবিচার করে চলেছ।

তুমি আর বোলো না। আমি সহ্য করতে পারছি না। তুমি ফিরে চল কাঁচবাংলায়। আমি কলকাতায় গিয়ে থাকব।

মৃদু হেসে শেখরকে সান্ত্বনা দিয়ে সুলতা বলে, তুমি কলকাতায় গিয়ে থাকবে?

আমার আর কিছু ভাল লাগছে না।

কেন? ব্যবসা? কাঁচবাংলা? সুন্দরম?

না। কিছু না। তুমি তো জানো, আমার কোনদিন কিছু ভালো লাগেনি। তোমার বিরুদ্ধে আমি কোনদিন কোন প্রশ্ন তুলিনি। আমার ভাল লাগত শুধু বন্দুক। ভাল লাগত শিকার।

কিন্তু তারপর কি হোল? সুলতা সস্নেহে প্রশ্ন করে।

অনেকক্ষণ শেখর কোন উত্তর দিতে পারল না। দুই হাতে মুখ ঢেকে চুপ কোরে বসে রইল।

সুলতা বলল, কি হোল?

শেখর তবু নিরুত্তর।

সুলতা আবার বলে, চল, আমরা কোথাও ঘুরে আসি। যাবে শেখর?

সুলতা নিজের মনকে শান্ত করবার জন্যেই শেখরকে সান্ত্বনা দিয়ে চলেছে। আজ তার বুকে অসহ অব্যক্ত এক বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে বারবার তাকে

বেসামাল কোরে দিতে চায়। ঐ শেখরচাঁদের জন্তেই সে নিজে কাঁচবাংলার হাল শক্ত হাতে ধরতে চেষ্টা করে এসেছে বছরের পর বছর। দেখেছে, তাকে শেখর ভালবাসে। ভক্তিশ্রদ্ধা করে। বৈষয়িক বিষয়ে শেখরচাঁদ সুলতা ছাড়া আর কিছু জানতো না। সতীনাথ এ অঞ্চলে এসে হয়তো সরকারী নিয়ম-কানুনগুলো একটু কঠোর ভাবেই প্রয়োগ করতে গিয়ে যাদের স্বার্থের সঙ্গে সংঘাত বাধিয়েছিল, তারা কাঁচবাংলার কেউ নয়। কাঁচবাংলার স্বার্থ তাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হোত না। যাদের হোত, তারা নিশ্চুপ বসে থাকতে পারে না। থাকেও নি। সুলতার বুঝতে কোন অসুবিধে হয়নি। সে দেখেছে, এই সংঘর্ষে শুধু কাঁচবাংলাই যে ভেঙে পড়বে, তাই নয়, তার সঙ্গে এমন অনেক কিছু ধূলিসাৎ হয়ে যাবে, যার মূল্য সে দিতে শিখেছে বাল্যকাল থেকে, অবিনাশের শিক্ষায়। একদিকে ব্যবসার স্বার্থ, অন্যদিকে স্থানীয় মানুষদের ন্যায্য অধিকার, সসম্মান অস্তিত্ব, আর অন্যদিকে স্বার্থান্ধ সুন্দরমের দলের সতীনাথের সঙ্গে সংঘর্ষ, এই সব কিছুর সমন্বয় কোরে কাঁচবাংলার মর্যাদা রক্ষা কোরে চলা সুলতার মত মেয়ের পক্ষেও আর সম্ভব রইল না। কেননা শেখরচাঁদ কাঁচবাংলার স্বার্থকে মর্যাদাকে সুন্দরমের স্বার্থের সঙ্গে একাকার কোরে ফেলে সমস্যাকে সুলতার পক্ষে আরো জটিল, আরো তীক্ষ্ণ কোরেই তুলেছিল। সুলতা বুঝেছিল, সে সময় শেখরকে বুঝিয়ে ঠিক পথে সরিয়ে আনা সম্ভব তো নয়ই, সতীনাথের ন্যায্য কাজগুলোকে সমর্থন করতে গেলে শেখরের সঙ্গে তার চিরবিচ্ছেদ আর শত্রুতার সম্পর্ক গড়ে দিতে সুন্দরমের দলের সুবর্ণ সুযোগই সৃষ্টি কোরে দেওয়া হবে মাত্র। তাই সে সব কিছু থেকে দূরে থাকাই শ্রেয় বোলে স্বীকার কোরে নিয়েছে। সতীনাথের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনেই সুলতা মোহনমিত্রের বাড়িতে বলেছিল, আপনার কোন ভুল ছিল না। অপরাধ আমাদের।

অবিনাশ যেমন, সুলতাও তেমনি। অন্যায়লাভের লোভে জীবনের মূল্য বোধকে, আত্মসম্মানকে বিসর্জন দিতে শেখেনি। সুলতার কার্যকালের শুরুতে সুন্দরম ঠিক তেমনিই সতর্ক-সংযত থাকতে চেষ্টা কোরেছে, যেমন ছিল অবিনাশের শেষবয়সে। রাশভারি অবিনাশ সবই বুঝতো। কিন্তু রাশ ঢিলে না থাকায় সুন্দরম গণ্ডীর বাইরে খুব একটা বেশি দূর যেতে পারে নি। অন্য দিকে সতীনাথের মত কোন অতিউৎসাহী যুবক অফিসার না থাকায় সুন্দরমের মিহি সুরটা তেমন সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে নি। দানধ্যান অবিনাশ করে গেছে

সে অঞ্চলে অকাতরে। কোন প্রতিদানের আশায়, বা কার্যসিদ্ধির মতলবে নয়। সুলতার আমলেও সে দাক্ষিণ্য ছিল তেমনি অবারিত। কিন্তু সুন্দরম তার স্রোতকে মাঝপথে ঘুরিয়ে দেওয়ার চাতুর্যে সুলতার সময়েই যেন একটু বেশি দক্ষতার পরিচয় দিয়ে চলেছিল। হয়তো চল্‌তো তেমনি ভাবে সব কিছু। কিন্তু সতীনাথ এসে বলে বসল, কাঁচবাংলার গত চল্লিশ বছরের কথা ভুলে যান মিঃ সুন্দরম। আজ থেকে নতুন বছর গুণুন। এ কথায় সুলতার, বা কাঁচবাংলার কিছু এসে-যেতো না। কিন্তু যাদের এসে-যেত, তাদের স্বার্থ এক ছিল না। বাধা পেয়ে তারা অধিকতর সক্রিয় হয়ে উঠতে বাধ্য। তাই হোল। সে পথে সুলতা এক বিষম অন্তরায়। সতীনাথের কাজকে সে ন্যায়, ন্যায্য বলে মনে করছে, সুন্দরমের বুঝে নিতে দেরি হয়নি। সুলতা ধমক দিয়েই বলেছিল, স্ত্রীলোকের মত আমার সামনে চোখের জল ফেলতে লজ্জা করে না?—সেইদিন থেকে সুন্দরম কঠোর হয়ে সরে দাঁড়িয়েছে। ধীরে ধীরে নানা কৌশলে শেখরকেও সরিয়ে নিয়েছে, তখন সুলতা একা। নিঃসঙ্গ। অবশেষে সে ছোটবাংলাকেই তার নিজের শান্তির আশ্রয় বোলে মেনে নিয়ে, সব কিছু স্বেচ্ছায় ত্যাগ কোরে এই একাকীত্ব আর নিঃসঙ্গতাকেই একান্ত আপন কোরে নিয়েছে।

কিন্তু সেখানেও তার নিস্তার নেই।

যে শরহুল্‌ উৎসবে শিশুকাল থেকে সুলতা বাবার পাশটিতে বসে উৎসব দেখেছে, আজ সেই উৎসব ঘিরেই এক বিষময় অবস্থাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সুনিপুণ কৌশলে। শেখরচাঁদ গভীরভাবে সেই ফাঁদে জড়িয়ে গেছে। তারই কিনারা খুঁজতে আজ সে ছোট বাংলায় এসে হাজির। কিন্তু আসল কথাটি এখনও প্রকাশ কোরতে পারছে না।

শেখর বেশ বুঝতে পারছে, আজ যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা মোটেই শোভন বা সহনীয় নয়। তবে এ-ছাড়া আর কোন পথ ছিল বোলে সে ভাবতেই পারে না। অন্য কোন পথের কথাও সে ভাবতে শেখেনি। অনুযোগের সুরেই বলল শেখর, তুমি আমাকে তোমার মনের মত কোরে কেন গড়ে তুলতে পারনি?

সুলতা কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল শেখরের দিকে। মনে মনে বলল, চেষ্টার তো কোন ত্রুটি রাখিনি। কিন্তু সব ক্ষমতা তো সকলের সমান থাকে না।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে সুলতা হেসে বলে, মানুষ নিজেকেই নিজের মনমতো

কোরে কোনদিন গড়ে তুলতে পারে না, অপরের বেলায় তো সেটা আরো অচল আরো অসম্ভব তাই।

কিন্তু কাঁচবাংলায় •ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে আর সম্ভব নয় শেখর। তুমি দুঃখ কোর না।

শেখর বলে, তবে একটা কথা দাও।

বল।

তুমি আর ঐ শরদ্বলে যাবে না, কথা দাও।

তাতেই তুমি খুশি হবে ?

শেখর চুপ কোরে রইল।

কিছুক্ষণ পর সুলতা ধীরে ধীরে বলল, বেশ, তাই হবে। কিন্তু তোমাকেও একটা কথা রাখতে হবে।

উৎসাহিত হয়ে শেখর বলে, নিশ্চয় রাখব। বল।

সুলতা চুপ কোরে থাকে।

মনের যন্ত্রণা ভাষায় প্রকাশ কোরতে কোনদিন শেখেনি সুলতা। যে কাঁচবাংলার আভিজাত্য সুলতা পিতামাতার পুণ্যস্মৃতির সঙ্গেই অতি সযতনে রক্ষা কোরে চলার ব্রত নিয়েছিল, সেখানে আজ শেখর নায়ক সেজে বসেছে নরক-উৎসবের ; এ ঘটনা কাঁচবাংলায় কোনদিন সম্ভব হবে, কল্পনাও কোরতে পারেনি সুলতা। সুন্দরমের হাতে আজ যেন সেই চাবুকটা শেখরই তুলে দিয়েছে যে চাবুক একদিন হাতে করে সুলতা তাকে শাসিয়ে বলেছিল, I know you are my paid servant.

অস্থির হয়ে ওঠে সুলতা, বলে শেখর, তুমি কি সব ভুলে গেলে ? কাঁচবাংলায় আজ যা হচ্ছে, তা কি সেখানে শোভা পায় ?

শেখর মাথা নিচু কোরে কিছুক্ষণ থেকে বলে, আর তোমায় কিছু বোলতে হবে না। আজকের রাতটা। কোন উপায় আর নেই। কাল থেকে সমস্ত কিছু আগের মতই চলবে। আমি কথা দিচ্ছি। তোমার অমতে সেখানে আব কিছু কোনদিনও ঘটতে আমি দেব না।

সুলতা জানে, হঠাৎ শপথ নেওয়ার স্বভাব শেখরের। তার মনে কোনকিছু রেখাপাত করতেও যেমন দেরি হয় না, তেমনি জলের বুকে সে রেখা মুছে যেতেও দেরি হয় না। এমনই তরল চিত্ত মানুষ সে। ন্যায় অন্যায়ের কারাক

তার কাছে ক্ষণস্থায়ী। সব কিছু একাকার হয়ে যেতে একটা সামান্ত, তুচ্ছ ঘটনাই যথেষ্ট। সুলতা জানে, কাঁচবাংলার পথেই হয়তো শেখর নিজের শপথ ভুলে বসবে। নয়তো, যে স্রোতের টানে সে চিরদিন বিনাবাধায় গা-এলিয়ে দেওয়ায় অভ্যস্ত, বিনা দ্বিধায় তার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসবে। আবার হয়তো হঠাৎ দৃঢ় হয়ে প্রতিবাদের ভঙ্গীতে সব কিছুকে আঘাত করতে উত্তত হবে। পরক্ষণেই কৃতকর্মের জন্মে মনস্তাপের তার অবধি থাকবে না। শিশুকাল থেকে সেই একই রকম রয়ে গেল শেখর। সুলতা জানে। তাই তার এ হেন শপথের পরিণতি যাচিয়ে দেখার স্পৃহা তার ছিল না।

সুলতা বলে, আমরা তো কারো জমিদারীতে বাস করি না।

—আমিও তো সেই কথাই বলি। শেখর বেশ উৎসাহ বোধ করে।

—তবে তোমার এমন ভিত্তিহীন ধারণার বশে নিজেদের মানসম্মান খোয়াতে মরিয়া হয়ে যেতে উঠলে কেন বলতো ?

কি বলছ তুমি ? তার এতদূর স্পর্দ্ধা যে আমাদের মান-ইজ্জৎ-এর ওপর টেক্কা দেবে ? হেয় কোরে দেবে ? শুধু এই অঞ্চলেই নয়, সবখানে ? কথাটা ছড়াবে তো সর্বত্র। আমরা আর মুখ দেখাতে পারবো কোথাও ? আমরা তো কারো প্রজা নই। এর পর স্থানীয় কুলিকামিন আর আমাদের মানবে ? সদরে শহরে আর আমরা মাথা উঁচু করে চলতে পারব ?

সুলতা এবার যেন একটু কঠিনস্বরেই বললে, কে এই সতীনাথ ? কতটুকু তার ক্ষমতা ? নিজেরা বে-আইনী কাজ কোরে তার ক্ষমতার পরিধিটাকে যদি বাড়িয়ে দিই, তীব্র কোরে তুলতে সুযোগ দিই, সে দোষ কি তার, না আমাদের ? তাতে তোমাদের মানসম্মান নষ্ট হয় না ? হাজার হাজার টাকা জরিমানা দিয়ে চলেছে সব কোম্পানী। সে তার কর্তব্য কোরে চলেছে। অন্তকে অপরাধ কোরবার, অন্যায় লাভের জোরে কোম্পানী ফাঁপিয়ে তোলবার কাজে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সহযোগিতা না করাই কি সতীনাথের অপরাধ ? কিন্তু ভেবে দেখছ না তোমরা, এসব ঘটতে না থাকলেও কারো চোখেই ধুলো দেওয়া যায় না ? এমন কি কুলিকামিনদের-ও না। তারাও সবাই মনেমনে আর দশজন জ্ঞানগর্বী মানুষের মতই বোঝে,—আমাদের মালিক চোর। কারণ চুরিটা যাদের হাত দিয়ে করিয়ে নেওয়া হয়, তারাই তো সবার আগে বুঝবে। তাহলে আর মানসম্মানটা রইল কোথায় শুনি ? ছিঃ।

৵

এই তিরস্কারের জন্যে শেখর প্রস্তুত ছিল না। অবাক হোয়ে সুলতার দিকে নিরর্থক চেয়ে রইল। সে তার দিদিকে বিলক্ষণ জানে। দৃঢ়তায় সে অবিনাশের মেয়ে।

ধীরে ধীরে বলে শেখর, কিন্তু এই ব্যাপারটা? সকলের চোখের সামনে এমনভাবে বারোয়ারি উৎসবের কর্তা সেজে বসা?

সুলতা বলে, তোমরাও এগিয়ে এলে না কেন প্রতিবারের মত? বলতে পার, এমন শখ তার হবে কেন? কিন্তু বে-হিসেবী উৎসাহটা উদ্দেশ্যমূলক যে নয়, সে কথা আমি বুঝি শেখর। এক আধজন মানুষ থাকে, উৎসাহের আতিশয্যটা সব সময় চেপে রাখতে পারে না। সেটা অপরাধ বোলে ধরে নেওয়া নিজেদেরই কি ক্ষুদ্রতার পরিচয় নয়?

মেনে নিতে পারে না শেখর।

মুখে প্রকাশ কোরতেও তার বাধে।

অন্তরের সে চাপা অসন্তোষ শেখরের চোখেমুখে পরিষ্কার হোয়ে ফুটে ওঠে।

সুলতা কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে মৃদু হেসে বলে, হার মেনেছি বোলে যদি নিজেই ঠিক কোরে থাকি, তবে কি হাজার চেঁচামেচিতে সে অপমান ঢেকে রাখা সম্ভব ভাই? ভেবে দেখলে না, এর মধ্যে কোথাও হার-জিতের কোন প্রশ্নই ছিল না? তুমি হেমপিসিদের কালই এখানে পাঠিয়ে দিও শেখর।

সুলতার অনুমান মিথ্যে হয় নি।

কাঁচবাংলায় পৌঁছে শেখর অন্য মানুষ। সেখানে দোসর সুন্দরম। আশে-পাশে আর দশটা কোম্পানীর মালিকরা। সওকতের সানাই কিছুটা বেমানান হলেও, মুন্নেরী আর মেহরা বাঈএর রিলিফ।

তাই, শেষ রজনী করে, দিনের আলোয় তা নির্দিষ্ট কোরে রাখলেও রাতের নেশায় সে শপথ ভেসে যেতে বাধ্য। ভেসে গেছেও।

এই দ্বিতীয় রজনীতে উন্মত্ততা যেন আরো দ্বিগুণ।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই মহ্‌ফিলের আসর সরগরম।

ওদিকে শরহুলের আজ দ্বিতীয় রজনী।

খালুকপোখরের প্রতিটি সন্তান আজ উৎসব আঙিনায়।

দিনের বেলা থেকেই হেমপিসি যেন একেবারে অন্য মানুষ। গত রাতের সে স্নায়ুবিকার কেটে গিয়ে তিনি আজ দৃঢ়। বেশ উৎসাহী।

সুন্দরমের সঙ্গে তাঁর সব আলোচনা হয়ে গেছে।

তিনি নিশ্চিন্ত। তিনি আজ ওদেরই একজন। উৎসাহে উল্লাসে, হয়তো উন্মত্ততায় তিনিও আজ মেতে উঠেছেন। কোমর বেঁধেছেন। মন বেঁধেছেন। রোমে রোমান হওয়া ছাড়া কোন পথ নেই, সুন্দরম পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে হেমপিসিকে।

আর টুলটুলের ভবিষ্যৎ?

সুন্দরম থাকতে সে চিন্তার কোন প্রয়োজন নেই। হেমপিসি বুঝেছেন। শেখরের আপত্তির কোন লক্ষণ দেখেন নি তিনি। বরং সেখানে যেন সম্মতির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতই লক্ষ্য কোরে আসছেন হেমপিসি কলকাতা থেকেই। সে অনেক দিনের কথা। আর বুঝতে কিছু বাকি নেই।

সুন্দরম আশ্বাস দিয়েছে।

হেমপিসি বলেন, তুমি শেখরের সঙ্গে কথা বলে নিও ভাই।

হেসে বলে সুন্দরম, ও ব্যাপারটা আমার ওপরই ছেড়ে দিয়ে তুমি হাল্কা হও দেখি। এবার ফিরবার আগেই সব কথা পাকা কোরে ছাড়ব।

হেমপিসি সুন্দরমকে অবিশ্বাস কোরবার কোন কারণ খুঁজে পান না। শেখর যাকে বিশ্বাস করে, হেমপিসি তাকে অবিশ্বাস কোরে তাঁর উদ্দেশ্যকে সফল করতে পারবেন না, একথা তিনি বোঝেন।

সুন্দরম নির্ভরযোগ্য অবলম্বন শেখরের। হেমপিসিরও।

হেমপিসি অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠ হন সুন্দরমের।

আরো একটু ঢেলে দিই?

ফিসফিসিয়ে হেমপিশি বলেন, নাঃ। যদি মরে যাই?

পাগল না কি?

ওদিকে দুই প্রহর রাতের কাঁচবংলা যেন উৎসবের সমুদ্রে সম্পূর্ণ ডুবে বুঁদ হয়ে গেছে।

শেখরের সেই বিশ্রামের ঘর।

যেখানে গতরাতে সদা আর ভিখু গোপনে এসে প্রবেশ করেছিল।

আজ বার বার সেখানে এসে আত্মগোপন কোরছে সুন্দরম। হেমপিসি তার দেখাশোনা কোরছে। আটটি সন্তানের জননী বোলে যে হেমাপিশির গর্বের অবধি নেই। যার কোন কিছুই নাকি জানতে বাকি নেই!

হেমপিসি একসময় বলে ওঠেন, সুন্দরম, আমারো মাঝে মাঝে তোমাদের মত মাতাল হয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

সুন্দরম তাঁর মুখে সুগন্ধি রুমাল হাল্কা ভাবে চাপা দেয়। সে হাতটা সরিয়ে নিয়ে নিজের মুঠোয় চেপে ধরেন হেমপিসি।

ফিসফিসিয়ে বলেন হেমপিসি, সত্যি বলছি। আঁতুড় থেকে বেরোলেই প্রত্যেক বার উনি এনে দিতেন। পোর্ট না কি বলে? সেই।

সুন্দরম বলে, ঐ সব এক। কোনটা পোর্ট, কোনটা এক্সপোর্ট। আবার হয়তো কোনটা ইম্পোর্ট।

তা হবে ভাই। কিন্তু মুখে বড় গন্ধ।

কিসের?

হেসে ফেললেন হেমপিসি।

সুন্দরমের কানের খুব কাছে মুখ নিয়ে অস্ফুট স্বরে বলেন, টিনচারাডিন্। ঐ গন্ধ। যা ঘায়ে লাগায়। কাটলে-টাটলে। হেমপিসি হাসেন।

সুন্দরম হাসে।

রাত কখন এসে তার শেষ প্রহরের অন্তিমক্ষণে পৌঁছায়।

সুন্দরম আবার গিয়ে বসে আসরে।

হেমপিসি হাতিয়ে হাতিয়ে দরোজাটা খুঁজে পান। উসকে দিলেও আলোটা আর জ্বলল না। কি জানি, কি হোল।

ভাবতে ভাল লাগে না।

হেমপিসি কেন কাঁদছেন?

তিনি নিজেই বুঝতে পারছেন না। তিনি কাঁদছেন।

নিজের ঘরে আলো জ্বালতে তাঁর আর সাহসে কুলোল না। খাটের একধারে টুলটুল অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

তার নিঃশ্বাসের মৃদু শব্দ। টুলু ঘুমোলে কি হবে? নিঃশ্বাস তো জেগে আছে। গা ছমছম করে হেমপিসির। ভয় করে।

কিঙ্কর নিজের ঘরে কি করছে, হেমপিসি জানেন না।

তাঁর চোখ জলছে। মুখ জলছে। বুকটা জলছে। বড় অবসন্ন মনে হচ্ছে।

তিনি কাঁদছেন, নিঃশব্দে কাঁদছেন।

অনেকক্ষণ তিনি বেশ দূরত্ব রক্ষা কোরেই একপাশে শুয়ে-শুয়ে কাঁদলেন নিঃশব্দে।

একবার উঠে বসলেন।

নাঃ। অন্ধকারে মাথার বালিশটা কোথায় যেন সরে গেল।

হাতদিয়ে আন্দাজে বুঝবার চেষ্টা কোরলেন।

টুলটুলের মাথার কাছ থেকে হাতটা হঠাৎ সরিয়ে নিলেন হেমপিশি।

বড় অন্ধকার।

কতক্ষণ ঠিক ঠাহর নেই।

হেমপিসি চোখ খুলে দেখলেন, তেমনি অন্ধকার।

সজোরে চোখ দুটো বন্ধ কোরে দেখলেন, তেমনি অন্ধকার।

দূরে কোথাও মোরগের ডাক স্পষ্ট হয়ে উঠছে। গাঁয়ের পোষা মোরগ জঙ্গলের মোরগের ডাকে সাড়া দিতে যেন তারস্বরে চীৎকার কোরছে। ঘুমন্ত টুলটুলের মাথাটা বুকে চেপে ধরে হেমপিসি কখন আবার কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছেন, নিজেও টের পান নি।

সতেরো

কলকাতার পক্ষ নিয়ে লড়ছেন হেমপিসি।

হিমসিম।

কিঙ্কর আরো সোচ্চার।

সুলতা আর টুলটুল চুপচাপ। দুজনেই বই নিয়ে ব্যস্ত।

বিপক্ষে একাই লড়ে যাচ্ছে হেমেন।

মোহনমিত্র আর তরুবালা দুপক্ষকেই উৎসাহ দিয়ে মাঝে মাঝে হাসছেন।

লড়াইটা মোরগের লড়াইয়ের মত বেশ জমে উঠেছে।

উৎসবের শেষে হেমেনের যাবার দিন এগিয়ে এসেছে। তাই সে কোন তোয়াক্কা না রেখেই হেঁকে বলছে, কলকাতা অন্ধ।

হেম আর কিঙ্কর সরবে প্রতিবাদ জানাল। কিঙ্কর বলল, কি বললেন? অন্ধ?

হ্যাঁ হে মিস্টার, as a matter of fact, কলকাতা অন্ধ। একেবারে মারবেল-অন্ধ। নইলে মধ্যে অতবড় একটা D লেখা থাকলেও যতুবাবুর বাজারকে জগুবাবুর বাজার বল?

হেমেনের হাসির সঙ্গে হোহো কোরে হেসে উঠলেন মোহনমিত্র আর তরুবালা। স্বলতা একবার চোখ তুলে তাকাল হেমেনের দিকে। আবার বইয়ের পাতায় ডুবে গেল।

মোহনমিত্রের হাসি যেন জ্বালা ধরিয়ে দিলে কিঙ্করের সর্বাঙ্গে। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কে বললে ওটা যতুবাবুর বাজার? As a matter···

কেউ বলে না। As a matter of fact মশাই। কেউ বলে না বোলেই তো অন্ধ বললাম। যা সত্য তা কেউ তোমরা দেখ না, দেখতে পাওনা বোলেই তো অন্ধ বললাম।

হেমেনের রসিকতা বরদাস্ত হচ্ছিল না হেমপিসির, তিনিও বেশ উত্তেজিত হয়ে বললেন, আমাদের কলকাতা,—তাঁকে বাধা দিয়ে হেমেন বলে কে বললে আপনাদের কলকাতা? কলকাতা সারা ভারতবর্ষের।

যাই হোক।

না। তা হবে কেন? যা সবার তা শুধু আপনাদের বলে দাবী কোরবেন কেন? কলকাতার মানুষ দেখেছি, কথায় কথায় বলেন, আমাদের কলকাতায় ওমুক হয়, তমুক হয়।" কেন? আপনাদের চোখদুটোই শুধু অন্ধ নয়, মনটাও অন্ধ। বন্ধ। আমরা তো বলিনা, আমাদের পাটনা, আমাদের দ্বারভাঙা।

হেমেন দুষ্টুমি কোরে হাসে।

কিঙ্কর বলে, as a matter of fact. জানি।

যতুবাবুর বাজারের উঁচুতে অত বড় বড় ইংরাজী হরফে লেখা আছে, Jadu Babu's Bazar. দেখতে পাওনা, as a matter of fact?

সত্যিই কিঙ্কর খেয়াল কোরে দেখেনি কোন দিন। দেখলেও যা সবাই বলে আসছে, সে-ও তাই বোলত বোধ হয়।

হেরে গেলে তো ভাই?

মোটেই না।

হেমেন লাফিয়ে উঠল, এইতো কলকাতা।

As a matter of fact.

হেমপিসি হেঁকে উঠলেন, কিঙ্কর, টুলু, চল এখান থেকে। হেমেন বলে, কি? কলকাতায়? আজই?

সুলতা দেখল হেমপিসি উঠে দাঁড়িয়েছেন। বেফাঁস কথা বলে ফেলায় তাঁর জুড়ি নেই।

সকলকে নিরস্ত কোরে সুলতা বলে, কি দরকার বন জঙ্গলে বসে কলকাতা নিয়ে এত কাড়াকাড়ি? ব'স পিসি। আরেকবার চা চলুক।

বিষে বিষক্ষয় হয়ে যাক।

মোহন মিত্র বললেন, ঠিক বলেছ। সকালের এই জমাট আড্ডা তোমাদের ঐ নিরস লেখক মাটি কোরে দিচ্ছিল।

সুলতার অনুরোধে হেমপিসি আবার আসন গ্রহণ কোরলেন। কিঙ্কর স্থান ত্যাগ কোরে ভেতরে চলে গেল। টুলুও উঠে গেল।

হেমেন একটু যেন অপ্রস্তুত। মোহন মিত্রের কথার জবাবে বলল, জানেন তো দাদা, লেখকরা এ্যাম্‌বিশাস হয় বোলেই এক-একজন wretch. সেই বিখ্যাত মনীষীর কথা। যিনি ছিলেন একটা কাপড়ের দোকানের সেলস্ বয়। শেষে proved unemployable everywhere? এ্যাম্‌বিশানটা জয়ের। আর সব পরাজয় কবুল কোরেও।

মোহন মিত্র বলেন, কথাটা ঠিক আমার স্মরণ হচ্ছে না ভাই।

কেন? Many an ambitious boy is a wretch, because some······spoilt him.

বাদ দিলে কেন?

নাঃ। যাঁদের নিয়ে কথা, তাঁদের সামনে কথাটা বোলে আর বেশি ফ্যাসাদ বাড়াতে চাইনে।

সুলতা আর তরুবালা হেসে উঠল।

হেমপিসি বিরক্তি চেপে চা তৈরির কাজে মন দিলেন।

কিঙ্কর বাইরে বেরিয়ে আসতেই হেমেন তার কাছে গিয়ে সস্নেহে বলে, রাগ কোরলে ভাই? আমাদের কথা কি ধরতে আছে? ডিক্সনারিতে লেখা আছে, story-teller মানে মিথ্যেবাদী।

কিঙ্কর যেন একটু আহ্লাদিতই হোল। বলল, as a matter of fact, রাগ আমি করিনি।

কলকাতার আমরা বাজে কথা সহ্য কোরতে পারি না।

হেমপিসি চায়ের পেয়ালায় সজোরে চামচ ঘুরিয়ে বললেন, লাখ কথার এক কথা বললি কিন্তু।

সব পরাজয় স্বীকার কোরেও জয়টা তবে কিসের, শুনতে পাই হেমেন বাবু?

হাতের বইটা সরিয়ে রেখে মৃদু হেসে প্রশ্ন করল সুলতা। প্রশ্নটির অন্তর্নিহিত অর্থ যা-ই হোক, বলার ভঙ্গিটা হেমপিসিকে বেশ খুশি করেই তুলল। তিনি চায়ে চুমুক দিতে দিতে এবাব হেসে বললেন, যা বলেছিস লতু। সবই যদি হারালাম, জিতলাম তবে কি। লুডু খেলাই ধর না। সব ঘুঁটিই যার কাটা পড়ল, দান জিতল কি সে-ই? এই তোদের লেখক? ছ্যা ছ্যা।

হেমেন শরহুলের উৎসবে যেদিন থেকে সুলতাকে দেখেছে, মনে মনে কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করে আসছে। রূপ তো চোখেই দেখছে। গুণের বহু কথা, অনেক গল্প মোহন আর তরুবালার কাছে শুনেছে। রেঞ্জ কোয়াটার্সে তার মন টেকেনি। একদিকে গোটা ঝালুকপোখর যেমন তাকে টেনেছে, অপব দিকে সুলতা তাকে আকর্ষণ কোরেছে। মোহন মিত্রকে সঙ্গী কোবে বার বার হেমেন এসেছে সুলতার ছোট বাংলায়। বলেছে, জঙ্গলে এমন দামী লাইব্রেরী? মনে হয় সব ছেড়ে এখানে ডুব দিই।

সুলতা হেসে বলেছে, বেশ তো। আসবেন। যা ভাল লাগবে নিয়ে যাবেন। হারাবার ভয় নেই আমার।

হেমেন এসেছে। লাইব্রেরী ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছে। ভেতরে কখনো মোহন একাই, আবার কখনো সঙ্গে তরুবালা হাঁপিয়ে উঠে যখন বলেছে, কই, তোমার মন ভরল? এবার চল।

হেমেন বলেছে, যে রত্নের সন্ধান পেয়েছি, তাতে মন কি ভরে দাদা? সারাজীবন ডুবে থাকলেও ভরবে না আমার।

সুলতা নিঃশব্দে হেসে চুপ কোরে থেকেছে। হেমেনকে তার মনে হয়েছে সত্যিই এক অদ্ভুত মানুষ। কখনো মনে হয়েছে জিনিয়াস। কখনো মনে হয়েছে অতি সাধারণ।

মোহন মিত্র বলেছে, ক্ষুদে ফিলজফার। পাগল। হেমেন উত্তর দিয়েছিল,

ভেবে দেখবেন দাদা, এইসব পাগলেরা যখন Successful হয়, তখন বলা হয়—প্রতিভা। সর্বদেশে। সর্বকালে। এই সত্য প্রমাণিত করেছে এই পাগলের দল। আগে সবাই বলে, ওর দ্বারা কিস্যু হবে না। পরে বলে, জানতাম। ও দিগ্বিজয় করবেই। তবে, আমি পাগল নই। আমি দিগ্বিজয় করব না, একথা আমার চেয়ে কেউ বেশি জানে না। তাই, পাগল, বা, ওর দ্বারা কিস্যু হবে না, ইত্যাদি শুনলে, বক্তার ওপর করুণা হয়। মনে হয়, আমাকে অনর্থক খোসামোদ করছে। কথার অপব্যয় করছে।

সকলে হেসেছে।

হেমেনও প্রাণ খুলে সে হাসিতে যোগ দিয়েছে। আজও তেমনি সহাস্যেই হেমেন সুলতার বাঁকা প্রশ্নটার জবাব সোজা করেই দিল। বলল, জয়টা মন। মানুষের মন। তারই এ্যামবিশান থাকে লেখকের। তার জন্যে অন্য সব পরাজয়কে এমন কি শেষ পরাজয়কে সে হাসিমুখে কবুল কোরে নেয়। অবহেলায়। অতি তুচ্ছজ্ঞানে।

সে জয়, সে নিঃস্বতার জয়ে তার লাভ ? সুলতা আবার প্রশ্ন করে।

হেমেন বলে, বিচার-বুদ্ধি বিবেক আর বিবেচনা সকলের একজাতের তো হয় না সুলতা দেবী। নয়তো লেখকের ঝুড়িঝুড়ি মিথ্যে কথা হজম কোরতে গিয়ে পাঠক চোখে তার জল ভরেই বা তুলবে কেন বলুন ?

সব লেখকই কি মিথ্যে কথা বলে ?

সুলতা হাসতে লাগল।

হেমেন বলে, হ্যাঁ। সেক্সপীয়ারকেই ধরুন না। নিজে চড়াসুদে টাকা ধার দিয়েও ভদ্রলোক 'শাইলকের' মত চরিত্র এঁকে গেছেন।

সুলতা হেমেনের ব্যঙ্গটা ধরতে পেরে হেসে বলে, এইবার বুঝতে পারছি। লেখকরা সত্যিই মিথ্যে কথা বলে। কি সুন্দর মিথ্যা বলতে পারেন আপনি। মিথ্যের চেয়ে আর কিছু তো সত্যি হয় না। এবার বুঝতে পারছি।

হেমেন বলে, লেখকের এইখানেই আনন্দ। কেননা ঠিক এইখানেই তার বেদনা। বুঝলেন সুলতা দেবী ?

সুলতা বলে, কবে যাচ্ছেন আপনি ?

কেন ? তাড়াতে পারলে বাঁচেন বুঝি ? আমি পাঁজি দেখে চলাফেরা করি না।

চাপা গলায় হেমপিসি বলেন, তা করবে কেন? ধর্মে মতি থাকলে এমন গতি হয়?

কথাটা শুনেও হেমেন নির্বিকারের হাসি হাসছে দেখে হেমপিসির গা জ্বলে যায়।

সুলতা বলে, যাবার আগে আপনার চায়ের নেমন্তন্ন থাকল হেমেন বাবু।

বিনা নিমন্ত্রণেই বেশ প্রায় প্রত্যহই চা ধ্বংস কোরে যাচ্ছিলাম। নেমন্তন্নটা কি এতই জরুরী ছিল?

সুলতা একটু যেন অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দেয়, ছিল।

বেশ। তাই হবে। তবে, একা, না দাদা-বৌদি সমেত? আর, দিনটা?

সুলতা সহজ কণ্ঠে বলে,এই যে বললেন, আপনি পাঁজি দেখে চলা ফেরা করেন না?

ঠিকই বলেছি। এখানে দিনধার্যের অধিকারিণী আপনি। নিমন্ত্রণ আপনি জানাচ্ছেন।

না। এ বিষয়ে আমিও পাঁজির ওপর ভরসা করি না।

তাহলে, সবদিনের জন্যেই নিমন্ত্রণ জানানো রইল?

হেমেন যেন আবেগে উদ্বেল হয়ে ওঠে। বলে আহা। কবিও বোধহয় এমনি কোন অরণ্যে কোন একদিন এমনি ঢালাও নিমন্ত্রণ লিপি পেয়ে থাকবেন। তাই বলে গেছেন, দাও ফিরে সে অরণ্য,......ইঁট কাঠের কংক্রীটী কলকাতায় কি এটা সম্ভব? সেখানে দিন তো দিন, সময়-ঘণ্টা-মিনিটও শুনেছি পোক্ত কোরে নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকে নিমন্ত্রণ-লিপিতে।

মোহন মিত্র বলে উঠলেন, আবার? আবার কলকাতা?

তরুবালা বলে, আজকের তোমাদের আড্ডার প্রথম বিষয়বস্তুই ছিল কলকাতা। হেমেন মিথ্যেবাদী লেখক হলে কি হয়। বুদ্ধি আছে বলতে হবে। আরম্ভ আর শেষ বেশ একাকার করে দিলে।

আঠারো

অরণ্য-অঞ্চলে উৎসবান্তের গ্রামে যেন মৃত একঝাঁক কই।

খালুইয়ের মধ্যে নিস্তেজ। একেবারে চুপচাপ। প্রাণহীন গ্রামগুলোর সে চেহারা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন, একটি রাত আগেও যেখানে প্রাণবন্যার বাঁধভাঙা স্রোতে সবকিছু ভেসে যাবার উপক্রম হয়েছিল, সেখানে এখন নিঃশব্দতার, নিষ্প্রাণতার আবরণে সবকিছু ঢাকা পড়ে তলিয়ে গেছে। কোন দিকু হঠাৎ আজ ঝালুকপোখরে এসে উপস্থিত হলে ভূতুড়ে গাঁ বলেই তার মনে হবে। কোথাও কোন জনমানুষের সাড়া নেই।

উৎসবের নেশা বড় শক্ত নেশা।

আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবাই যেমন উৎসবের এক একজন অতিউৎসাহী সক্রিয় শরিক, তেমনি সবাই আবার এই ডুবে তলিয়ে যাওয়ার নিষ্প্রাণ-অংশীদার।

অন্ততঃ কটা দিন ওরা আর কেউ খাটিয়া ছেড়ে উঠবে না। উপোস দিয়ে টান-টান পড়ে থাকবে। ঠিকেদারের কাজ বন্ধ। সব বন্ধ। একটা কুড়ুলের শব্দও কোথাও নেই। নতুন মানুষের পক্ষে ধন্দ লাগার বিষয়।

একি মশায়, সব গেল কোথায় ?

জানেন না ? কাল শরহুল গেছে।

ব্যস্। আর কি কাউকে পাওয়া যাবে ?

এমনি একটা দিন আরো কাটে ওদের। হপ্তা পেলে। পয়সা হাতে পেল, কি সব বেপরোয়া ভাবে মেজাজী হয়ে উঠল। আবার যে ভবিষ্যতে উপার্জনের প্রয়োজন হবে সে কথাটা বে-মালুম ভুলে গিয়ে পরের দিনটা ওরা সম্রাটের মত ব্যবহার করে। তবে, হপ্তার পর এক বেলা। বড় জোর একটা দিন। কিন্তু উৎসবের পর যতক্ষণ না সম্পূর্ণ হতচেতন হয়ে পড়ছে, ততক্ষণ কেবল মুখ হাঁ করবে। নিস্পন্দ শরীর অসাড়ে পড়ে আছে। লাল-লাল চোখ আয়তনে কত ছোট হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে তাকাবার চেষ্টা করলে বোঝা যায়। চোখ বুঁজে মাঝে মাঝে হাঁ করছে। যদি কোন দরদী ঢেলে দেয় দু ফোঁটা।

এক-আধজনের আবার সে ঘোর কাটতে সপ্তাহ পার হয়ে যায়। যারা আগে ওঠে, টলে-টলেও তেমন লঙ্-টার্মের মেজাজীদের মুখে জল দেয়। মাঝে মাঝে কিছু খাদ্য দেবার চেষ্টা করে। শুশ্রূষাকারীদের কপালে লাঞ্ছনা ভোগ হয় বিস্তর। মেজাজীরা তখন তেলে-বেগুনে জলে ওঠে। সর্বশক্তি-রহিত অবস্থায় গড়িয়ে গড়িয়েও হাতের কাছে লাঠি খোঁজে। প্রহারের নিষ্ফল প্রয়াসে অবশ হাত-পা আধা-আধি তোলে, মাঝ পথেই হাত পা আবার মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। অক্ষমতার জন্যে নিজকেই গাল পাড়ে। শাপশাপান্ত করে। নিজের নাম ধরেই মাঝে মাঝে কড়া হুকুম জারি করে। নিজের পূর্ব পুরুষদেরও রেহাই দেয় না। ত্রাণকারীর তখন প্রাণান্ত। তবু সে নির্বিকার। হাঁ-রা কিছুই কাটে না।

তারপর, একেএকে আবার তাদের দেখা মেলে। কেউ কলসী কাঁধে নিয়ে ধীরপায়ে এগিয়ে চলেছে ঝরণার পথে। কেউ গাছতলায় গিয়ে বসেছে। তিন মাথা এক কোরে, অর্থাৎ জোড়া হাঁটুতে মাথা গুঁজে দিয়ে কেউ ঝিমোচ্ছে। বসেবসে নিজে নিজেই দোল খাচ্ছে। দু চার জন আরো এসে জুটছে। উৎসবের ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে ঝাড়া কিছুক্ষণ তর্ক-বিতর্ক হলে গলা পরিষ্কার হয়। মন মেজাজ সায়েস্তা হয়।

লাল চোখ, টস্‌টসে ফোলা-ফোলা মুখ নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। মাথায় খানিকটা করঞ্জের তেল লেপে তাজা হয়ে কাজে ছোটে। মহামূল্য কোন জিনিষ হারিয়ে গেলে ফেলে আসা পথে মানুষ যেমন জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটে, তখন তেমনি কোরে এরা ছোটে। ছোটে ধান্দায়।

সতীনাথ সকালে বেরিয়ে একবার গ্রামটা ঘুরে এল। ঘেরা বারান্দায় বসে পাইপ ধরিয়ে একমনে টানে। হেমেন যেমন রোজ যায়, আজো বেরিয়েছে। যাক। দুদিন বেড়াতে এসেছে। বেড়াক। তাকে সঙ্গ দেবার জন্যে বেচারাকে বাধ্য করা যায় না। মনে হল, সে যাবে একবার মোহন মিত্রের কাছে। ঘরে গিয়ে আবার কি মনে হল, ফিরে এসে বসল বারান্দায়। চারিদিকে উদাস-করা তপ্ত হাওয়া মাঝে মাঝে হু-হু কোরে বয়। তার টানে সতীনাথের মনটাও আজ কোথায় ছুটে যেতে চায়, সে ঠিকানা সে নিজেও জানে না। শুক্‌নো পাতা আর রাজ্যের ধুলো এলো-মেলো উড়িয়ে উদাস-করা সেই হাওয়া নিরুদ্দেশ হয়। মেঠো পথ দিয়ে আবার ফিরে আসে ঝড়ের বেগে। শুক্‌নো পাতা আর ধুলোর ঘূর্ণিত একটা স্তম্ভ পাক খেয়ে ছুটে এসে মিলিয়ে যায় দৃষ্টিপথ থেকে।

মনে পড়ে, অরণ্যের সব কিছুই জীবন্ত।

এই স্তব্ধতাও জীবন্ত।

অরণ্য জীবন তোমার শান্তির নাও হতে পারে সতীনাথ।

মোহন মিত্রের এই কথাটা বারবার এ'কদিন ঘুরেফিরে তার মনে এসেছে। শান্তি কি, শান্তি কিসে, এ প্রশ্ন হাজার বার সতীনাথ নিজেকে করেছে। এ প্রশ্ন তার কাছে একেবারে নতুন না হলেও, ঝালুকপোখরে এসে নতুনভাবেই সে প্রশ্ন তার মনকে অশান্ত করে তুলেছে। মোহন মিত্র তার অনেক অনেক পরে কথাটা বলেছেন মাত্র। শঙ্করী তাকে কি দিয়েছিল? অশান্তি? না। শান্তিই দিয়েছিল। নিজেকে প্রকাশ কোরে মেলে ধরে সতীনাথকে শঙ্করী শান্তিই দিয়েছিল, একথা বোঝাবার চেষ্টা করেছে সতীনাথ নিজেকে সব দিক দিয়ে।

বন্ধুরা বলেছে, এমন সবার জীবনেই হয়। তাই নিয়ে বসে থাকে বুঝি কেউ? সতীনাথও থাকে নি। শঙ্করীর সঙ্গ ত্যাগ কোরে শান্তিই পেয়েছে সতীনাথ। নিজেকে বারবার বুঝিয়েছে এই কথা। যেখানে মনের মিল নেই, সেখানে সম্বন্ধটা অসহ্য বলে মনে হয়েছিল তার। আজো মনে হয়। মনে হয় অনেক কথা। কিন্তু, কি? তাঠিক জানা নেই সতীনাথের।

বনবিভাগে চাকরি পেয়ে খুশিই হয়েছিল সতীনাথ। সেখানে হয়তো মানুষের অন্য চেহারা। অন্য পরিবেশ। নিশ্চিন্ততা। শান্তি।

তার প্রমাণ কি মোহন মিত্র?

নিজের মনে তিনি কল্পনায় শান্তির সৌধ নিত্যনতুন গড়েছেন। আবার ভেঙে গেছে। সেই ক্ষতি ঢাকতে হো-হো কোরে হেসেছেন। শয়ের আবৃত্তি করেছেন। কবিতা বলেছেন। রসিকতার শাওয়ারে পঙ্কমনটা তাজা করবার চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ, ভুলে থাকতে চেয়েছেন নিজের জ্বালাময় ক্ষত। তাঁর কথা কে না জানে? নিজের আহত জীবনের বাঁকে-বাঁকে জমা পড়ে আছে অনেক যন্ত্রণার কাহিনী। তাই উপদেশ দেন। আজ্ঞ দেন। আঘাতের অভিজ্ঞতা উপদেশের কথাগুলো শিখিয়েছে তাঁকে। নইলে তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারেন নি কেন এতকাল? সতীনাথও উপদেশ দেবে অনেক কাল পরে। যখন আঘাতে আঘাতে কালশিরে পড়বে তার গোটা জীবনটায়। নতুন শয়ের আর কবিতা তখন আপনিই আমদানি করা যাবে। নতুন মানুষ তা মন দিয়ে শুনবে। উপভোগ করবে। কিন্তু চলবে ঠিক নিজের পথেই।

অভিজ্ঞতা আর আঘাতের সঞ্চয় কুড়োতে কুড়োতে তখন বয়েসের ভারে সে-ও নুয়ে পড়বে। উপদেশাবলীর পাহাড় জমে উঠবে যন্ত্রণার পাহাড়ের পাশে-পাশে।

সত্যি। অপূর্ব।

হেমেন সতীনাথের পাশে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বলে, অপূর্ব।

চোখ বুঁজে পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সতীনাথ বলে, এবং, নিশ্চয়ই অদ্ভুতও।

হেমেন বলে, ছেড়ে যেতে মন চাইছে না সতীনাথ।

—ছেড়ে দিতেও মন চাইছে না।

কিন্তু, যেতে তো হবেই বন্ধু।

ছেড়ে দিতে হবেই। সতীনাথ বিমর্ষ হয়ে বলে।

বলে, আর ক'টা দিন থাকতে পার না?

হেমেন সিগারেট ধরায়। বলে, আবার আসব। সতীনাথ বলে, তখন হয়তো আমি থাকব না।

হেমেন লক্ষ্য করে, সতীনাথ কেমন যেন মন-মরা আজ। প্রশ্ন করে, কি হোল তোমার বলত?

কেন? শুক্‌নো হাসি সতীনাথের ঠোঁটে মিলিয়ে যায়।

গ্রামটা ঘুরে এসেছ? সব মরে আছে। আমি ব্যতিক্রম হই কি কোরে বল?

হেমেন বলে, আর সবাই তো বেশ বেঁচে আছে।

সবাই নয়, বল, কেউ-কেউ। আমি যদি অন্যদলের হয়ে থাকি?

হেমেন জোর দিয়ে বলল, তোমার মিইয়ে থাকা চলবে না সতীনাথ। তোমার সাজে না।

সতীনাথ হাসল। বলল, মনের এক একটা ওয়েদার আছে হেমেন। কেমন যেন, কালরাত থেকে আমার কিছুই আর ভাল লাগছে না।

একটু থেমে আবার বলল, চল না, তোমার সঙ্গে গিয়ে দেশের দিকে কিছুদিন ঘুরে আসি।

উৎসাহ দিয়ে বলে হেমেন, বেশ তো। চল না। তিনটে বছর কেমন ভাবে বাইরে কাটালে তুমি। এবার চল। ছুটি নাও।

তাই নেব। আর পারছি না।

হেমেন চুপ করে শোনে।

বিজলা হুকুম পেয়ে চা রেখে যায় ওদের সামনে।

জানি হেমেন, মোহন দা ঠিকটি বলে। মন মরে গেলে জংগলে থাকা চলে না।

প্রশ্ন করে হেমেন, তোমার মনটা মরল কিসে? বেশতো আছ।

না, মরে যায়নি। তবে, মর-মর···। মরমীহীন মর-মর মন মম···

দুজনে হাসে। হেমেন বলে, তারপর, কোথা মোর চির অভিযাচিত অনুপম, কি বলো? তারপর, অভিসারের লগন খোঁজার পালা। সে কথার উত্তর না দিয়ে হাসতে হাসতে সতীনাথ বলে, দেখ হেমেন, অনেক আশা নিয়ে এই চাকরিতে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম, বাইরের মানুষের থেকে এখানকার মানুষ হবে স্বতন্ত্র। প্রেমবিশ্বাস ভালবাসা, স্নেহমমতা, যা আমাদের বাইরের দুনিয়ায় আজ কালোবাজারে বিকোয়, ভেবেছিলাম, এখানে তার রূপ আলাদা। কিন্তু, নাঃ। মানুষ সর্বত্র এক। বরং সুযোগ গেলে, গোপনীয়তার সুযোগ পেলে, আরো এখানে বীভৎসতা। তীব্র বীভৎসতা।

হেমেন বলে, কি বলছ হেমেন? ভাদরীর নাচ মনে নেই?

আছে। কিন্তু দু একজন ভাদরী বাসব তো গোটা বনাঞ্চল নয়। তুমি দেখেছ সুন্দরম—শেখরদের?

না। দেখেছি সুলতা দেবীকে।

উত্তম। আমিও দেখেছি। কিন্তু কি হয়ে গেলেন তিনি? কি হলেন মিত্র আর বৌদি? তুমি তো লেখক। বল?

হেমেন চুপ করে শোনে। বোঝে, সতীনাথ সত্যকে এড়াতে চায়। অস্বীকার করতে চায়।

পরে বলে, আমার চেয়ে তুমি বেশি চেন এদের। প্রতিদিনের কাজের ভেতর দিয়ে এদের সবাই তোমার কাছে প্রকৃত স্বরূপে ধরা দেয়। ···তবু বলি সব মিলিয়ে অপূর্ব।

তাই তো বললাম। এবং অদ্ভুতও। জানো, বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কালে হয়ত অরণ্যের এই মানুষরা তত দিনও বেশ সোজা সরল ছিল। আমরা সোনার কুঠার নিয়ে প্রবেশ করে এদের করে তুলেছি বিকৃতির স্যাম্পল্।

তাই বুঝি মনটা মরা-মরা ?

ঠিক তাই। সুখ-আহ্লাদ দুঃখ-যন্ত্রণা সব কিছু এদের জীবনে বিকৃতরূপে গড়ে উঠছে। যা স্বাভাবিক নয়। সন্দেহ এখন এদের একমাত্র অবলম্বন। সকলকে সন্দেহ করা ছাড়া ওরা একদণ্ড বাঁচতে পারে না।

হেমেন উঠে দাঁড়ায়। বলে, ঠেকাতে পারবে ? নিজেকেও ?

না।

তবে ওঠ। আহারের প্রয়োজন অনুভব করছি।

বিকেলে দুই বন্ধু গিয়ে হাজির হল মোহন মিত্রের বাড়ী। বৌদি সামনেই বসেছিলেন। বললেন, 'তোমাদের অপেক্ষায় থেকে হয়রান হয়ে উনি তো এই বেরোলেন।

কোন্ দিকে ? হেমেন প্রশ্ন করে।

সে প্রশ্ন আমিও করেছিলাম। কোন উত্তর পাইনি। আজ সকাল থেকেই দেখছি কেমন একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে আছেন।

সতীনাথ হেমেনকে উদ্দেশ্য করে বলে, দেখলে হেমেন, ওয়েদারটা সকলকেই অ্যাফেক্ট্ করেছে। তারপর তরুবালাকে অনুরোধ জানিয়ে সতীনাথ বলে, হরিকে বলুন না, বাইরেই চেয়ার দেবে। ভেতরে বড় গুমোট আজ।

হরি চেয়ারগুলো নিয়ে বাইরে পেতে দিলে। তরুবালা বললে, কি খাবে বল।

না বৌদি, আজ আর কিচ্ছুটি না। বড় অবেলায় খাওয়া হয়েছে। স্রেফ্ এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল।

তরুবালা বলে, বামুনের ছেলেকে শুধু জল দিয়ে আরো পাপের বোঝা বাড়াতে পারব না ভাই। তোমরা বোসো। আমি একটু সরবৎ করে আনি।

তরুবালা উঠতেই হেমেন বলল, আপনি বসুন, হরিকে ডেকে বলছি।

—তাও কি হয় ? পুরুত দিয়ে পুজো আর চাকর দিয়ে অভ্যর্থনা জঙ্গলে অচল। বুঝলে ?

হেমেন আর সতীনাথ হাসতে লাগল।

তরুবালা সরবৎ আনতে ভেতরে গেলেন।

হেমেন বলল, বলেছিলাম না, অপূর্ব। সত্যিই অপূর্ব। আমার তো যেতে

আর মন চাইছে না। দাও না সতীনাথ একটা কিছু জুটিয়ে। থেকে যাই তোমাদের সঙ্গে।

কিছু জোটাতে পারলেই কি চিরদিন একসঙ্গে থাকতে পারবো সবাই ?

একটু ভেবে বলে হেমেন, তাও ঠিক। ঠিক বলেছ। তবু, যে ক'টা দিন।

—আবার তো তারপর যাবার পালা একদিন আসবেই। তখন ?

হেমেন বলে, ভাবছি লম্বা ছুটি নেব।

তারপর ?

তারপর আবার ছুটি।

সতীনাথ বলে, এমন করলে তোমার চাকরি থাকবে ?

হয়তো থাকবে না। কিন্তু ছুটি তো কেউ আটকাতে পারবে না তখন।

একটু থেমে হেমেন আবার বলে, জানো সতীনাথ, যে পাখী, তাকে বাঁধাধরা পাকা রাস্তা আর একজোড়া মজবুত গামবুট গছিয়ে দিলেও তার আকাশ পথে উড়ে বেড়ানো ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। জানে, ঝড়ের ঝাপ্টায় মাটিতে মুখ থুব্ড়ে যে কোন মুহূর্তে পড়ে শেষ হয়ে যেতে পারে, তবু সে পাকা রাস্তা বেয়ে হাঁটতে পারে না।···তুমিও তো এইমাত্র ছুটি চাইছিলে।

সতীনাথ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, দুটো ভাল কথা শোনাও দেখি। তোমার এসব কথা শুনলে আমার অস্থির লাগে।

আগে তো লাগত না।

আজকাল লাগে।

হেমেন চেয়ে দেখে সতীনাথের মুখের দিকে কিছুক্ষণ।

অস্বস্তি বোধ করে সতীনাথ। হেসে বলে, কি দেখছ ?

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে হেমন বলে, ভাল কথাও কি সব সময় ভাল লাগে কারো ? বল হরি হরিবোল, রামনাম সত্য হ্যায়, এসব দেবতাদের নাম। ভালভাল কথা। শুনতে সব সময় ভাল লাগে ?

একটু থেমে আবার বলে হেমেন, জঙ্গলে তোমাদের ওয়েদার কাকে বলে জানিনা, কিন্তু নিজের কাছে নিজেকে তুমি ধরা দাও সতীনাথ, নইলে কোথাও, কোন ওয়েদারেই শান্তি পাবে না।

সতীনাথ আশ্চর্যের স্বরে বলে, এ তুমি কি বলছ হেমেন ?

ঠিকই বলছি। প্রশ্নটা আমাকে না কোরে নিজেকে কর। তরল সরল জবাব পাবে। আমি তোমাকে আগেও দেখেছি, এখনও দেখলাম। একতিল বদলালে না কোনদিন বাইরে। অথচ ভেতরে তোমার নিত্য-নতুন বদলের ঝড় অনবরত বয়ে যাচ্ছে। শঙ্করী তোমার প্রাণমন আজো দখল করে আছে।

চমকে উঠে বলে সতীনাথ, অসম্ভব। তুচ্ছ।

হেমেন হাসতে থাকে।

তরুবালা সরবতের গেলাসগুলো ট্রেতে সাজিয়ে নিয়ে এগিয়ে আসে। তরুবালা একে একে সরবতের গেলাস তুলে দেয় হেমেন আর সতীনাথের হাতে। নিজেও একটি গেলাস তুলে নিয়ে চেয়ারে বসে বলে, হেমেন, সত্যিই কি তোমার ছুটি ফুরোল ?

হেমেন বলে, সেই কথাইতো হচ্ছিল বৌদি। কাগজপত্রে তাই বলে বটে, কিন্তু আমার মন সেকথা কিছুতেই মানতে রাজী নয়। এখন আপনিই বলুন দেখি, কোনটা মানি ? কাগজ, না মন ? সতীনাথ বলছে, কাগজটাই মানা দরকার। মন ? কিছু না। তুচ্ছ।

তরুবালা হাসতে লাগল।

বলল, বেশ বলেছ। কাগজ মানি না মন মানি।

—বলুন দেখি।

—সত্যিই তো ভাই বড় কঠিন প্রশ্ন করেছ। কিন্তু ছোট বাংলায় চায়ের নেমন্তন্নে যাচ্ছ তো ?

নিশ্চয়ই যাবো।

এবার সতীনাথ বলে, কবে ?

হেমেন বলে, মন যবে বলবে, তবে। দিনক্ষণ স্থির করে দেওয়া নেই।

সতীনাথ বলে, ভাগ্যবান তুমি। আমাদের কপালে এমন ঢালাও নেমন্তন্ন বড় একটা জোটে না।

হেমেন উত্তরে বলে, কপালে কি জোটে ? জোটে মনে।

হেমেনের এই কথায় তিনজনেই একসঙ্গে অনেকক্ষণ-ধরে হাসতে থাকে।

তরুবালা বলে, না, মিছে নয়। আর ক'দিন তোমার ছুটি আছে হেমেন ? সত্যিই, তুমি চলে গেলে বড্ড ফাঁকা লাগবে আমাদের।

উনিশ

আজ ক'দিন হোল হেমেন চলে গেছে।

সতীনাথের মন বসছেনা কোন কাজে। উৎসবের কথা জানিয়ে অনেককেই আমন্ত্রণ জানিয়েছিল রেঞ্জার সতীনাথ। বিভাগীয় সাথী সঙ্গী কয়েকদিন থেকেই আপন আপন কাজের জায়গায় ফিরে গেছে অনেক আগেই। উৎসব শেষের সঙ্গে-সঙ্গেই। যেমন প্রাণমন দিয়ে মেতে উঠেছিল রেঞ্জার, দয়ালসাহেবের আবির্ভাবে তার সব উদ্যম আনন্দ ফুৎকারে যেন নিভে গেছিল। সকলের সামনে অপমানিত হয়েছিল রেঞ্জার। অন্ততঃ তার বিশ্বাস তাই। বিশেষ কোরে স্থলতা। সে কি ভাবল তাকে?

হেমেন ছিল। কথায়-বার্তায় সে ক্ষত খানিকটা সেরে এসেছিল। কিন্তু হেমেন থাকতে আসে নি। চলে গেল।

বড় একা লাগে রেঞ্জার সতীনাথের। বৌদি সেদিন যথার্থই বলেছিলেন, বড্ড একা একা লাগবে আমাদের। তাঁদের কি তারই মত একা একা লাগবার কথা? বোধহয় নয়। ঘর আছে, সংসার আছে।

কি করলে হেমেন এই ক'টা দিন! একদণ্ড স্থির হয়ে বসেনি কোথাও। ঝালুকপোখরের গাঁ'টা দিনে একাধিকবার যেন চষে বেড়াতো। কোন্ ঘরে গিয়ে না ভাব পাতিয়েছে সে? বাসবের ঘরে তার নিত্য যাতায়াত ছিল। এতদিন এই অঞ্চলে থেকেও এমন করে কারো সঙ্গে প্রাণখুলে আপনার হয়ে মিশতে পারেনি রেঞ্জার। প্রতিদিন ফিরে এসে কত গল্প শোনাতো তাকেই। তার প্রতিদিনের পরিচয়েও সে এমন মিশে যেতে পারে নি ওদের সঙ্গে।

ঠিকই বলেছে হেমেন, নিজের কাছে সত্য হয়ে ধরা না দিলে কোথাও নিষ্কৃতি নেই। কোথাও শান্তি নেই। কিন্তু শঙ্করী সম্বন্ধে হেমেনের কথাটা কিছুতেই মেনে নিতে রাজী নয় রেঞ্জার। তবে হ্যাঁ, ভুলতে তাকে পারে নি রেঞ্জার, সেকথা ঠিক। ঘৃণায় তাচ্ছিল্যে জড়িয়ে শঙ্করী আজো জীবনময় যন্ত্রণা দিয়ে ফেরে, সেকথা নিজের কাছে অস্বীকার কোরবে কেমন কোরে রেঞ্জার? মনের গঠনটাই শঙ্করী হয়তো বদলে দিয়ে গেছে তার। মানুষের কাছে সহজ হতে,

মানুষের মনের কাছে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে আসতে সঙ্কোচ আর দ্বিধার, নাকি অবিশ্বাসেরও শৃঙ্খল পরায় শঙ্করী? জীবনটাকে যে এমনভাবে পঙ্গু করে রেখে গেছে, তার কথা ভোলা কি এতই সহজ? অন্ততঃ রেঞ্জার তা পারে নি। বাইরে স্বীকার করতে সাহস না পেলেও, অন্তরে অন্তরে, নিজের কানে কানে, বারবার রেঞ্জার উচ্চারণ করে,—বেইমান। কথাটা ছাঁৎ করে নিজের বুকে যখন ছুটে এসে লাগে, তখন সুলতার চেহারাটা মনে পড়ে। কত শান্ত। কত সুস্থ সুলতা। কিন্তু তবু তাব নিষ্কলঙ্ক জীবন অজ্ঞাত বেদনার তীব্র আঘাতে যে বাঁকাপথের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেচে, সে পথেব সঙ্গে শঙ্করীদের কোন কালে পরিচয় ঘটবে না, রেঞ্জার জানে। ঠিকাদারকে গার্ড মাবফৎ ডেকে পাঠানো হয়তো যায়, কিন্তু রেঞ্জার সতীনাথ সুলতার আরো কাছে সরে আস:তে পারে না। সেখানে অতি-সহজ হওয়া সহজ নয়।

হেমেন কতো সহজ।

ভাদরীর নাচ তাকে ভুলিয়েছে। সুলতার জীবন তাকে কাছে টেনেছে। কিন্তু সে? কিসের বেড়া রচনা কোরে চলেছে সে নিজের হাতে পথের চারি ধারে বারবাব?

হেমেন বলেছিল, জানো সতীনাথ, তোমাব সেদিনের কথার উত্তব তখন দিই নি। ওরা আজো অসভ্য, মানি। তীব ধনুকে বনেব পশুপাখী মেরে খায়। আর তোমাদের সুন্দবংমের দল? কত সভ্য। কত শিক্ষা। কত টাকা। কত মানুষকে ওরা জীবন্ত চুমুক দিযে খায়। আমি সব দেখে গেলাম। এর চেয়ে বড় পাওনা অ'মার কাছে আজ আর কিছু নেই।

হেমেন বলেছিল, কত সহজ ওবা। তুমি এত কাছে থেকেও দেখলে না ওদের। শঙ্করীর দেওয়া বেদনাব অভিমানে, নিজেকে ঘিরে রাখলে শুধু বেড়ার পর বেড়া দিয়ে। নিজেকে বাইরে বড় শক্ত, বড় কঠিন বলে জাহির কোরবার তোমার এত দিনের সযত্ন প্রয়াস কিন্তু মোহন মিত্র, তরুবালা বা সুলতা, কারো কাছেই টেঁকে নি। তারা সবাই জানে, তুমি ভেতরে ভেতবে কতো দুর্বল। কতো অসহায়। দয়াল সাহেবের সামনে সেগুন কাঠের কালো রুলটা নাচালেও নিজের কাছে তুমি বারবার হার মেনে চলেছ সতীনাথ। তুমি নিজের কাছে ধরা দাও। মানুষের কাছে সহজ হয়ে ফিরে এস। সবাই তোমায় দুহাত বাড়িয়ে আপন কোরে বুকে তুলে নেবে।

আবার বলেছিল হেমেন, ভাদরীকে প্রশ্ন করেছিলাম একদিন, নাচ তোমাদের বড় ভাল লেগেছিল গো। কিন্তু একটা জিনিষ আমি ঠিক বুঝতে পারিনা। জবাব দেবে ?…

এমনি কোরে সারা রাতটা ওরা গল্পে আর কথায় কাটিয়ে দিলে। শেষ রাতের দিকে সতীনাথ বলল, চল, ঘেরা বারান্দাটায় গিয়ে বসি হেমেন। চল, দেখবে কেমন রাতের আকাশের বুক আঁকড়ে থাকার নিষ্ফল চেষ্টা কোরে অবাধ্য এক-আধটা তারা অবশেষে ডুব দিয়ে হারিয়ে যায়। শালফুলের মিষ্টি হাল্কা গন্ধ কেমন কোরে আমার সারা কম্পাউণ্ডে এলিয়ে এসে সাধের গোলাপ বাগানে বন্দী হয়ে পড়ে। চল। গিয়ে বসি।

বেশ। চল। —আমি তোমায় শঙ্করীকে ভুলতে বলছিনা সতীনাথ। কিন্তু মনে রেখ, মানুষ যাকে ধোঁকা দেয়, সে কিন্তু খুব বেশি ঠকে না, যত ঠকে সে নিজে, যে ধোঁকা দেয়।

কেন ?

সে ভালবাসা হারায়। অথচ কি আশ্চর্য দেখ, যে বস্তুকে ধরা-ছোঁয়া যায় না, যার স্বরূপ ভাবে-ভাষায় সম্পূর্ণ কোরে প্রকাশ পর্যন্ত করা অসম্ভব, তারই ওপর ভরসা কোরে কত সহজে মানুষ ঘর বাঁধে। কত বিশ্বাস। এইটুকু না-পেলে যেন তার কিছুই পাওয়া হোল না।

সকলের বেলাতেই বোধ হয় তোমাব এই কথাটা খাটে না হেমেন। সতীনাথ বলে।

খাটে না মানি। তারা যদুবাবু মধুবাবু, বা যে-কোন বাবু সেজে অফিস কাছারি টাকা রোজগার সন্তান উৎপাদন কোরে যাওয়াটাকেই জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য বলে মনে করে। তাদের দোষ নেই। এটা দোষগুণের বিষয়ও নয়। কিন্তু যার মনে একবার ভালবাসার হাওয়া বইল, ওমনি তার সর্বনাশ শুরু হয়ে গেল।

এ কথাটাও তোমার সকলের পক্ষে খাটে না হেমেন।

খাটে। কারণ, ভালবাসার পিপাসা কোনদিন শেষ পরিসমাপ্তিতে গিয়ে মিশতে পারে না। তার অন্ত নেই। শেষ নেই। প্রেমাস্পদকে জীবন সঙ্গিনীরূপে পাওয়ার মধ্যেই সব তৃপ্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভালবাসার সেই খানেই সমাপ্তি নেই। ভালবাসার চেয়েও জীবনটা অনেক বড়। জীবনের দাবী একটা ভালবাসা মেটাতে পারে না সতীনাথ। অফুরন্ত একাধিক

ভালবাসায় জীবন যার ভরপুর বলে মনে করছ, একান্ত গোপনে তাকে গিয়ে প্রশ্ন করে শোন, সে বলবে, আরো চাই। আমি আরো ভালবাসা চাই। পিতামাতা স্বামী পুত্র কন্যা স্ত্রী আত্মবন্ধু পরিচিত, বিশ্ব সংসারের সকলের সব ভালবাসা নিঃশেষ করে উজাড় করে ঢেলে দিলেও, ভালবাসার প্রাণ তবু আক্ষেপ জানাবে, "তবু ভরিল না চিত্ত"। আকাঙ্খা জানাবে, আরো দাও। শেষ নিঃশ্বাস অবধি এই আবেদন সে জানিয়েই যাবে। একটু থেমে হেমেন আবার বলে, এখুনি তুমি অবাধ্য তারার কথা বলছিলে না সতীনাথ? ঠিক তাই। সারাটা রাত এত বড় আকাশের বুকে নিশ্চিন্ত আশ্রয় ভোগ কোরেও তার আশ মেটে না। পিপাসা মেটে না।

অনেকক্ষণ দুই বন্ধুতে বসে থাকে চুপ চাপ্।

হেমেন সিগারেট ধরায়। সতীনাথ নিভে যাওয়া পাইপটা আবার নতুন করে ধরায়।

এখনো বনাঞ্চলের ভেতর জমাট অন্ধকার।

হেমেন বলে, শঙ্করীর খবর রাখ?

না।

আমি রাখি। পরে অমলেন্দু-কে বিয়ে করে সংসার পাতে।

কোন অমলেন্দু? বিচলিত হয়ে প্রশ্ন করে সতীনাথ।

মনে নেই? পূর্ণিয়ার যে মুগুর-ভাঁজা ছেলেটি ওয়েস্ট ব্লক হোস্টেলে থাকত? পরে কোথায় মহকুমা হাকিম হয়ে বসেছিল অমলেন্দু।

তারপর? চাপা উৎসাহ কিছুটা প্রকাশ হয়ে পড়ে সতীনাথের।

—দুটি সন্তান ফেলে শেষে অমলেন্দুর ছোট ভায়ের সঙ্গে গিয়ে দাউদনগরে আবার সংসার পেতেছে শঙ্করী।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে সতীনাথ বলে, বেইমান।

হেমেন বলে, কে বেইমান, দুপক্ষ না শুনে হঠাৎ রায় দিয়ে বসলে ওদের কারো বিন্দুমাত্র ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। নিজেদেরই অনুদার বিকৃত মনের পরিচয় দেয়া হবে সতীনাথ।

চঞ্চল হয়ে ওঠে সতীনাথ। বলে, কি বলছ তুমি?

যা বলছি, তা তুমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছ। নিজেকে আর কতো ঠকাবে বল?

সতীনাথ পাইপ সাজবার ভান করে হেমেনের মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়।

হেমেন বলে, এই অভিমানই তোমায় শঙ্করীকে ভুলতে দিচ্ছে না। নিষ্ফল অভিমান থেকে আসছে অহেতুক আক্রোশের পঙ্গু অভিলাষ। এই বিকৃত বিলাস তোমায় ভুলতে দিচ্ছে না শঙ্করীকে। সহজ হতে দিচ্ছে না নিজের কাছে তোমার নিজেকে। অথচ দেখো, যা বলছিলাম। কত সহজ এরা। আমার প্রশ্নের উত্তরে ভাদরী কি জবাব দিয়েছিল জান? এক পলক দেরি না করে অপরূপ হাসিতে মুখ খানা ভরে তুলে বলেছিল, লজ্জা? কিসের লজ্জা? তারপর আমাকে নির্বোধ প্রমাণিত কোরে, বক্ষ অবারিত কোরে বলল, এই স্তন? তোয়া? এতো সন্তানের জীবন। লজ্জা? এতো পরম গর্বের জিনিষ। আমাদের নাচের সময় এই দেখে তোমরা বোকা হও কেন? মা কি ছেলের খাবার লজ্জার জিনিস বলে মনে কোরে সব সময় লুকিয়ে ঢেকে ফেরে? চেয়ে দেখতো ঐ মাঠের দিকে। যেখানে আমাদের খাদ্য। ফসল। ধরিত্রী কী তা বুকে ধরতে লজ্জা পায়? ছিঃ।

নিজের জ্ঞানবুদ্ধি জাহির কোরতে আবার প্রশ্ন করলাম ভাদরীকে, কেউ লজ্জা পায় না? এবার ভাদরী মাটির দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বলল, কেউ কেউ বোধহয় পায়। তারা দুষ্টু মনের মা।

দেখ সতীনাথ, প্রশ্নকর্তার সঙ্কোচকে কত সোজা কথায় লজ্জা দিয়ে দিলে মেয়েটা। তাই বলছি, অবিশ্বাস ওরা করে নি। আমরা বিশ্বাস হারিয়েছি।

সিগারেট ধরিয়ে হেমেন বলে, জানতাম, ওকালতিটা খুবই দুর্বল হচ্ছে, তবু ভাদরীর কথার উত্তরে বলেছিলাম, পাগলা হাতীর দল যখন সে শস্য লুটতে আসে, তখন? —ভাদরী তবু হার মানে নি। বলেছিল, তখন সে আগুনের তাড়া খায়। বিষাক্ত তীর খায়।

উত্তর দিয়ে ভাদরী সোজা আমার চোখের দিকে চেয়েছিল। লজ্জায় আমি চোখ নামিয়ে নিয়েছিলাম।"

এমন নির্বিরোধ শ্রোতা পেয়ে হেমেন আবার বলে, ঐ ভাদরীর মুখের পাশে আরো একটি সুন্দর মুখ আমার মনে ভেসে ওঠে সতীনাথ। সে মুখ সুলতার। এত সহজ, এত সরল মনের মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি। আমাকে তো জানো। একদিন জিজ্ঞাসা করে বসলাম, কোন্ অপরাধে আপনি বনকন্যা?

সুলতা গর্বের সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল, অপরাধ নয়, বলুন কোন্ পুণ্যের ফলে।

বললাম, বেশ, তাই হোল। কিন্তু, সেটা? ভাদরীর মতই সোজা কথায় লজ্জা দিয়েছিল সুলতাও আমাকে। বলেছিল, আমার বাবা আমার মা-কে ভালবেসেছিলেন, সেই পুণ্যের ফলে। বিজ্ঞের মত আবার প্রশ্ন করেছিলাম, সব ছেলেমেয়েদের বাবা, মাকে ভালবেসে থাকেন না কি?

হেসে সুলতা বলেছিল, তা হয় কি?

আর কোন কথা বলার সুযোগ রাখেনি সুলতা ঐ প্রসঙ্গে। সতীনাথ, আমি যেটুকু দেখেছি, তাতে বুঝেছি, সুলতার গভীর শ্রদ্ধা তোমার ওপর। একদিন বৌদির সামনেই বলেছিল, এই একটা মানুষ দেখলাম যার কাছে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার বড় পরিষ্কার। যে-কর্তব্য করতে এসেছেন তিনি, তাতে ফাঁকি দেবার কোন প্রয়াস নেই। তিনি সুযোগ গ্রহণ করেন না।

সতীনাথ সুলতাকে দেখেছে অনেকবার মোহন মিত্রের বাড়িতে। প্রথম দেখার পর তার সম্বন্ধে বিশ্বাস তারও জন্মেছে। অনেক পরিচয় সে পেয়েছে সুলতার। কিন্তু মনের ভাব কোন কারণেই বাইরে প্রকাশ হতে দেয় নি সতীনাথ। হয়তো শঙ্করীর কালোছায়া বারবার তার দুয়ার বন্ধ করে দিয়েছে। আজ হেমেনের কথায় সতীনাথের মনে পড়ল, সুলতাকে সে-ও চেনে। কিন্তু তার বেশি আর কিছু না। আর কিছু স্বীকার করে নেওয়ার মত মনের বল শঙ্করী হয়তো অবশিষ্ট রেখে যায় নি। মর‍্যাল্ গলিয়থ্, অধ্যাপকের কাণ্ডকে ঘৃণা করলেও, নিজেকে তার বেশি সহজ করে নিতে, নিজের কাছে নিজেকে ধরা দিতে সতীনাথ পারে নি। এইটুকুই মোটা কথা। বাধা ছিল। চাকরির বাধা। ঠিকাদারের মেয়ের সঙ্গে রেঞ্জারের অত সহজ হওয়া সহজ নয়।

তখনো সামনের বনাঞ্চলের ভেতর জমাট অন্ধকার। আরো কিছু পরে কুয়াশার মত ভেঙ্গে-ভেঙ্গে যাবে। শুরু হবে আলো-আঁধারির সেই লুকোচুরি খেলা। যেমন সন্ধ্যায়, তেমনি উষায়। যে খেলা সতীনাথের মন ভোলায়। সুন্দর লাগে তার। কেমন একটা নেশা ধরে যায় তার মনে। সমস্ত অনুভূতিতে মাখামাখি হয়ে যায় সে খেলার বোবা বোধটা। বাইরে প্রকাশ করা যায় না। প্রকাশ করতে পারেনা সতীনাথ। এমনিই সে।

সকাল সকাল তৈরি হয়ে বেরিয়ে গেল হেমেন। যাবার আগে সতীনাথ বলল, আজ তোমার নিমন্ত্রণ।

হেমেন বলল, ব্যক্ত-অব্যক্ত, উচ্চারিত-অনুচ্চারিত কতই না নিমন্ত্রণ ছড়িয়ে আছে। তোমার সামনেও। চল না, বেরিয়ে পড়ি।

না। থাক।

থাকবে কেন ? চল। ছুটি নেবে বললে। বললে দেশে যাবে।

না। থাক।

কেন ?

মন যা চায়, সব সময় কি তা পারা যায় ? সকলেই কি তাই পারে হেমেন ?

হেমেন কোন উত্তর দিল না। পারল না। সতীনাথের মুখের দিকে চেয়ে, কথা জোগালেও, উত্তর দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হল না মোটেই। তার পাশে গিয়ে বসল হেমেন।

কি ? যাবে না ?

না। থাক।

কেন ?

মন যা চায়, সকলেই কি তা পারে সতীনাথ ?

দুজনেই হেসে উঠল এক সঙ্গে।

সতীনাথ বলল, একটু তাড়াতাড়ি ফিরো। সন্ধ্যায় তোমার বাস। মনে থাকে যেন।

একটা সিগারেট ধরিয়ে চঞ্চলগতিতে বেরিয়ে যেতে যেতে হেমেন গলা চড়িয়ে বলল, ভুলি নাই ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া···

সতীনাথ এগিয়ে এসে বলে, মিথ্যাকথা। কে বলে যে ভোলো নাই··· খোলো নাই স্মৃতির পিঞ্জর দ্বার···

হা-হা করে হেসে উঠল হেমেন।

সতীনাথ অনেকক্ষণ নিঃশব্দে ঘেরা-বারান্দাটার রেলিংএর ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

হেমেনকে আর দেখা যায় না।

মনে হল, সহজ হওয়ায় কত সুখ। সহজ হওয়া কত সহজ।

দূর থেকেই হেমেন দেখতে পাচ্ছিল, কুড়ুলের চকচকে ফলাটা সকালের হাল্কা রোদকে বারবার চিরে-চিরে উঠছে, নামছে। কোমরে সেইভাবে খাটো

মোটা কাপড়ের আঁচলটা আঁট করে জড়ানো। কালো পিঠটাও চকচক্ করছে। হেমেন এগিয়ে যেতে লাগল। ঐতো পায়ে বেঁকিমণ। বিন্দু বিন্দু ঘাম মুক্তোর মত গড়িয়ে গড়িয়ে চঞ্চল হয়ে সারা পিঠময় খেলা করছে।

ঠিক তেমনি। সন্ধ্যা-আকাশের মিষ্টি চাঁদের আলো যখন ছড়িয়ে থাকে বনপথে, ঘন অরণ্যের সমস্ত প্রতিরোধকে পরাস্ত করে হাল্কা চাঁদের আলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে টুকরো-টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, হাওয়ায় পাতাগুলো অনবরত দোল খায় আর মনে হয় টুকবো টুকবো মুক্তো গড়িয়ে বেড়াচ্ছে বনময়, ঠিক তেমনি। তেমনি দেখাচ্ছে ভাদরীর পিঠটা এখন।

সবল হাতের আঘাতে ভাদরী শুকনো কাঠের গুঁড়িটা ফালা-ফালা করে চিরছে।

একটু দূরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখছে হেমেন।

এই মেয়েটাই শরহুলের নাচ নাচে। যখন তার এই দেহটাকেই হেমেনের মনে হয়েছিল ছোট্ট একটি কবিতা। সুরে ভরপুর।

আরো এগিয়ে যেতেই ভাদরী ফিরে চাইলে। সারা মুখ ঘামে ভেজা। কপালে চুলগুলো লেপ্‌টে আছে। একহাতে সেগুলো সরাতে সরাতে ভাদরী হাসল।

হেমেন বলল, থামলে কেন ?

কোন জবাব দিল না ভাদরী। নিঃশব্দে হেসে কুড়ুলটা মাটিতে রেখে মুখটা আঁচলে মুছে নিয়ে ছায়ায় গিয়ে হেমেনের পাশে দাঁড়াল।

আজই চলে যাবো ভাদরী। তাই তোমাদের দেখতে এলাম। বাসব কই ? রতন ?

সব কাজে গেছে।

ঝালুকপোখর গাঁ-টা আর ভূতুড়ে গাঁ বলে মনে হয় না। যারা কাজে যাবার, মেয়ে-পুরুষ-বালক, তারা চলে গেছে সেই সাত সকালে কাঁসার সান্‌কিতে পান্তাভাত আর শজ্‌নের শাক্ সেদ্ধ বেঁধে নিয়ে। যাদের গাঁয়ে-ঘরে কাজ, তারা রয়ে গেছে। কেউ নিজের ক্ষেতটুকুর চারধারে বেড়ার বাঁধন গুলো মজবুৎ করে দিচ্ছে। কেউ কচি-বাচ্চাদের চাটানের পাথরে টেনে এনে গা ঘষে স্নান করাচ্ছে। ধার দিয়ে কাপড় কাচতে ব্যস্ত দুই যুবতী হেমেন কে গাঁয়ের দিকে এগিয়ে আসতে আগেই দেখেছে। নিজেদের মধ্যে গোপন পরামর্শ করে চুপ করে

নিজেদের কাজে মন দিয়েছে। কিন্তু কানটা জাগিয়ে রেখেছে ভাদরীর দিকে। ওদেরই হঠাৎ-হাসির শব্দে ভাদরী কাজ বন্ধ করে পেছনে চেয়ে দেখে, হেমেন।

পরিশ্রান্ত ভাদরীর মুখের সে অনাবিল হাসিটুকু হেমেনের বুকে নতুন এক অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। পরিচ্ছন্ন সে অনুভূতির ব্যাখ্যা হয় না।

হেমেন গিয়ে মাঝখানে দাঁড়াল। মেয়ে দুটিও এগিয়ে এল। একজন বলল, আমরা জানি, তুমি আজ চলে যাচ্ছ। চল না, ঘরে গিয়ে বসবে। চিনি দুধের সরবৎ দেব। ভয় নেই। নেশা হবে না।

কথাটা বলে মেয়েটি খিল খিল করে হেসে যেন গড়িয়ে পড়ল। হেমেনের মনে পড়ল, একদিন যখন রতন মাঝি ভাবুতে ডিয়াং দিয়েছিল হেমেনকে, তীব্রগন্ধে নাক তার বন্ধ হবার উপক্রম। বলেছিল, সরাও মাঝি। এ আমি পারব না। রতন বলেছিল, বেশ, তবে মহুয়া ?

না মাঝি। সইবে না।

ঠোঁট-আল্‌গা মেয়েটার সে কথা মনে ছিল। পরে একদিন বলেছিল, দিকু মুনিষের নেশাকে বড় ভয়। না ?

ভাদরীও উপস্থিত ছিল।

হেমেন বলেছিল, না। ভয় না।

তবে ?

আর কত নেশা করব বল ভাই ?

ডিয়াং খাও না, মহুয়া খাও না। কেবল সাদা সাদা বিলাইতি চুটি খাও। আর কি নেশা ? হেমেন সহাস্যে বলেছিল, তোমরাই তো আমার নেশা। তার ওপর আর কোন নেশা কি সয় ?

ঠোঁট-আল্‌গা মেয়েটা মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে হাসতে ছুটে পালিয়েছিল।

ভাদরী হাসতে পারেনি।

সত্যিই চলে যাবে ? ভাদরী জিজ্ঞাসা করে।

হেমেন বলে, হ্যাঁ। আবার আসব।

হেসে বলে ভাদরী, মিছে কথা। আর আসবেনা তুমি।

কিছুক্ষণ কি ভেবে হেমেন সস্নেহে বলে, মিছে কথা নয় ভাদরী। আবার আসব। তোমাদের কি ভুলতে পারি ?

ভাদরী অবিশ্বাসের হাসি হেসে বলে, মিছে কথা। আর আসবে না। সবাই তাই বলে।

কেন ?

যে যায়, সে আর আসে না।

সবাই তো সমান নয়।

শুধু মিত্তির সাব মিছে বলে নি। সে যায় না। আর সব মিছে কথা বলে। যায়, আর আসে না।

ভাদরীর মুখটা খুব অসহায় দেখায়।

বলে, বসবে না ?

হেমেন এগিয়ে যায়। বাসবের ঘরে গিয়ে বসে। আরো কতোবার বসেছে এখানে। বাসব রতন ভাদরী, গাঁয়ের অনেকে এসেছে। কত কথা বলেছে। আজ হেমেনের মনে হল, বাসবের এই ঘরখানায় সারাবিশ্বের শান্তি। বাইরের উত্তাপের এতটুকু সাধ্য নেই এখানে অনধিকার প্রবেশ ঘটিয়ে শৃঙ্খলা নষ্ট করে। ভাদরী তাকে বিশ্বাস করলো কেন সে-ই জানে। হেমেনের মনের কথা যদি কেউ শুনতে চায়, বিশ্বাস করতে চায়, তবে সে অকপটে এই কথাই বলবে, এমন স্থান ছেড়ে আর কোথাও যাওয়ার বাসনা তার নেই। ভাদরী তাকে বিশ্বাস করবে না। বিশ্বাস যারা বারবার ভেঙেছে তারা ঝালুকপোখরের কেউ নয়। অন্য কেউ। অন্য অনেকজন।

খবর পেয়ে অনেকেই আসে।

বিরুয়ার খুন্‌খুনে বুড়ি কাকী লাঠিতে ভর করে এসে মাটিতে বসে পড়ে। গালমন্দ দেয় মেয়েদের। মেহ্‌মানের স্বাগত্‌ শুধু এক ঘটি জলে লো ? মুখপুড়ি কোথাকার ? যা পিঠে নিয়ে আয়। আর তো কিছু খায় না ছোঁড়া।

হেমেন চেয়ে দেখে, ভাদরী কাঁসার ঘটিটা রূপো করে মেজেছে। টলটল করছে তার কানাভরতি পরিষ্কার জল। যেন এক ঘটি তরল কাঁচ। স্বচ্ছ।

হাতে করে দাঁড়িয়ে রইল ভাদরী ঘটিটা।

বুড়ি আবার খন্‌খনিয়ে উঠল। যা বলছি।

হেমেন হাত বাড়িয়ে জলের ঘটিটা ভাদরীর হাত থেকে নিল। কি ঠাণ্ডা।

বুড়ির 'আজ্ঞা অমান্য করবে ঝালুকপোখরে তেমন কেউ জন্মায় নি বলেই

ার বিশ্বাস। ছেলেবুড়ো সবাই তার আজ্ঞাপালন করে মজা পায়। ামাসা করেও আজ্ঞা পালন করে। যদি বুড়ি বলল, আজ বড় তেঁতুল খেতে ন চাইছে রে, ওমনি দশে পাঁচে উঠে পড়ল তেঁতুল গাছে। হৈ-চৈ বেধে গল। ফলে হয়তো শেষ পর্যন্ত বুড়ির তেঁতুল খাওয়া আর হলই না। যদিও ছলেয় বুড়োয় মিলে স্তূপাকার করে রেখে দিলে তার খলিহানে।

ভাদরী পিঠে নিয়ে এল। দিতে সাহস করে না।

তার অবস্থা দেখে হেমেন হাত বাড়িয়ে বলে, দাও। দাঁড়িয়ে ইলে কেন?

বাসি।

হবেই তো। শরহুলের পিঠা গো। বাসিই তো খেতে ভাল শুনেছি। াংস নেই?

ভাদরী হেসে বলে, না।

সকলে হাসে। বুড়ি বলে, আর কি থাকে বাপ্। রাক্ষসের জ্বালায় আর কি থাকে? পেট সবারই একটা, কিন্তু খাবে তিন পেট এক সাথে।

হেমেনের সঙ্গে পোয়াটেক পথ সবাই মিলে এগিয়ে আসে। হেমেন এগিয়ে ায়। গ্রামের বাইরে পথ।

এক সময় পিছু ফিরে চেয়ে দেখে, সবাই তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। ভাদরী াথায় হাত ঠেকিয়ে প্রণাম জানায়। বলে ওঠে, যদি আর না আসো?

হেমেন থমকে দাঁড়ায়।

সমস্ত মনটা হাতড়েও ভাদরীর এ প্রশ্নের কোন জবাব খুঁজে পায় া হেমেন।

* * *

এরই মধ্যে তরতর করে সূয্যিদেব আকাশ পথের অনেকটাই পাড়ি দিয়ে লেছেন। হেমেনের পা যেন আর চলতেই চায় না। বারবার রুমালে খের ঘাম মুছে টেনে টেনে সে এগিয়ে চলে। রোদের তাতটা এরই মধ্যে শ কড়া হয়ে উঠেছে।

গাছের ছায়ায় হেমেন বসল। সিগারেট ধরিয়ে টানে। পাখাদের ঘর াধার খেলাটা একমনে চেয়ে দেখে। রৌদ্র তাপের সকল ক্লেশকে তুচ্ছ করে

মুখে খুঁটে বারবার শুকতৃণ খণ্ড নিয়ে অসীম আগ্রহে ছুটে এসে বসছে গাছের ডালে। নিপুন কারিগরের মত বুনে চলেছে। আবার ছুটে যাচ্ছে আসছে। অবোধ্য ভাষায় কতকি পরামর্শ চলছে দুটিতে। গাছের তলায় যে একটা জল-জ্যান্ত মানুষ নিস্পলক চোখে তাদের এই খেলা দেখে অবাক বিস্ময়ে এমন করে চেয়ে আছে, সেদিকে তাদের হুঁশ নেই। পছন্দ অপছন্দের প্রশ্নও আছে। যে খড় কুটো পছন্দ-সই হচ্ছে না, খুঁটে নিয়েও তা সঙ্গে সঙ্গে নাকোচ করে দিচ্ছে। দেখতে দেখতে হেমেনের চোখের সামনেই ফুটে উঠল সুন্দর নিখুঁত ছোট্ট একটি নীড়। তখনও সম্পূর্ণ হতে অনেক দেরি। তবু আন্দাজ করে নিতে অসুবিধে হয় না পূর্ণাঙ্গ সেই ছাঙ্কা বাসাটি কল্পনায় হেমেন দেখে, মা পাখীটি সজাগ দৃষ্টি দিয়ে পাহারা দিয়ে চলেছে কয়েকটি চোখ না-ফোটা বাচ্চা। যে ঠোঁটে করে খড়কুটো বয়ে নিয়ে ঘর বাঁধার একাগ্রতায় তন্ময়, তার পরিশ্রমের অন্ত নেই আজ, সেই ঠোঁটে করেই খুঁটে দৃষ্টিহীন সামর্থ্যহীন চীৎকার-সর্বস্ব ঐ বাচ্চাগুলোর হাঁ-মুখে একে একে আহারকণা রেখে দিচ্ছে অতি সন্তর্পনে।

প্রশ্ন জাগে তার মনে, কে শেখায় তাদের এই খেলা ?

উত্তর জাগে,—সৃষ্টি।

তবু ভাদরীর ব্যাকুল কণ্ঠের সে প্রশ্নের উত্তর কেন খুঁজে পেল না হেমেন ?

* * *

যে হেমপিসির কথায় কাজে ব্যবহারে সমস্ত জগত সংসারের ওপর চাপা বিরক্তি আর আক্রোশ বারবার প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাঁর অনমুশীলিত অনুজ মনটাকে স্থানে-অস্থানে মেলে ধরে তাঁকে কেবলই মূর্খ স্বার্থান্ধ বলে প্রমাণিত করেছে, আজ তাঁর সেই অভিহত মনটা যেন হঠাৎ সবার কাছে এক কণা করুণা ভিক্ষা করতে অতি দীনভাবে আত্মপ্রকাশে ব্যাকুল। হেমেন রীতিমত অবাক হয়েই পড়ল। আজ যেন তিনি সকলের ওপরই অকৃপন ভাবে সদয় হয়ে উঠেছেন। হেমেনের উপস্থিতি তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। সেই হেমেনও আজ তাঁর অতি স্নেহের পাত্র।

সুলতার বয়েস আর অভিজ্ঞতাকে তুচ্ছ বলে প্রমাণিত করার জন্যে হেমপিসি সব সময় কোমর বেঁধে তৈরী থাকতেন। তারই কাছে আজ তিনি ছোট্ট এক অসহায় শিশুর মত বারবার আশ্রয় আর স্নেহময় প্রশ্রয় পাবার জন্যে অস্থির।

তাঁর সারা মুখে কোন এক গোপন পরাজয়ের গ্লানি কালিমা লেপে দিয়েছে নিষ্ঠুর হাতে। সে অপমানের ছায়া বারবার আচ্ছন্ন করে সেদিনের সেই হেমপিসির বিরক্তি-ভরা অসহ্য চোখের চাহনিকে আজ সজল করুণ করে তুলেছে।

এমন পরিবর্তন দেখে হেমেন অবাক না হয়ে পারে নি। বলল, আপনার কি শরীর খারাপ আজ?

হেমপিসি চা তৈরী করছিলেন।

হেমেনের কথা অনুসরণ করে সুলতা আরো একবার হেমপিসির মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখল। আজ সকালবেলা যখন তিনি টুলটুল আর কিঙ্করকে নিয়ে ছোট বাংলায় এসে উপস্থিত হন, তখন থেকেই সুলতা লক্ষ্য করেছে হেমপিসির এই চেহারার পরিবর্তন। কিন্তু প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়নি তার। হেমেনের প্রশ্নকে যেন সায় দিয়েই সুলতা দৃষ্টি তুলে ধরলো আবার পিসির মুখের ওপর।

সকালে গাড়ি পাঠিয়েছিল সুলতা। চালকের হাতে ছোট্ট একটা কাগজে লিখে পাঠিয়েছিল, পিসি, তোমরা সবাই আজ চলে এসো। মনে আছে তো? হেমেনবাবুর আজ চলে যাবার দিন। সকলে একসঙ্গে চা খাব। তুমি টুলটুল কিঙ্কর না থাকলে চলবে না।

হেমপিসি যেন ভেতরে ভেতরে তৈরি ছিলেন। কিছুমাত্র দেরি না করে গাড়িতে এসে উঠেছিলেন টুলটুলের হাত ধরে। কিঙ্করকে সঙ্গে নিয়ে।

বললেন, কৈ? না তো?

শীত ও বসন্তের সন্ধি-কালে সারারাত অনাবৃত অবস্থায় খোলা মাঠে উদ্বিগ্ন হয়ে জেগে কাটালে ঠাণ্ডা-গরমের লুকোচুরি খেলা মানুষের কণ্ঠস্বরকে যেমন দুষ্টু আঘাত করে যায়, হেমপিসির কণ্ঠে সেই ভেজা-ভেজা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা সুর। চোখ দুটোতেও তেমনি জোলো-জোলো ভাব। শরীর সঞ্চালনের উৎসাহ আর শক্তিকে হরণ করে যেমন সে অবস্থা মানুষকে আলস্যময় আক্ষেপময় করে তোলে, হেমপিসির আজকের সকালে ঠিক সেই অবস্থা।

হেমেনের প্রশ্নের উত্তরে তবু বললেন, কৈ? না তো?

অপ্রস্তুত সে কণ্ঠস্বর হেমেনকে ফাঁকি দিতে পারে নি। সুলতাকেও না।

চোরের মত চুপি চুপি টুলটুল এসে সুলতার পাশটিতে বসল। রক্ত-রাঙা মুখ। চোখদুটি ফুলেছে যেন একটু।

কিঙ্কর তৈরি হয়ে এসে বসল।

হেমেন বলল, আপনাদের সকলের নিশ্চয়ই শরীর খারাপ। জানেন, এই সময়টা বড় খারাপ। একটু অসাবধান হয়েছেন কি……

হেমেনের কথা শেষ করতে না দিয়ে সুলতা বলল, জানতাম আপনি শুধুই লেখক কিন্তু দেখছি, ডাক্তারি জ্ঞানও আছে। সত্যি হেমেনবাবু, আপনি একটি জিনিয়াস্।

—যাক। এতদিনে তবু একজনের কাছে স্বীকৃতি পেলাম। এইটুকুই আমার সঞ্চয় হয়ে থাকবে।

হেমপিসি হেমেনের চা রেখে বললেন, তুমি আজ চলে যাবে?

হ্যাঁ।

একটু চুপ করে থেকে হেমপিসি বললেন, জানি না আমরা কবে যেতে পারব

হেমেন বলল, কেন? থাকুন না আর কিছু দিন।

না। এখানে গরম কালেও শীত। খারাপ লাগে।

সুলতা বলে, না পিসি। দুপুরের চড়ারোদের দাপটকে রাতের হাওয় এখানে এমনি করেই শীতল করে দেয়। হেমেনবাবু ঠিকই বলেছে অসাবধান হলেই বিপদ। তোমরা সবাই মনে হচ্ছে এক্স্পোজার লাগিে ফেলেছ।

তা হবে। বললেন হেমপিসি।

কথাটাকে সুলতা তেমন গুরুত্ব দিতে না চাইলেও হেমেনের কানে গি একটু বেসুরো হয়েই বাজল।

এসে পড়লেন মোহনমিত্র আর বৌদি।

তরুবালা হেমেনকে বলে, কি গো, একাই এসে পৌছুলে। আশা ক বসেছিলুম সঙ্গে করে আনবে।

হেমেন উঠে দাঁড়াল। তরুবালাকে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল, সা পেলাম না। দাদা ঠাকুরপোদের তেমন পছন্দ করেন না, সে খবর আগে থেক জানিয়ে রেখে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তারপর এই যাবার বেলা আর দুঃসাহস দেখাই কেমন করে বলুন?

হেমেনের সঙ্গে সুলতা হাসিতে যোগ দিলে। মোহন শুকনো মুখে এ হাসল।

হেমপিসি বললেন, হেমেন, তুমি চলে যাচ্ছ। বড্ড খারাপ লাগছে। যদি তোমায় কোন দুঃখ দিয়ে থাকি মুখ্যু মানুষ বলে ক্ষমা কোর।

হেমেন আরো অবাক হয়ে গেল।—কি বলছেন? কাল সারারাত আপনাদের সকলের কথাই হয়েছে সতীনাথের সঙ্গে। বাচাল কথা-বার্তায় সেদিন আপনাদের আমিই দুঃখ দিয়েছি। আমারই ক্ষমা চাইবার কথা।

হেমপিসি বলেন, কলকাতা গেলে দেখা করতে ভুলো না কিন্তু।

হেমপিসির চোখ দুটি কেমন ফ্যাকাশে দেখালো। অসহায় চাহনি।

বললেন, এখানে তোমরা সবাই ভাল। তবে গরমকালের শীতটা আর সহ্য হচ্ছে না আমার।

হেমেন সকলকে উদ্দেশ্য করেই বলে, সত্যি মন চাইছে না আপনাদের ছেড়ে যেতে। তবু যেতে হবেই। তাইতো কাল বলেছিলাম সতীনাথকে, অপূর্ব। অপূর্ব তোমার ঝালুকপোখর আর তার মানুষেরা।......কিন্তু পরে বুঝলাম, অর্দ্ধসত্য বলেছিলাম আমি। সতীনাথ সেটা পূর্ণ করে দিয়েছিল অবশ্য। বলেছিল, এবং অদ্ভুতও। দেখছি দুটো মিলিয়েই পূর্ণ সত্য।

মোহন বললে, যেমন?

—যেমন আপনি নিজে। অপূর্ব হাস্যময়তায় সবটা ঢেকে রেখে যাবার বেলা সন্ধ্যার আঁধার টেনে নামিয়েছেন নিজের চারিদিকে। ভাল লাগে কি?

নিরুপায় হয়ে মানুষকে অনেক সময় নিজের বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়াতে হয় হেমেন। কিন্তু আমাব অদ্ভুতত্ব কোথায় দেখলে?

নির্ভয়েই বলতে চাই। আপনার জীবনের অনেক কাহিনীই শুনেছি। সতীনাথ, সুলতাদেবী আর গ্রামবাসীদের কাছে। কিন্তু অদ্ভুত লাগে, আপনার ছেলে মেয়েকে সেই যে মামাবাড়ী পাঠিয়ে রেখেছেন, একটিবারও আনেন না কেন?

হাল্কাভাবে হেসে মোহন জবাব দেন, এসেছে তো। কয়েকবার এসেছে।

—এতদিন রইলাম। দেখলাম না তো! আপনার মত মানুষ সন্তান ছেড়ে থাকে কি কোরে?

নিশ্বাস ফেলে মোহন বলেন, জন্মদেবার সুযোগ অধিকার পাওয়া, আর সন্তানকে সব দিক দিয়ে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠিত করার পথে নিরলস সহযোগিতা করার দায়িত্ব তো এক জিনিষ নয় ভাই।

একটু থেমে আবার বলেন, আমার জীবন সম্বন্ধে কতটা কি শুনেছ আমার জানা নেই। তবে আমি তো জানি। সে জীবন কেবল এক্সিডেন্টে ভরা।

হেমেন একটু আশ্চর্যের স্বরেই প্রশ্ন করে, সে কি? আপনার মত সাবধানীর জীবন এক্সিডেন্টে ভরা?

মোহন জবাব দেন, অতি সুদক্ষ অতি সাবধানী চালক হলেও কি এক্সিডেন্ট এড়াবার ক্ষমতা একতরফা থাকে হেমেন? থাকে না। জীবনের পথে তো তুমিই শুধু একা নও। সে পথে অন্য আরো শতেক রকমের চালক আছে, যাত্রী আছে। সবাই সমান নয়। সবাই তেমন সুদক্ষ সাবধানী না-ও হতে পারে। তাদের অসতর্কতা অসাবধানতা অদক্ষতা দুর্ঘটনা বাধাতে পারে। নিস্তার কোথায়? যাত্রী যখন কেবলমাত্র তুমি একাই নও?

সকলকে চুপ করে থাকতে দেখে এবার মোহন মিত্র হেসে উঠলেন। সমস্ত বুক খালি করে হাসলেন।

আবার আসছ কবে?

আসব। কিন্তু তখন যেন আপনার মত করেই আপনাকে পাই।

—তার নিশ্চয়তা কি? ততদিন বাঁচলে তবে তো?

—আপনাকে বেঁচে থাকতে হবে অনেক দিন দাদা। গ্যারান্টি দিন।

মোহন ম্লান হেসে বলে, মরে যাওয়ার আগে পর্যন্তই তো বাঁচার গ্যারান্টি। সে পলকমাত্রের মাপ করি কি দিয়ে যে তোমাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বসব অনির্দিষ্ট সময়ের? তবু তুমি এসো। ঝালুকপোখর থাকবে।

যথা আজ্ঞা, বলে উঠে দাঁড়াল হেমেন।

সুলতা বলে উঠল, একি? বসুন আরো একটু।

হেমপিসি বললেন, আবার কবে দেখা হবে জানি না। একটু পরে গেলে হয় না? সত্যিই মনটা খারাপ লাগছে।

হেমেন বিনীত কণ্ঠে বলে, আমার জন্যে আরো একজন পথ চেয়ে বসে আছে। কি করি বলুন দেখি?

সুলতা হেমেনের মুখের দিকে একবার চেয়ে চোখ নামিয়ে নিল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, তাহলে আর আটকাবার সাহস নেই আমার।

মোহন আর তরুবালা হাসতে লাগলেন।

হেমপিসি বলেন, হেমেন, তোমার বন্ধুটিকে আমার তো দেখা হোল না। শুনেছি নাকি খুব বদরাগী মানুষ। সত্যি নাকি ?

সকলে একসঙ্গে হেসে উঠলেন বটে হেমপিসির এই অসংলগ্ন কথায়, কিন্তু প্রত্যেকের হাসির অন্তর্নিহিত কারণগুলো কিন্তু একেবারে ভিন্ন, পৃথক পৃথক চরিত্রের। হেমপিসির কাছে সেগুলো ধরা না পড়লেও, হেমেনের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ ছিল না। প্রসঙ্গ বদল করে সুলতা আরেকবার সহজ হবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হোল। বলল, জানি, তিনি ঠিকাদারের বাড়ি আসেন না। তাই নিমন্ত্রণের সাহস আমাদের জাতের কার আছে বলুন ? এখানে তো তিনি আসবেন না।

হেমেন বলে, ক্ষতি ছিল না! আপনি তো এখন আর ঠিকাদার নন।

কিন্তু বাড়িটাতো কোম্পানীর।

মোহন মিত্র বলেন, অত ধরতে গেলে সতীনাথের তো পৃথিবীর কোন অংশেই বাস করা চলবে না সুলতা। চাঁদে গিয়ে তাকে বাসা বাঁধতে হয়। ঠিকাদারের বাড়ি যে-মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, সেই মাটির সঙ্গেই তো ছুঁয়ে আছে পৃথিবীর মাটির শেষ কণাটুকুও।

হেসে সুলতা বলে, কথাটা তাঁকেই বুঝিয়ে বলবেন।

হেমেন বলে, বলে দেখবেন। মা ফলেষু···

সকলে এক সঙ্গে নেমে আসেন। হেমেনের সঙ্গে গেট পেরিয়েও কিছুটা দূর অবধি সকলে এগিয়ে আসেন।

সুলতা বলে, রোদ হয়েছে। গাড়িটা নিয়ে যাবেন ?

হেমেন বলে, না সুলতাদেবী। ওতে পথ বড় তাড়াতাড়ি ফুরোয়। অত তাড়াতাড়ি সম্বন্ধ চুকিয়ে দিতে পারব না।

—কিন্তু দূরত্বও তো সঙ্কুচিত হবার আশা থাকে। বলল সুলতা।

সুলতার উজ্জ্বল মুখখানা চেয়ে দেখে হেমেন। বারবার চেয়ে দেখে।

তারপর, সামনের দিকে চেয়ে পথ চলে। একবার ফিরে দেখে, সবাই ওরা তার যাওয়ার পথ চেয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে। সকলে হাত তুলে ওকে বিদায় জানায়।

নীরবে ওদের ছাপে হেমেন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে। তারপর, অনুচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করে, 'পুণ্যবল হল ক্ষীণ, আজি মোর স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন, হে দেব, হে দেবীগণ' !

কুড়ি

অনেক দুশ্চিন্তার বোঝা ব'য়ে মোহন মিত্র যখন কাঁচবাংলায় গিয়ে সে সন্ধ্যায় বাধ্য হয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন সেখানে যা দেখলেন, তাতে তাঁর নিজের চোখকেই বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু, হ্যাঁ। যা তিনি দেখছেন, ঠিক তাই তাঁর খোলা চোখের সামনে ঘটছে।

কয়েক দিন থেকেই রতন এসে কথাটা তাঁকে জানাচ্ছে। প্রথমটা তিনি তেমন বিশ্বাস করতে পারেন নি। বলেছিলেন, তুই বলিস কি রতন? আজকের দিনে মানুষ কি আর তেমন পাগলের কাণ্ড করে বসতে সাহস পায়? দিনকাল বদলেছে। সে তোদের মিঠে-পানির দিন আর নেই, বুঝলি? ওসব ওদের ভয় দেখানো চাল।

তারপর তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, ও বস বুজরুখির কথা। যেমন সেবার 'হাটে দেখে নেব' বলে শাসিয়ে গেছিল। মনে নেই? পারলে কিছু কোরতে? ভয় নেই। কাজে মন দি'গে যা।

রতন-বাসবের দল আবার ফিরে এসেছে। বলেছে, না মিত্তর সাব, আমরা বেশ বুঝতে পারছি, শা' জী আর নিবারণের দল কাঁচবাংলায় শলা করছে। একদিকে কিছুই হবে না বলে কথা চালছে, অন্যদিকে তলে তলে সর্বনাশটা ঘটাবার পাকা মতলব আঁটছে। আমরা তো আর চুপ করে বসে থাকতে পারি না মিত্তর সাব। একটা কিছু বলুন।

অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন মোহন মিত্র। তারপর আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলেন, ছোট বাংলায় খবরটা দিইচিস্? নতুন রেঞ্জার সাহেবকে বলেছিস?

না। আপনি রায় না দিলে আমরা কোথায় গিয়ে কি বলব?

যার ওপর ওদের এতখানি আস্থা, এত বিশ্বাস আজো বর্তমান, তাদের অমঙ্গলের আশঙ্কাটা হঠাৎ 'না' দিয়ে উড়িয়ে দিতে মোহন মিত্রের মন আর সায় দিল না।

মুখ নিচু করে ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, সন্ধ্যায় ছোটবাংলায় থাকিস তোরা। আমি একবার এখুনি বেরোচ্ছি।

আমরা কেউ সঙ্গে যাব কি ?

না। তোরা ফিরে যা। আমি একাই যেতে চাই। নিজে বুঝে আসতে চাই। তারপর, দরকার হলে বিকেলে যাব কাঁচবাংলায়। সেখান থেকে ছোট বাংলায়। তোরা ওখানে থাকিস সবাই। ভাবিস না। আমরা এখনো মরে যাইনি।

ওরাও বলে, আমরাও বেঁচে আছি মিত্তর সাব। ভয় আমরা পাইনি কোন কালে। এখনো পাই না। তবে আপনারা যখন আছেন, আপনাদের বিনা হুকুমে একটা টাংগিও উঠবে না। একটা তীরও ছুটবে না। কথা দিলাম। গাঁয়ের সবাইকে জানতে দিই নি এখনও।

বেশ। তোরা ফিরে যা।

ওরা ফিরে গেছে। কিন্তু মোহন মিত্রের দুশ্চিন্তার বোঝা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

কিন্তু আর দেরি করবার সময় নেই। যা করতে হয় আজই করতে হবে। এই ভেবে তিনি সোজা কাঁচবাংলার পথেই পা বাড়ালেন। তাঁর কথামত সবাই ছোটবাংলায় অপেক্ষা করবে।

কাঁচবাংলায় এসে যা দেখলেন তাতে তাঁর নিজের চোখকেই বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে উঠল।

জনমানুষ কেউ কোথাও নেই। একটা চাকরবাকর পর্যন্ত না। ভেতরের ঘর থেকে আলোর একটা ক্ষীণ রেখা মোটা কাঁচের বেড়া ভেদ করে বাইরে এসে জানান দিচ্ছে, একেবারে নির্জন নয় কাঁচবাংলা।

বারান্দায় উঠে গেলেন মোহন মিত্র।

হাঁক-ডাক দিলেন। নাঃ। উত্তর দেবার জন্তে কেউ মনে হয় আশে-পাশে নেই। বাধ্য হয়ে তিনি আরো এগিয়ে গেলেন। গোটা বারান্দাটা ঘুরে ওপাশের যে ঘরের ভেতর সামান্য বাতির আভাস জেগে ছিল তারই সামনে এসে দাঁড়ালেন। সামান্য ঠেলা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। ভেতর থেকে বন্ধ করা ছিল না।

না—না—না। আমি আর পারব না। আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে। ছেড়ে দিন। আমি শোব। একটুখানি শোব।···

সে কি ? কলকাতায় তো তোমার ঘুম পেত না !

—কি জানি। এখানে বড্ড পাচ্ছে। আমি পড়ে যাব।

সুন্দরম গিয়ে কোল-পাঁজা করে টুলটুলের এলোমেলো ক্লান্ত দেহটা তুলে এনে খাটের ওপর শুইয়ে দিলে।

মোহন মিত্র অবাক হয়ে চেয়ে দেখছেন। সমস্ত শরীরটা পাথর হয়ে গেছে তাঁর।

সুন্দরম টুলটুলকে মদ খাইয়েছে। নাচতে বলছে আরো। হয়রাণ হয়ে এলিয়ে পড়েছে মেয়েটা। অসংলগ্ন ছিল তার কথাগুলো। মুখটা ঘামে ভেজা। বিছানায় লুটিয়ে পড়ল টুলটুল।

সুন্দরম আবার তুলে নিল গেলাসটা ছোট টেবিলের ওপর থেকে।

ফিরে দেখে, দরজার পাশে মোহন মিত্র।

ভাল কোরে নিরীক্ষণ করে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সুন্দরম। বলল টেনে-টেনে, ও-ও। স্যার্ ?……সার্ মোহন মিটার ?……আজ্ঞা হোক্ আসতে। বসুন। দেখুন, কি টপ্ নাচে এই মেয়েটা, I mean টুলটুল। কলকাতায় কতো নাচ দেখিয়েছে আমাদের। কিন্তু, কিন্তু এখানে বড্ডো ঘুম পাচ্ছে আজ ওর। পারছে না নাচতে তেমন।

মোহন মিত্র কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে, কি হচ্ছে এসব ? শেখরবাবু কোথায় ?

সুন্দরম হাতের গেলাসটা যথাস্থানে রেখে ধীরে ধীরে ফিরে এসে মোহনের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, বসবেন না ? বসুন। তবে তো জবাব দেব।

সুন্দরমও বেশ ক্লান্ত বোঝা গেল। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছে জড়িত-কণ্ঠে বলল, আগে বসুন। তবে বলব।

না। বেরিয়ে আসুন এখান থেকে। ওর মা কোথায় ?

সুন্দরম বসে পড়ল। বলল, বাপ্স্। কি কড়া order, কিন্তু কি জবাব দেব বলুন তো স্যার ?

যা জিজ্ঞাসা করছি তারই জবাব দেবে।

এবার সুন্দরম ক্লান্তকণ্ঠেও একটানা হাসতে লাগল। শেষে বলল, কেমন করে জবাব দেব স্যার্, দুটো করে প্রশ্ন করছেন এক সঙ্গে। জবাবটা যে কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। বিলকুল হিজিবিজি হয়ে যাচ্ছে।

মোহন মিত্র আরো কঠিন হয়ে বললেন, বেরিয়ে এস এখান থেকে।

উঠে এল সুন্দরম। সামনে এসে অপ্রত্যাশিত কঠিনস্বরে বলল, It is not perhaps within your jurisdiction Mitter. Now, simply, get-out.

সুন্দরমের উচ্চারণ স্পষ্ট। গোটা-গোটা। থেমে-থেমে। ভুল বোঝবার কোন সুযোগ নেই।

তবু মোহন বললেন, কি হচ্ছে এসব ?

Can't you follow ? You old hag, I am a game, I am a sport to day. Come. Have a peg, and dance with us.

রাগে সমস্ত শরীর কাঁপছে মোহন মিত্রের। কিন্তু করবার কিছুই খুঁজে পাচ্ছেন না। স্থান-কাল বিবেচনা করে, ঘৃণ্য পাত্রের প্রতি তাঁর যে আক্রোশের আগুন ফুঁসে উঠতে চাইছে, নিরুপায় অবস্থায় তার সবটাই তাঁকে হজম করে যেতে হচ্ছে।

মোহনের এই অবস্থা সুন্দরম বেশ উপভোগ করছে। আদেশের কণ্ঠে হাঁকল, কৈ হ্যায় ?

সারা ঘরটায় আছড়ে পড়ল মাতালকণ্ঠের কঠিন আদেশ। একটু পরেই দরজায় দেখা দিল পুরোন দুই দারোয়ান। তারা মিত্র সাহেবকে চেনে। কিন্তু নিমকহারামী করতে শেখেনি। তাই ধীরপায়ে দুজনে এগিয়ে এল মিত্র সাহেবের গায়ের খুব কাছে। মোহন এক পা পেছনে সরে গেলেন।

সুন্দরম হেসে ফেটে পড়ল। হঠাৎ আবার আদেশ জারি করল, সাব্‌কো ফটক্-কা রাস্তা দিখাও।

রঙীন চোখে হাসতে হাসতে কাঁচা-পাকা লম্বা-চওড়া গোঁফ দুলিয়ে দারোয়ান দুজন বলল, চলিয়ে সাব্।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে মোহন এগিয়ে গেলেন টুলটুলের খাটের দিকে। ধীরে ধীরে ডাকলেন নাম ধরে। একসময় টুলটুল চোখদুটো জোর করে টেনে চাইবার চেষ্টা করে বলল, কে ?

আমি। চল, তোমার মায়ের কাছে নিয়ে যাই।

তিনি বোধহয় তোমার লতুদির কাছে গেছেন।

হ্যাঁ-হ্যাঁ। কিন্তু, না-ম্না। আমি যে-তে পারব-ই না।

গেলে মা খুব রাগ করবেন। বলে গেছেন, টুলা, সুন্দরম সাহেবের অবাধ্য হয়ো না যেন।

মেয়েটা আর বলতে পারল না। জড়িয়ে গেল কথাগুলো। আবার চোখ বুঁজে ফেলল টুলটুল।

মোহন মিত্র সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

একটা নিশ্বাস ফেলে অবাক হয়ে চেয়ে আছেন।

সুন্দরম হাসল। নিটোল এক পরিপূর্ণ হাসি।

মোহন মিত্র নিজেকে অসহায় বোধ করলেন। হেমের কাছে নিয়ে গিয়ে বিচার আর শাস্তি দাবি করবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু হেমের আদেশেই টুলটুল কাঁচবাংলায় সুন্দরমের আজ্ঞা পালন করে চলেছে। সে ক্ষেত্রে কোন্ অধিকার বলে তিনি এখানে উপস্থিত থাকতে পারেন? কোন্ অধিকারে প্রতিবাদ করবেন?

তবু বললেন, সুন্দরম, ও তোমার মেয়ের বয়েসী……

তাঁর কথা শেষ না হতেই গেলাস থেকে মুখ তুলে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে উঠলো সুন্দরম সশব্দে। বলল, What's in age Mitter, what's in age? Age dawns on cowards and dwarfs.

তারপর আবার হেঁকে উঠল, কৈ হ্যায়?

দারোয়ান দুজন আবার এগিয়ে এল! — জী সাব্।

সহাস্যে সুন্দরম আদেশ করল, মিত্তর সাব্‌কো ফাটক্-কা রাস্তা দিখাও।

কোন দরকার ছিল না।

মোহন মিত্র এ অঞ্চলের রাস্তাঘাট ভাল করেই চেনেন। তাঁকেও বোধহয় চেনে গাছের প্রতিটি পাতা।

গেট পার হয়ে মোহন মিত্র বেরিয়ে এলেন। নিজের চোখদুটোকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। যা দেখলেন, তাই কি ঘটেছে? কিন্তু, কি করতে পারেন তিনি? হেমকে তিনি বিলক্ষণ চেনেন। একথাও শুনেছেন, শেখরের সঙ্গে টুলটুলের বিয়ে দেবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছেন তিনি। সুন্দরমের কথা ছাড়া শেখর নাকি এক-পা চলেনা বলেই হেমপিসির বিশ্বাস। সুন্দরমও তাঁকে আশ্বাসের পর আশ্বাস দিয়ে চলেছে। —সব কিছুই ঠিক আছে। কেবল সাতপাকটা ঘুরিয়ে দেওয়া! সুন্দরমই হেমপিসির এখন একমাত্র বল-ভরসা। অতএব, তার অবাধ্য হলে চলবে কেন? কলকাতার বাসায় যখন নাচ-গান করেছে টুলটুল মায়ের আদেশে, এখানেই বা করবে না কেন?

যেটুকু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে সুন্দরম, সেটুকু এ অবস্থায় হয়েই থাকে।

যতক্ষণ হেমপিসি শেখর কিঙ্কর উপস্থিত ছিল, ততক্ষণ এসব খেয়াল হয়তো সুন্দরমের মাথায় আসেনি। হঠাৎ সুলতা এতদিন পর নিজে গাড়ি নিয়ে এসে আজ কাঁচবাংলার গেটে দাঁড়াবে, সেকথা কে ভাবতে পেরেছিল? শেখর ছুটে যেতেই সুলতা তাকে যেন ছোঁ মেরে নিয়ে বেরিয়ে গেল। —খুব জরুরী, এখুনি চলতো একবার তুমি।

শেখর ঘটনার আকস্মিকতায় কথা হারিয়ে বসেছিল।

সুলতা আবার বলে উঠল, চলে এসো। বলছি, খুব জরুরী। আর দেরি করা চলবেনা। উঠে এস গাড়িতে।

শেখর আর দেরি করতে সাহস পায় নি। যন্ত্রচালিতের মত উঠে বসেছে গাড়িতে। সে যে একেবারেই সুলতার উদ্দেশ্য বুঝতে পারেনি তা নয়। আর, সেইখানেই তার আজ চরম দুর্বলতা। সুলতা তাদের 'নরবলি'র সমস্ত পরিকল্পনার খবর পেয়েই যে ছুটে এসেছে, এই সোজা কথাটা সুন্দরমের সাহায্য ছাড়াই শেখর উত্তেজিত সুলতার সামনে দাঁড়িয়ে বেশ বুঝতে পেরেছিল। তাই, আর 'না' বলবার সময় পেল না শেখর। সাহস? কোনদিনই ছিল না।

তাতেও কোন অসুবিধে ঘটেনি।

টুলটুলের নাচের তাল ভঙ্গ হতে দেননি হেমপিসি তার পরও।

কিছুক্ষণ পর কিঙ্কর ভেতরে-ভেতরে বেশ ক্ষেপে উঠল। ঘর থেকে সে-ই যে রাগ করে উঠে গেল, আর ভেতরে এসে বসল না। কাঁচ ঘেরা বারান্দাটায় অন্ধকারেই কেবল পায়চারি করছে। ইচ্ছে কোরে জুতো ঠুকে-ঠুকে চলছে। শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে পাশের ঘরে গিয়েও।

হেমপিসি বিপদবুঝে বেরিয়ে এলেন। হ্যাঁরে। এমন ক্যাপামো করছিস কেন বলত? বেশ ঝাঁজিয়েই বললেন হেমপিসি। চাপা গলায় বললেন।

কিঙ্কর বলল, আমি আর এখানে থাকব না। একদণ্ডও না।

বেশ, চল্‌ তবে।

কিঙ্করের হাতটা শক্ত করে ধরে তাকে প্রায় টানতে টানতে পথে এনে বললেন, চল। ঘুরে আসি।

মনে মনে বললেন, ভেঁপো ছোঁড়া! এতদিনের আমার সমস্ত পরিশ্রম আজ তোমার খোকামির জন্যে খুইয়ে বসি আর কি। চ্যাংড়ামির আর জায়গা পেলে না!

তাঁর সেই গোপন লজ্জার রাতটার সব কথা আবার মনে পড়ে গেল। যে রাতে সুন্দরমের কাছ থেকে অন্ধকার সাঁতার দিয়ে কোন মতে তিনি এসে টুলটুলের পাশে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। টুলটুল ঘুমিয়ে ছিল। কিন্তু তার নিঃশ্বাসের শব্দ জেগেছিল।···সব কিছু পণ্ড হতে দেবেন কিঙ্করের খেয়ালের জন্যে? হেমপিসি অত কাঁচা মানুষ নন। আটটি সন্তানের জননী তিনি। তাঁর জানতে কিছুই বাকি নেই এ জগতে।—এই তাঁর বিশ্বাস। তাঁর গর্ব। অপরিপক্ক কিঙ্করের রঙিন জালে-ঢাকা চোখে কি ভাল লাগবে না-লাগবে, তার ওপর টুলটুলের সমস্ত ভবিষ্যত তিনি দায়িত্বহীনার মত ছেড়ে দিতে পারেন না।

—এবং তারপর।

তারপর, সুন্দরম-অসুন্দরমের, হেমপিসি-টুলটুলের মধ্যে বিচার করবার মত তফাৎটা আর খুব সামান্যই বেঁচে থাকে। বিশেষতঃ সুন্দরমের মত মানুষের সামনে।

*　　　*　　　*

না শেখর, এ আমি কিছুতেই ঘটতে দেব না। আমি বেঁচে থাকতে কিছুতেই তুমি নিরপরাধ মানুষের এতবড় সর্বনাশ করতে পারবে না। আগে আমার শরীরে আগুন ধরিয়ে দাও, তারপর ঝালুকপোখরের দিকে এগোও। তার আগে নয়।

শেখর মাথা নিচু করে গম্ভীর হয়ে বসে আছে সামনে। অপরাধীর মত।

সুলতা ঘরময় উত্তেজনায় পায়চারি করছে। তার এমন রূপ শেখর কেন, কেউ সম্প্রতি দেখেছে কিনা সন্দেহ। তার যে অনমনীয়তা দেখে অবিনাশ চিন্তিত হয়ে উঠতো, মাইলের পর মাইল পাহাড়ী পথে অশান্ত অবাধ্য রানীর সওয়ার হয়ে এতটুকু ক্লান্তির ছায়াকে স্পর্শ করতে না দিয়ে ফিরে এসে জেদ ধরে বসতো, না, রানীকে বিক্রী করা চলবে না, এবং যে কঠিনতা দেখে অবিনাশ ভবিষ্যতের সমস্ত বুকটা চিরে চিরেও সুলতার কোন নির্দিষ্ট হদিশ পেতেন না, আজ যেন সুলতা পিতার চরিত্রের ঠিক সেই দৃঢ়তা নিয়েই বহুদিন পর শেখরের সামনে উপস্থিত।

সুলতা আবার বলে, শোন শেখর, আর দশটা কোম্পানীর মালিকদের, আর ঐ পশুর চেয়েও অধম শা জী আর নিবারণের দল, যাদের সঙ্গে এতবড়

সর্বনাশের চক্রান্ত করেছ তাদের সবাইকে জানিয়ে দেবার দায়িত্ব আজ একমাত্র তোমার। আমি তোমাদের পরমারাধ্যা লক্ষীঠাকুরুণের ঘৃণ্য বন্দীশালার ইজ্জতের মোহে লক্ষীর আসল জন্মদাতা এই মানুষদের সর্বনাশ করতে দেব না। যদি দরকার হয়, এর জন্যে প্রকাশ্যে আমি তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বাধ্য হব।

শেখর চমকে উঠে দাঁড়ায়।

স্খলিতকণ্ঠে বলে, কি বলছ তুমি···

তাকে বাধা দিয়ে সুলতা বলে, আমি না জেনে কোন কথা বলছিনা শেখর, সেকথা তুমি বেশ বুঝতে পারছ। কিন্তু বুঝতে পারছ না শুধু এইটুকুই যে, আমি তোমাদের জীবন রক্ষা করার জন্যেই এই পথ নিয়েছি। বাইরে দেখলে, রতন বাসবদের দল অপেক্ষা করছে। আমার কথাতেই তারা উৎসবান্তের ঘুমন্ত গ্রামের কাউকে কোন কথা জানায় নি। না হলে এতক্ষণ সমস্ত ঠিকাদারের বাংলোগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যেত। জানো, কাকাবাবু রতনদের বলেছিলেন সতীনাথকে খবর দিতে। কিন্তু আমি মানা করেছি। তাদের এখানে অপেক্ষা করতে বলেছি।

সতীনাথের নাম শোনবামাত্র শিশু-সুন্দরম যেন এবার কথা ক'য়ে উঠল শেখরের কণ্ঠে। বলল, তুমি নিজে যা খুশি বল, যেমন চিরদিন মেনেছি, মেনে নেব। কিন্তু ঐ লোকটার কথা তুমি বোল না আমার সামনে। আমি সহ্য করতে পারি না।

সুলতা বলে, জানি তোমার মন। তাই এই ব্যবস্থা করেছি। সতীনাথ আজ বাসবদের সঙ্গে গিয়ে গাঁয়ে দাঁড়ালে ঘটনা অন্যরকম হোত। এবং তাতে তোমরাও যেমন রক্ষা পেতে না, তেমনি তাদেরও ক্ষতির কিছু সম্ভাবনা নিশ্চয়ই ছিল।

শেখর একবার বিরক্তিভরা চোখে সুলতার দিকে তাকায়। এমন দৃষ্টি নিয়ে সুলতার মুখের দিকে শেখর কোন দিন তাকাতে সাহস করেনি। আজ সতীনাথের কথা উঠতেই শেখরের সে দুর্বল সংযমের বাঁধ যেন ভেঙ্গে গেল। সাবালক ধূর্ত সুন্দরম এবার কথা ক'য়ে উঠলো শেখরের কণ্ঠে, তুমি শুধু সতীনাথকে রক্ষা করার জন্যেই নিজে এগিয়ে এসেছো, একথা বুঝতে আমার কষ্ট হচ্ছে না মোটেই।

স্থির হয়ে দাঁড়াল সুলতা। বলল, শোন শেখর, তুমি ভুল বুঝেছ।

সত্যকথা বলতে আমার লজ্জাই হচ্ছে। তবু স্বীকার করতে আমায় বাধ্য করছ তুমি। শুধুমাত্র তোমাকে রক্ষা করতেই আমি নিজে এগিয়ে এসেছি আজ সামনে। কেন, সে কথা তুমি বুঝবে না শেখর। কোনদিন বুঝবে না।

আর বলতে পারল না সুলতা।

অবসন্নের মত বসে পড়ল একটা সোফায়। সমস্ত কপাল বিন্দু বিন্দু ঘামে ছেয়ে গেছে সুলতার। মুখমণ্ডল অবদমিত উত্তেজনায় যেন আরক্তিম দেখাচ্ছে ঘরের সামান্য আলোয়।

শেখরের মনে পড়ল শৈশবের কথা। যৌবনের কথা। যে কথা কোন দিন ঘটনায় এত পরিষ্কার হয়ে তার মনে জেগে উঠেছে কি না সন্দেহ। দিদির মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে শেখর। সুলতার গাল বেয়ে জলের ধারা নামছে। না। কপালের ঘাম। চোখ দুটোতো বোজা। বন্ধ চোখ দিয়ে কি জল গড়িয়ে পড়ে ? শেখরের তো তা জানা নেই। তবু ধীরে ধীরে সরে এল শেখর সুলতার খুব কাছে। আরো কাছে চোখ নামিয়ে এনে ভাল করে দেখলে শেখর। অনেকক্ষণ দেখলে।

হঠাৎ দুই হাতে নিজের ভেতরের সুন্দরমের গলা টিপে ধরে তাকে নির্বাক নির্জীব এবং প্রাণহীন করে দিয়ে শেখর যেন হাঁপাতে লাগল। তারও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। চোখ বুঁজতে তবু সাহস হোল না শেখরের। যদি দিদির মত তারও বন্ধ চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে ? অপলক চোখে শেখর অসহায়ের মত সুলতার দিকে চেয়ে সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

বেশ ব্যস্তভাবেই মোহন এসে ঘরে ঢুকে সুলতাকে ঐভাবে বসে থাকতে দেখে কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে ডাকলেন, মা!

সুলতা চোখ খুলে বলল, আমরা আপনার অপেক্ষাতেই ছিলাম। উঠে বলল, চল শেখর। আমাদের সঙ্গে তোমাকেও যেতে হবে।

মোহন ঘরের চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখেন। কই, হেম তো এখানে নেই। কাঁচবাংলার ঘটনাটা তাঁর মনকে অস্থির করে তুলেছিল। কোন উপায় তাঁর হাতে ছিল না। মনে করেছিলেন হেমকে সেখানে পাঠিয়ে দিতে পারলে যেন তিনি একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারবেন। অসহায়তা যখন কর্তব্যকে কেটে-ছেঁটে চারিদিক দিয়ে ছোট করে আনতে থাকে, তখন নিরর্থক জেনেও তাকেই যেন মাত্রাধিক মূল্য দিতে অস্থির হয়ে ওঠে মানুষ। হয়তো এমনিই

হয়। কিন্তু হেম তো এখানে নেই। অপরাধীর মত শেখর দাঁড়িয়ে সুলতার সামনে। বললেন, শেখরের খোঁজেই কাঁচবাংলায় গিয়েছিলাম।

তারপর আর কোন কথা মুখে জোগাল না তাঁর।

সুলতা বলল, আমরা গিয়ে দাঁড়ালেই, আমার বিশ্বাস কাজ হবে কাকাবাবু। তারপর শেখরের দিকে চেয়ে বলে, কি বল শেখর?

উৎসবান্তের মরা-গাঁয়ের অবস্থার সুযোগ নিয়ে সুন্দরমের গোপন পরিকল্পনায় ঠিকাদারের দল নিবারণদের সহায়তায় আজ রাতে গোটা গাঁটা পুড়িয়ে ছাই করে দেবার মতলব করেছে। ঝালুকপোখরের মানুষগুলোর ওপর ওরা অনেক দিন থেকেই ফুঁসে মরছিল। কিন্তু জাগ্রত গ্রামে এমন আঘাত করার সর্বনাশা সাহস তারা আয়ত্ব করতে এতদিন পারে নি। সুন্দরম জানত রতনরা ছোট বাংলা আর সতীনাথের নির্দেশে রুখে দাঁড়াবে। তাতে নিজেদের ক্ষতির সম্ভাবনা কিছু থেকেই যায়। তাই এমন রাতটা বেছে নিয়েছে যখন শরহুলের শেষে গোটা গ্রামটা খালুইয়ের মধ্যে মরা কই-এর ঝাঁকের মত অসাড় হয়ে পড়ে আছে।

শেখর প্রথমটা আপত্তি অবশ্য করেছিল।—না। কাজটা ভাল হবে না।

সুন্দরম বলেছে, সে কি? তোমার না ডজন খানেক বন্দুক আর রাইফেল?

সে যা-ই হোক। কাজটা ভাল হবে না। শাস্তি দিতে চাই যাকে, তাকেই আমরা উচিত শিক্ষা দেব। তাহলেই ওরা আবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কেউ মাথা তুলতে সাহস করবে না।

সুন্দরম প্রশ্ন করে, কার কথা বলছ তুমি? কাকে শাস্তি দিতে চাই?

শেখর চুপ করে থাকে।

সুন্দরমের প্রশ্নের মধ্যে অব্যক্ত থাকলেও, আরেকজনের নামও পরিষ্কার স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। সেকথা শেখর বুঝতে পেরেও আজ আর প্রতিবাদ করতে চায় নি।

প্রায় সারারাত সুলতা শেখর আর মোহনকে নিয়ে পাহারা দিয়ে ঘুরছে জীপ নিয়ে গাঁয়ের চারিধারে। যে রাতটা সতীনাথ আর হেমেন রেঞ্জ কোয়ার্টার্সের ঘেরা বারান্দায় বসে গল্প করে কাটিয়েছিল। সুলতার সঙ্গে বাসব রতনের দলের কয়েকজন ছিল। সবাই আগে নিবারণের আস্তানায় অতর্কিতে হানা দিয়ে বলেছে, সাবধান। চমকে উঠেছে নিবারণ। অবাক হয়েছে। রীতিমত ভয় পেয়েছে সে কাঁচবাংলার মালিক শেখরকে ওদের সঙ্গে দেখে।

নিবারণকে নিয়ে ওরা শা জীর ঘরের সামনে গিয়ে যখন হাজির হল তখন বাখারির মাথায় তেলেভেজা কাপড় জড়ানো আরম্ভ হয়েছে সেখানে।

কিন্তু কোন কাজে লাগল না কিছু। সুলতা বলল, চোরের মত ঘর জ্বালাতে চলেছ তোমরা কার? দিনের আলোয় মোকাবিলা করতো গিয়ে।

শা'জী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। পুরোনো দিনের কাঁচবাংলার সুলতার চেহারাটা জেগে উঠল শা'জীর সামনে।

সংবাদটা গোপন না রাখলে আজ একটা সর্বনাশ ঘটে যেত অবশ্যই। তার হাত থেকে কে বাঁচত আর কে বাঁচত না, কেউ জানে না।

কিন্তু যে মানুষটার পরিকল্পনায় এমন একটা সর্বনাশ ঘটতে যাচ্ছিল, সে তখন কাঁচবাংলা থেকে চোরের মত চুপি চুপি গা ঢাকা দিয়ে অন্ধকার পথেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

গ্রাম পুড়লে জঙ্গল পুড়ত। এবং উদ্দেশ্য সফল হোত দুদিক দিয়েই। অরণ্যবহ্নির ক্ষয় ক্ষতির জন্যে, তাকে প্রতিরোধ করার জন্যে সর্বস্ব পণ করে সতীনাথকে সব দায়িত্ব নিতেই হোত। কোন রেহাই তার ছিল না। শরহুলের নাচ নিয়ে মেতে থাকবে যে রেঞ্জার, জঙ্গলেব আগুন ঠেকাতে ব্যর্থ সে-তো হবেই।

তরুবালার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হেমপিসি যখন কাঁচবাংলার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন কিঙ্করকে সঙ্গে নিয়ে, তখন রাত কিছুটা হয়েছে। জোর করে হরিকে সঙ্গে দিতে চাইছে তরুবালা যতই, হেমপিসি ততই মানা করছেন। বলছেন, কোন দরকার হবে না দিদি। বেশ যেতে পারব।

তার কারণ ছিল। কিন্তু সেটা তো তরুবালার জানবার কথা নয়।

তবু হরি এগিয়ে দিতে চলল লাঠি আর লণ্ঠন হাতে। কাঁচবাংলার কাছে পৌঁছতেই হেম বললেন, এবার তুই ফিরে যা বাবা। আর দরকার হবে না।

হরি ফিরে গেল।

একুশ

সতীনাথ নিজেকে কাজের মধ্যে একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছে। সকাল থেকে সেই গভীর রাত অবধি। সামান্য বিশ্রামেরও আর তার প্রয়োজন হয় না। সেই যে সকালে পোষাক এঁটে তৈরী হয়ে নেয়, প্রায় অর্দ্ধেক রাত অবধি তা থেকে

আর নিজেকে মুক্ত করে না। প্রতিদিন সাত-আট ঘণ্টা জঙ্গলেই কাটায়। একেবারে ক্লান্ত হয়ে না পড়লে পাহাড় থেকে নামে না। দিনের খাবার আর জল সঙ্গেই রাখে। কাউকে সঙ্গে নেয় না। পরিশ্রান্ত সতীনাথ দুপুর গড়িয়ে গেলে গাছের ছায়ায় বসে কিছুক্ষণ। তারপর ঝর্ণার জলে মুখ হাত ধুয়ে নেয়। গাছের তলে বসে আহার শেষ করে। সন্ধ্যার পর কোয়ার্টার্সে ফেরে। বিজলা দূর থেকে দেখে। বেশি কাছে আসে না। কি জানি, কেন সাব্ নিজের ওপর এমন শাস্তির বিধান নিজেই দিয়েছে। এর বেশি কিছু ভাবতে তার সাহসে কুলোয় না।

সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত অবধি আপিসের কাজকর্ম করে সতীনাথ। বিজলা বারান্দায় বসে ঝিমোয়। সায়েবের কাজ শেষ হলে আপিস ঘর বন্ধ করে সতীনাথের পিছু-পিছু কোয়ার্টার্সে ফিরে আসে। পোষাক বদলে গোসলখানায় গিয়ে দেখে সতীনাথ ঠাণ্ডা-গরম জল ঠিক তেমনিই তৈরি। টেবিলে এসে বসলে দেখতে পায় ধীরে ধীরে ঢাকা খুলে খাবার দিচ্ছে বিজলা। চেয়ে দেখে, ঘরের কোণে তেমনি ধূপকাঠির গোছা পুড়ে ছাই হচ্ছে। বিছানা পাতা। যেমন প্রথম দিন ছিল। কোন পরিবর্তন হয় নি বিজলার কাজের। নিঃশব্দে রুটিন মাফিক সব সে ঠিক তেমনি করে যায়।

হেমেন চলে যাবার পর সতীনাথেব এই পবিবর্তন আর কারো চোখে পড়েছে কি না জানা যায় নি। কিন্তু বিজলার চোখকে ফাঁকি দেয়া যায় নি।

সতীনাথ ক'দিন আর কোথাও যায় না।

কে জানে, মোহনও আর এদিকে আসছেন না কেন। বাসব রতন-রা হয়তো শবছলের পর কাজ নিয়ে তারই মত ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। কোম্পানীর কাজ হলেও কাজ। মোহন তাই হয়তো সময় পান না।

নিজের চেয়ে নিজের বড় বিচারক আর কে আছে জগতে ?

বিছানায় শুয়ে সতীনাথ যতবার বইয়ের পাতায় মন দিতে যায়, ততবারই কথাটা মনে পড়ে। হেমেন বলেছিল, নিজের কাছে নিজেকে ধরা দাও সতীনাথ, তাছাড়া কোথাও মুক্তি নেই।

সতীনাথ বিজলাকে ডাক দিল। বলল, বিছানাটা বারান্দায় করে দে'তো। ঘরে গরম।

বিজলা একটু চিন্তিত হল। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

কি রে, ঘুমিয়ে পড়েছিলি বুঝি ?

না।

বিজলা বিছানার কাছে এগিয়ে আসে।

তবে ?

রাতে একা ওখানে শোওয়া কি ঠিক হবে ?

কেন হবে না ? তুই নিয়ে চল।

আর কথা বাড়াবার সাহস হোল না বিজলার। খাটটা এনে ঘেরা বারান্দায় পেতে বিছানা করে মশারি টানিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

যা তুই। শো গে যা। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিস।

মাথা নিচু করে বিজলা বলল, আমিও বারান্দায় একপাশে শোব।

সতীনাথ তার মনের কথা বুঝল। হেসে বলল, না রে, না। বাঘ ভালুকে আমাকে খাবে না। তুই ভয় পাস না।

বিজলা সে কথায কান না দিয়ে নিজের চট-জড়ানো বিছানাটা এনে ঘেরা বারান্দার এক কোণে ছোট করে পেতে প্রায় কুণ্ডুলি পাকিয়ে পড়ে রইল।

সতীনাথ সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে নিঃশব্দে সামান্য একটু হেসে আপন মনেই বলল, পাগল কোথাকার।

হেমেন ঠিকই বলত বিশ্বাস না ভাঙলে ওরা অবিশ্বাস করে না। এতদিনে সতীনাথও যে না বুঝছে তা নয়, তবে তার জীবনের অনেক অক্ষমতার মত, অনেক অপূর্ণতার মত এখনও এসব সত্য যেন ঠিক মত তার কাছে স্থায়ীভাবে ধরা দেয় না।

সতীনাথ ভুলতে পারে না, মোহন মিত্র তাকে কতখানি প্রভাবিত করেছে। কিন্তু মোহনমিত্র হওয়া তো সহজ নয়। যদি হতে পারত, তবে অনেক অহেতুক যন্ত্রনা থেকে সে অনেক সহজে মোহন মিত্রের মত রেহাই পেতে পারত। চাকরী জীবনটা লোকটার সফল হয়ত হয়নি। কিন্তু সে ক্ষতি স্বেচ্ছায় হাসিমুখে সয়ে আর যত লাভের কড়ি লোকটা কুড়িয়ে সঞ্চয় করেছে, অতিবড় সফল চাকুরিয়াদের কাছেও সেসব চিরদিনের ঈর্ষার সম্পদ হয়ে থাকবে। একথা সতীনাথ জানে। অন্যায়ের সঙ্গে মেকীবাজীর সঙ্গে আপোষ করেননি তিনি। তারই পুরস্কার পেতে হয়েছে পদে পদে। ওপরওয়ালাদের মুখোস খুলে দিয়েছেন নির্মম ভাবে। তার পুরষ্কার পেয়েছেন অপমানে লাঞ্ছনায়। বদলীর পর বদলী

হয়েছেন। যেখানে জল হাওয়া সবচেয়ে খারাপ, যেখানে গেলে রোগে যন্ত্রনায় এক ফোঁটা জল, একটু সেবা সহায়তা পাওয়ার কোন আশা নেই, বেছে বেছে সেইসব এলাকায় বার বার বদলী করা হয়েছে মোহন মিত্রকে। তবু পরাজিত হন নি তিনি। কত গল্প শুনিয়েছেন এই সব অবিচার আর জুলুমের। তবু হাসি তাঁর ফুরোয় নি কোন দিন। কোন অভিযোগ কারো ওপর তাঁর নেই। অদ্ভুত সে মানুষটা। অভিমান করতে জানে না। মনে হয়, জীবনের একটা পথ দিয়ে মাথা উঁচু করে বিজয়ী বীরের মতই তিনি হেঁটে গেলেন। পথের কোন বাধাই, কাঁটার কোন ঘা তাঁকে নিরস্ত নিরুদ্দম নিরুৎসাহ করতে পারলে না।

আর সুলতা।

অতি সুখে পালিতা হয়েও নিজের জীবনেব যে পথটা সে স্থির করে নিয়েছে, তা থেকে তাকে কোন প্রলোভন কোন আকাঙ্খা এতটুকু সরিয়ে আন.ত পারল না। বনকন্যার গর্বই তাব যেন সব চাইতে বড় ভূষণ। তার সামনে অন্য যে-কোন লোভ-লালসা অতি তুচ্ছ, অতি সামান্য। হেলায় সে সব কিছু ত্যাগ করে চলে যায়। জীবনের ঃ ক কবে নেওয়া পথের বিনিময়ে কোন সুখ্যাতি কোন লোভকে যেন আমল দিতে শেখেনি। প্রথম যে দিন দেখে সতীনাথ সুলতাকে, অবাক হয়তো হয়নি ততটা। কিন্তু যত দিন গেছে, যত গল্প কথা শুনেছে সতীনাথ আর যতবার তাকে দেখেছে তার কাজের মধ্যে দিয়ে, ততই নিজের অজ্ঞাতেই কাছে সবে এসেছে সতীনাথ। কিন্তু বাইরে জোর গলায় কেবলি অস্বীকার করে চলেছে। কারণ জীবনের পথ যে তার আজো স্থির করে নেয়া হোল না। তাই নিজের কাছে নিজকে অস্বীকার না কোরে উপায় থাকে না।

মোহন মিত্রের বাড়ীতে বহুবার দেখেছে সতীনাথ সুলতাকে। সহজ ভাবে কত কথাই হয়েছে। মনে যে দাগ পড়ত, অনেক ক্লেশে তা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে নিজেকে আরো যেন বিভ্রান্ত আরো অস্বাভাবিক করে তুলত। লক্ষ্য করেছে সুলতার মধ্যে একটিবারের জন্যেও কোন বিভ্রান্তি দেখা দেয় নি। প্রথম দিনও যেমন সহজ ছিল সে, শরহুলের উৎসবেও তার এতটুকু ব্যতিক্রম কোথাও প্রকাশ পায়নি। মোহন মিত্র সুলতাকে নিজের মেয়ে বলে প্রকাশ করে থাকেন। মোহন মিত্রের সে অধিকার ষোল আনা আছে। দুজনের চরিত্রের এই অভিন্নতা উভয়ের পক্ষেই গর্ব করার জিনিষ। কিন্তু সতীনাথের কি আছে?

নিজেকে নিঃস্ব করে ভাবতে আজ একটু তৃপ্তি পাচ্ছে সতীনাথ। কিন্তু এই

নিঃস্বতা ভরিয়ে তোলার সম্পদ যেমন সুলতা মোহন মিত্ররা আহরণ করে নিয়ে পরিপূর্ণ হয়েছেন, সে তেমন পারল না কেন? নিঃস্বতার জন্যে কোন ক্ষোভ আজ নেই সতীনাথের, কিন্তু অক্ষমতার জন্যে জেগে উঠেছে অসহ এক জ্বালা তার মনে। কোথায় গিয়ে তার এই নিঃস্বতার ভার সে লাঘব করবে? এ যে কি বিষম জ্বালা, একমাত্র এমন করে বিফলতার হাটে নিজেকে যে হারিয়ে ফেলে কেবল নিরর্থক খুঁজে মরে, সে-ই শুধু অনুভব করতে পারে। পরশ পাথর খোঁজার পালা তার কোন দিনও আর শেষ হয় না।

অথচ আশ্চর্য। মোহন সুলতা সম্বন্ধে সতীনাথের আরেক দিনের চিন্তা আজ থেকে কত ভিন্ন ছিল। সেটা একেবারেই বাইরের জিনিষ হলেও, ছিল। অস্থির মন যখন সত্যকে চিনতে না পেরে কেবলই তার চারপাশে ছুটে ক্লান্ত হয়, তখন এমনই হয়।

কেন যেন আবাব মনে হয়, বেঁচে থাক ঝালুকপোখরের অরণ্যঅঞ্চল। বেঁচে থাক বাসব রতন। মোহন মিত্র সুলতা তরুবালা। কিন্তু এদের কাছ থেকে হারিয়ে যেতে কেন মন চাইছে আজ ক'দিন? হারিয়ে গিয়ে ওদের আঘাতের শাস্তি দিতে চায় কেন? সতীনাথ এদের এত ভালবেসেও আজ শাস্তি দিতে চায় নিজেকে সরিয়ে নিয়ে। তাই কাজের মাঝে নিজেকে নিষ্ঠুরভাবে ডুবিয়ে দিয়েছে কয়েকদিন। সারাটা দিন, সেই সকাল থেকে, জঙ্গলে কাজ করে ফেরে সেই সন্ধ্যা গড়িয়ে গেলে। তারপব নিয়ে বসে অপিসের কাগজপত্র। কোন দিকে তার যেন কোন হুঁশ্ নেই। বিজলা বারান্দায় বসে ঝিমোয়।

আজ কিন্তু বিজলা ঐ কোনে নিশ্চিন্তে বেশ ঘুমোচ্ছে। সতীনাথের পরিবর্তনে কোথাও একজনেরও কোন ভাবান্তর ঘটাতে পারেনি দেখে কেমন একটা অসহায় বেদনা সে অনুভব করে নিজের মনে। নিজে হারিয়ে গিয়ে শাস্তি আঘাত সে কাকে দিতে চায়? কাকে দেবে?

হারানো মন এমনি করেই একটা মন খোঁজে। একটুখানি মনের আশ্রয় খোঁজে।

সেদিন সকালে সতীনাথের আর জঙ্গলে বেরোবার তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। শুয়ে গড়িয়ে বেশ বেলাতেই শয্যাত্যাগ করল। উদ্দেশ্যহীনভাবে বাগানে বেড়াল কিছুক্ষণ। আপিসের 'ডাক' এসে পড়ে আছে গত ক'দিন। অলস মন নিয়ে সেইগুলোই দেখতে লাগল সতীনাথ ঘরে বসেই। একটা চিঠিতে যেন

একটু বেশিক্ষণ মনোনিবেশ করছে সতীনাথ। মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে রেখে আবার ভাল করে পড়ল চিঠিটা। তারপর আপন মনেই একটু শুক্‌নো হাসি হাসল। পাইপটা মুখে দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে রইল সতীনাথ অন্যমনস্কভাবে। রেঞ্জকোয়ার্টার্সের বাইরে যে মেঠো পথটা এতদিন তাকে কেবল হাতছানি দিয়ে ডেকে গোলাপ বাগানের কাছে নিয়ে এসে হাজির করিয়ে দিত, সেই পথটা বাইরে কতদূরে কোথায় গিয়ে মিশেছে এখান থেকে ঠিক ঠাহর করা যায় না। এই পথ দিয়েই একদিন মোহনমিত্র রেঞ্জঅপিস ছেড়ে যাবার সময় বারবার ফিরে-ফিরে চেয়ে দেখছিলেন। যে পথটা এনে পৌঁছে দিয়েছিল সতীনাথকে এই ঝালুকপোখরের রেঞ্জে।

চিঠিটা আবার তুলে নিল সতীনাথ।

না। কোন ভুল নেই। দয়াল প্রসাদের আক্রোশভরা মুখখানা যেন স্পষ্ট ভেসে উঠছে চিঠিটার বুকের ওপর। নির্দেশ এসেছে, সতীনাথ যেন এক সপ্তাহের মধ্যে বড় আপিশে গিয়ে হাজির হয়। ম্যাপের কিছু কাজ দেখে শেষ করে যেতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। কাজটা শেষ করতে মাস দুই সময় লাগতে পারে। তাই হুকুম আছে, সিনিয়র ডেপুটি রেঞ্জার মিঃ ডেম্‌টার হাতে অস্থায়ীভাবে রেঞ্জের চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে সতীনাথ যেন রাঁচী অপিসে গিয়ে রিপোর্ট করে।

সামান্য চিন্তার আবছা রেখা ফুটে উঠল সতীনাথের চোখে-মুখে। মনটা ফিরে গেল কয়েক বছর অতীতে। পাইপের ধোঁয়ায় ঘরটা যেন ধীরে ধীরে ভরে উঠল।

এখানকার কাজ শেষ করার কাজে উঠে-পড়ে লেগে গেলো সতীনাথ দ্বিগুণ উৎসাহে।

একের পর এক লোক আসছে। কাজ শেষ না করে উঠতে পারে না সে। অপিস ঘরে আজ বেজায় ভীড়। কার পারমিট, কার টি. এ. বিল, কার ওয়ার্ক অর্ডার, কোন চিঠির জবাব দেওয়া জরুরী ছিল, সব নিয়ে বসেছে সতীনাথ টেবিল পরিষ্কার করে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে।

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হোল। তবু তার খেয়াল নেই।

ডেমটাকে ডেকে পাঠাল সতীনাথ।

বলল, মিঃ ডেমটা, হেড অপিশের চিঠি এসেছে। জরুরী কতকগুলো

Contour map এর কাজে আমাকে রাঁচী যেতে হচ্ছে। আপনি duel charge এ থাকবেন। কাগজপত্র দেখে নিন। এই নিন চিঠি।

ডেমটা সাহেব মনে মনে হাসে। এই যাওয়াই তোমার শেষ যাওয়া রেঞ্জার সাহেব। আর বোধহয় ফিরে আসবার সুযোগ তুমি পাবে না। আমরা সব জানি। হবে না? এত গর্ব, এত গরম তোমার? পাইপে দাঁত চেপে পুরোন ঠিকেদারদের তুমি শাসাবে, চোখ রাঙ্গাবে। ওপরওয়ালাকে রুলের গুঁতো মারতে যাবে। রাতের পর রাত শরহুলের নাচ দেখবে। কানুনের বুলি কপ্‌চাবে আর জঙ্গলচোরদের ঘরের মেয়েমানুষের লোভে তাদের রেহাই দেবে। আমাদের ছা-পোষা চাগ্‌রেদের দুপয়সা আউট্‌-ইন্‌কামের বাড়াভাতে ছাই দেবে। তোমার আর মেয়াদ কদ্দিন? এটুকু বোঝবার জন্যে ডেম্‌টার মত পাকা লোকের 'ডেরাডুন-ট্রেনিং'-এ যেতে হয় না।

মুখে বলল, কাগজপত্র আর কি দেখে নেবো স্যার্‌? আপনার কাজ। কোথাও ভুল-চুক্‌ থাকবার কি আর জো আছে?

মনে মনে বলে, একবার পাকাভাবে অফিসিয়েটিং-এর সুযোগ পাই, তারপর আর আমায় ঠেকায় কে? এখনো সাতবছর চাগ্‌রি। তারপর চাই-কি দুটো এক্‌স্‌টেনসন্‌ও পেতে পারি। আমরা আদিবাসী। তোমাদের মত যাট বছরেই শরীর কাঁপে না আমাদের। ডি-এফ-ও হয়ে পেনশান্‌ নেব। এ তুমি দেখে নিও।

একটু আম্‌তা-আম্‌তা করে বলে ডেমটা,—একটা কথা বলব স্যর্‌?

বলুন।

দুহাত কচ্‌লে বলে ডেম্‌টা—আপনার যদি অসুবিধে হয়, তাহলে বলতে চাই না।

এই অহেতুক বিনয় সতীনাথ সইতে পারে না কোনদিন। তার ওপর লোকটাকে হাড়ে-হাড়ে চেনে। পালোয়ান ঘুষ্‌খোর আর মুফৎখোর। চাকরির জীবনে গোটা পরিবার নিয়ে কোন দিন মাইনের পয়সায় খায়নি লোকটা। ডিম দুধ চাল তরিতরকারি থেকে আরম্ভ করে গাঁয়ের মানুষদের কাছ থেকে সব জোগাড় করে চালিয়েছে। তার ওপর ঠিকেদারদের চুরির সহায়তা করায় মাসিক বাঁধা ছিল টাকার মোটা অঙ্ক। সতীনাথ আসবার পর থেকে সে সব পথ বন্ধ হওয়ায় ভেতরে ভেতরে লোকটা যেন খাপি খাচ্ছিল। এইবার

তার প্রাণ ফিরে এল যেন। জিজ্ঞাসু চোখে তার দিকে সতীনাথকে চেয়ে থাকতে দেখে ডেমটা বিগলিত কণ্ঠে বলল, আমার শ্বাশুড়ী এয়েছেন স্যার্। কথাটার অর্থ বুঝতে পারে না সতীনাথ। অফিসিয়াল কথায় ডেমটার শ্বাশুড়ীর কি সম্পর্ক থাকতে পারে বোঝা মুস্কিল।

তাহলে খুলেই বলি স্যর্। আমার কোয়াটারটা বড্ড ছোট। আপনি কি উইথ-ফ্যামিলি চলে যাচ্ছেন স্যর্ ?

রাগে সমস্ত শরীর জ্বলে উঠল সতীনাথের।

হুকুমের স্বরে বলল, পাশের অপিস কামরায় কাল থেকে বসে কাজ করবেন। যেতে পারেন এখন।

সেলাম করে দ্রুতপায়ে ডেমটা বাইরে বেরিয়ে গেল। মনে মনে রাগ ফেটে পড়তে লাগল সতীনাথের ওপর। মস্ত সায়েব হয়েছ, না ? এখনো তোমার রোয়াব যায় নি! আচ্ছা লোক তো ? ভাঙে তবু মচকায় না ? যাওনা হেড অপিস। আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে তোমার। শালা, সম্মান দেখিয়ে ফ্যামিলি বললাম, তবুও ঘাড়-বাঁকা ? লাটেশ্বর বড়লাট। তোয়াজ পেয়েও তেড়িয়া। আরে, থাকবার মধ্যে তো একটা তোবঙ্গ আর বেছ্না। বলি কি করে ? তাই ফ্যামিলি বললাম, তাতে আবার ক্রোধ ? ফ্যামিলি নিয়ে যাওয়া মানে চাটি-বাটি তুলে নিয়ে যাওয়া, এটা বোঝ না ?

পরদিন বিকেলে মোহন মিত্র এসে বললেন, আজ যে বড় অসময়ে বাসায় রয়েছ সতীনাথ ?

অসময় ?

হ্যাঁ। এমন সময় তো তোমাকে আজকাল খুঁজেই পাওয়া ভার। সকালে নেই, দুপুরে নেই, বিকেলে নেই, সন্ধ্যায় নেই, ব্যাপারটা কি বলত ?

সতীনাথের ভুল ভাঙল।

তার ধারণা ছিল, আর কেউ তার খোঁজ রাখে না। সবাই নিজের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাই সে-ও দিবারাত্র ব্যস্ততার মধ্যেই ডুব দিয়ে হারিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে চলছিল। এখন বুঝল, মোহন মিত্র তার খোঁজ রাখবার চেষ্টা করেছেন।

বলল, একেবারে কোনদিনই নেই-এর ভূমিকা রচনা করে রাখছি, যাতে তেমন হলে নিজেও সইতে পারি, আর আপনাদেরও গায়ে না লাগে।

মোহন মিত্র ভাল করে সতীনাথের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর একখানা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললেন, আমরা ভাবছি লোকটার হোল কি? বিজলা তোমায় বলেনি কিছু?

না। ও আজকাল কিছু বলে না।

মোহন বলেন, বুঝেছি। জগত শুদ্ধ সকলের ওপর অভিমান করে বসে আছ।

—আপনাকে অনুসরণ করার চেষ্টাই আমার একমাত্র সাধনা হয়ে উঠুক। অভিমান যেমন আপনার রক্তে নেই, তেমনি আমিও সেটা ধুয়ে ফেলার চেষ্টায় আছি।

মোহন মিত্র বললেন, নাও, ওঠ দেখি। একটিবার নিজেও গেলে না এ-ক'দিন। যখনই আসি, তুমি নেই।

সতীনাথ সামান্য হেসে বলল, এবার একেবারেই 'নেই' হব। তখনও কি খুঁজবেন আমাকে?

সতীনাথের মনে পড়ল, মোহন একদিন ঠিক এই রকম এক প্রশ্ন করেছিল তাকে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে। তাই উত্তরটা কেমন হয় শোনবার জন্যে অপেক্ষা করে রইল।

মোহন মিত্র চুপ করে রয়েছেন দেখে সতীনাথ বড় অপিসের চিঠিটা তাঁর সামনে এগিয়ে দিয়ে বিজলাকে ডেকে চা করতে আদেশ দিল।

পাইপটা নতুন করে সেজে টানতে লাগল। কিন্তু যা মনে করেছিল তেমন ভাবান্তর মোহন মিত্রের মোটেই ঘটলো না। চিঠিটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, গাড়ীর মিস্ত্রির কাজটা তোমার জানা থাকলে এমন চিঠি তোমার আসত না সতীনাথ। কিন্তু তা যখন তুমি হতে পারনি তখন এসবের জন্যে তৈরী হয়েই আসরে নামতে হবে।

ভাবনা কি? তুনিয়াটা অনেক বড় জায়গা। এখন ওঠ দেখি। চল।

চা-পান শেষ করে তুজনে বেরোলেন।

মোহন বললেন, বলেছিলাম না, তোমার চাকরির জীবন সুখের না-ও হতে পারে?

সতীনাথ নিঃশব্দে পথ হাঁটছে।

মোহন তার মনের কথাটাই যেন টেনে নিয়ে বললেন, বলতে পার, আমারো তা হয় নি।

কিন্তু আমি সেটা মেনে নিয়ে প্রস্তুত হয়েই আসরে নেমেছিলাম। তাই, কোন কিছুতেই অপ্রস্তুত হইনি আমি কোনদিন। তুমি দুঃখ পাচ্ছ কেন?

সতীনাথ কোন উত্তর দিতে পারল না।

নিজের অজ্ঞাতে ঝালুকপোখরকে এতখানি আপনার করে ভালবেসে ফেলেছিল সে, টের পায়নি এতদিন। কিন্তু বদলীর চাকুরেদের অত সেন্টিমেন্টাল্ হলে চলে না বলে হাজারবার বোঝাবার চেষ্টা করেও যেন বারবার হার মানছে সে। বুঝতে পারছে, এখানকার জীবনের সঙ্গে কেমন করে নিজেকে সে এতখানি জড়িয়ে ফেলেছিল।

তরুবালা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ছেড়ে দাও এমন সব চাকরি। যেখানে মানুষের এতটুকু দাম নেই, সেখানে চাকরি করে লাভ কি? সারাটা জীবন এঁরও তো অবস্থা দেখলাম।

সতীনাথ হাসল। বলল, সেকথা যে একেবারে আমি না ভাবছি তা নয় বৌদি। কিন্তু গোলামীতে নিজের দাম সম্বন্ধে সচেতন থাকাটা স্বাভাবিক কিনা, তাও ভাবছি।

সুলতা চুপ করেই ছিল। ভাবছিল, লোকটা জানেও না, তাকে আরো বড় বিপদে ফেলার কত বড় হীন চক্রান্ত সেদিন করা হয়েছিল। নিজের এলাকার জঙ্গল পুড়ে ছাই হলে তাকে জবাবদিহি করতে হোত। শাস্তি পেতে হোত কর্তব্যে অবহেলার জন্যে। সে ঘটনার কথাটা আজো সুলতা আড়াল করে গেল। মোহন সে কথা উত্থাপনই করলেন না।

দুঃখ বাজল সুলতার। যেমন বেজেছিল আরেক দিন, যখন এই সতীনাথ ছেলেমানুষি বশে তাকে রেঞ্জ আপিসে ঠিকাদারের মত ডেকে আনার জন্যে পেয়াদা পাঠিয়েছিল। কিন্তু সেই মানুষটা যে ঝালুকপোখরের জীর্ণ জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ঠিক তারই মত সব অমঙ্গলকে দুহাতে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করে এসেছে সেই প্রথম দিন থেকে, একথা সুলতা কোনদিন ভুলতে পারেনি। বরং মোহনমিত্রের পর সে সব কারণে এত খানি শ্রদ্ধা সতীনাথ ছাড়া আর কেউ সুলতার মনে জাগাতে পারেনি, এই অনুভব টুকু তার মনে অনেক শক্তি জুগিয়ে

এসেছে। সে যে একা নয়, আরো একজন আছে, কেমন করে অজ্ঞাতে এই বিশ্বাস সুলতার মনে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তরই হয়ে উঠেছে। এই খানে সে সতীনাথকে পরোক্ষ দোসর রূপে পেয়ে কৃতার্থ হয়েছে। কথায় প্রকাশ না করলেও অন্তরে তার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। তাই, কাঁচ বাংলার অপকর্মের জন্যে বার বার যখন সতীনাথের হাত থেকে শাস্তি নেমে এসেছে, ফাইনের পর ফাইন হয়েছে, তাকে সে আশীর্বাদ মনে করেই প্রতিবার স্বাগত জানিয়েছে। সতীনাথের তা জানবার কথা নয়। জানাতে চেষ্টা করে একবার মাত্র বলেছিল সুলতা, আপনার কোন অন্যায় হয়নি। আমাদের অন্যায়ের কোন পরিমাপ হয় না। শেখর সুন্দরমের দল সতীনাথের এ-হেন আদেশগুলোকে শত্রুতার প্রকাশ বলে যে ভুল করেছে, সুলতা সে ভুলের শরিক হতে প্রথম দিন থেকেই অস্বীকার করেছে। এবং অনেক দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে শুধু মাত্র এই কারণে ছোট বাংলায় উঠে আসতে পেরেছিল সকল কর্তৃত্ব ছেড়ে দিয়ে, যে আর যাই হোক, সবকারী অন্ধতায় কাঁচ বংলার আর কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। শেখর সুন্দরম অন্যায়ের পথে গিয়ে যদি কাঁচবাংলাকে ধ্বংস করেই বসে, সে অবস্থা যেমন সব কর্তৃত্বের লাগাম হাতে নিয়েও তার পক্ষে ঠেকিয়ে রাখা কাঁচবাংলায় থেকেও সম্ভব হোত না, ছোট বাংলা থেকেও হবে না। অবস্থাটা গভীর ভাবে বিচার করে দেখতে গেলে দেখা যাবে পরম নিশ্চিন্তভরে কাঁচবাংলার সমস্ত ভবিষ্যত সুলতা যেন সতীনাথের হাতেই সঁপে দিয়ে ছোটবাংলায় উঠে এসেছিল। শেখর ভুল বুঝল। সুন্দরম তাই চেয়েছিল। শেখরের ভুলই সুন্দরমের মূলধন। সে সব দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে সুলতা যেন নিজের কাছে নিজেকে ফিরে পেয়ে বুকভরে শান্তির নিঃশ্বাস নিতে পেরেছে এবং এই মুক্তির জন্যে সুলতা যেন সতীনাথের কাছেই কৃতজ্ঞ।

সুলতা বলল, আপনার কি হোল জানিনা, কিন্তু আমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেল সতীনাথবাবু।

সতীনাথ বলে, আমি থাকতে আপনাদের কোন লাভের কাজেই তো আসিনি। বরং ক্রমাগত ক্ষতিই করে গেছি। এবার আপনারা দুষ্টগ্রহকে সরিয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে পারবেন। একটার বদলে শতশত কাঁচবাংলা গড়ে তুলতে পারবেন।

সতীনাথ মনে করেছিল, তার এই আঘাত সুলতাকে একটু

বেদনাহত করবে। সতীনাথ তৃপ্তি পাবে। কিন্তু ফল হল ঠিক বিপরীত।

সুলতা হেসে জবাব দিল, ঠিক বলেছেন। নতুন নতুন কাঁচবাংলা গড়ে তোলার ঠিকেদারিটা কিন্তু আপনাকেই নিতে হবে।

মোহন মিত্র বলেন, সতীনাথ তুমি চাকরি এবার নির্ভয়ে ছেড়ে দিতে পার। আয়ের পথ তোমার পাকা হয়ে রইল। কি বল? মনে ধরল তো?

লক্ষ্যভ্রষ্ট কথার বাণ ফিরে এসে সতীনাথকেই যেন একটু ম্লান করে দিলে।

* * *

এতদিনের স্বপ্ন আর মমতা দিয়ে যে সাধের তাজমহল মনে মনে গড়ে তুলেছিল সতীনাথ নিজের অজ্ঞাতেই, সে সত্য যাবার কালে তার কাছে প্রথমবার আজ যেন স্পষ্ট ধরা দিল সমর্পিত অপরাধীর মত।

ক'দিন আগেও নিজেকে কাজের মধ্যে হারিয়ে দেওয়ার এক ব্যর্থ চেষ্টায় দিন কাটিয়েছে সতীনাথ। সে পথেও কাউকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে না পেরে এক সময় ভেবেছে, আর একদিনও এখানে নয়। এখানকার বনজঙ্গল. আকাশ বাতাস, মানুষ ঠিকাদার, সব কিছু অহরহ যেন তার নিষ্ফলতাকে ব্যঙ্গ করে ফিরছে। নতুন আলো বাতাসের জন্য বুকটা তার অস্থির·হয়ে উঠেছে। কিন্তু আজ যখন তার ফিরে যাবার পরোয়ানা এসে হাজির হয়ে তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, সতীনাথ, তুমি নিজেকে হারিয়ে অপরের যে ব্যথার সৃষ্টি করবে বলে কল্পনা বিলাসে এমন স্বার্থপরের মত মশগুল্ হয়েছিলে, এই নাও, তোমার সেই অতিবাঞ্ছিত অবকাশ এবার আমি ব'য়ে এনেছি তোমার দুয়ারে, একেবারে সহজ নাগালের মধ্যে, আমাকে পুরস্কৃত কর,—তখন সতীনাথ যেন সম্বিত ফিরে পেল। কর্মব্যস্ত জীবনে প্রতিদিনের পথ-চলায় যাদের কোন বিশেষ আকর্ষণ সতীনাথ অনুভব করেনি, করলেও নিজের কাছে স্বীকার করেনি, শত তুচ্ছ হয়েও আজ যাবার বেলা কেন তারা এমন করে পিছু টানে? কেন পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরে?

জীবনে কোন কিছুই মানুষ স্বেচ্ছায়, প্রসন্নচিত্তে ত্যাগ করে যেতে রাজি নয়। কল্পিত অভিমানে মাত্র সেদিন যে-স্থান তার কাছে অসহ্য বলে মনে হয়েছে, ঠিক যাবার কালে তাকে আবার কেন বড় আপন বলে মনে হয়? যাত্রা-পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে বিচ্ছেদ কেন অশ্রু সজল হয়ে উঠতে চায়? এই পথ, এই সুবিস্তৃত

বনাঞ্চল, ঝালুকপোখর গাঁয়ের ঐ সারি সারি মাটির তুচ্ছ কুটির, ঐ দূরের মাঠে অপরিচিত কৃষক বালক, গাছের ওপর বুনো মোরগের ঝাঁক, সেই গাছের ডালে পাখীর আধ-ভাঙ্গা একটা বাসা, দুর্বল বাহু দিয়ে কোনমতে আল্‌গোছে গাছের শাখা জড়িয়ে ধরে তবু এখনও টিঁকে থাকার নিষ্ফল প্রার্থনা জানাচ্ছে, এরা আজ সবাই তার কাছে যেন কতো কালের চেনা।

ঐ যে পায়ে-হাঁটা সরু পথ-রেখা এঁকে-বেঁকে আবছা হয়ে মিশে গেছে অচেনা দিগন্তে, ওর সঙ্গে যেন সতীনাথের কতো জন্মের পরিচয়। ওপথের শেষ কোথায়, তা হয়তো জানে না সে। কিন্তু ওপথের চিরপুরাতন বোবা ইতিহাস তার প্রাণে সহস্রমুখে আজ কথা ক'য়ে উঠছে কেন? কেন মনে হয়, এখানকার প্রতিটি মুখর গাছপালা এখানকার ধূলিকণাটুকুও সত্য হয়ে চিরকালের হয়ে বেঁচে থাক তার জীবনে?

এ প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? যে মন তার সঠিক উত্তর জানে, তার কাছেই আজ সতীনাথ নিজের অপূর্ণ এই জীবনটা নিবেদন করতে উন্মুখ হয়ে আছে।

ফিরে এসে সতীনাথ দেখল বিজলার কাজের কোন পরিবর্তন হয়নি। গোলাপ বাগানের সামনে হেলান দেওয়া চেয়ারটা পাতা। অদূরে টেবিলের ওপর পেট্রোম্যাক্সের আলো জেলে রেখে অপেক্ষায় বসে আছে বিজলা।

চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে পাইপ সেজে একমনে টানতে থাকে সতীনাথ।

কিছুক্ষণ পর বলে, আলোটা সরিয়ে নিয়ে যা বিজলা।

বিজলা আদেশ পালন করে কোয়ার্টার্সের ভেতরে চলে গেল। বুঝল, সতীনাথ একা থাকতে চায়।

আলো যেন অসহ্য ঠেকছে সতীনাথের চোখে। আলোর সামনে নিজেকে সঙ্কুচিত মনে হচ্ছে। তারায় ভরা আকাশটাকেও অসহ্য লাগছে। ঝালুক পোখরের ব্যর্থ দিনগুলো যেন আকাশের লক্ষ নক্ষত্রের মত তার দিকে চেয়ে চোখটিপে মিটি মিটি হাসছে,—বিদ্রূপের হাসি। সতীনাথের ইচ্ছে করছে দুই হাতে সমস্ত তারাগুলো মুছে দিয়ে গোটা আকাশটাকে অন্ধকারে ডুবিয়ে ভেতর-বাহির সব একাকার করে দিতে।

কতক্ষণ এমনভাবে কাটল সতীনাথ টের পায় নি। বিজলাও খাওয়া-শোয়ার জন্যে আর বিরক্ত করতে আসে নি।

হঠাৎ যেন চমকে উঠল সতীনাথ, একি? আপনি?

স্থির কণ্ঠে যেন জবাব দিল সুলতা, হ্যাঁ। আমি। চিনতে পারছেন না?

সতীনাথ উঠে দাঁড়াল। নিজের আসনটি দেখিয়ে বলল, বসুন।

না। আমি বসতে আসিনি। আপনি বসুন।

—আর আপনি?

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে সুলতা বলল, অপবাদের যে বোঝা আপনার মাথায় তুলে দিয়ে আজ বিদায় করে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে, সেটা পাকা হোক। সকলে জানুক, আমি নিজেই আপনার কাছে এসেছি।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল সতীনাথ।

অন্ধকারে কিছুটা অস্পষ্ট দেখাচ্ছে সুলতাকে। কিন্তু ঐ সুঠাম দেহ তো ভুল হবার জিনিষ নয়। আর ঐ কণ্ঠস্বর।

সুলতা বলে, আপনি আমার অনেক ভরসা ছিলেন।

কেন, দাদা তো রইলেন।

তা রইলেন। কিন্তু সে ক্ষমতা তো তাঁর আজ নেই। ছিল একদিন। সেদিন তিনিই আমায় পথ দেখিয়েছিলেন। যাঁর সাহস আর সহযোগিতার বলে আজ আমি এতটা পথ চলে এসেছি। তারপর আপনি এলেন, আপনার সংযত মনের আর কর্তব্যনিষ্ঠার একের পর এক প্রমাণ পেলাম। আর দেখলাম এ অজ্ঞান মানুষদের প্রতি আপনার সহজাত দরদ। ভরসা পেলাম।

সতীনাথ ধীরে ধীরে বলে, আমাকেও তো তিনিই পথ দেখিয়েছেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলাম না।

সুলতা বলে, দুঃখ কি? অরণ্য তো শুধুমাত্র ঝালুকপোখরেই বন্দী নয়। এই মনটা বাঁচিয়ে রাখবেন। প্রার্থনা জানাতে এসেছি আমি।

সতীনাথ সামান্য হেসে বলে, কি লাভ সে মনটা বাঁচিয়ে রাখবার সাধনা করে যাওয়ায়? সব জায়গায় তো আপনি থাকবেন না।

সুলতার মুখটা এবার স্পষ্ট হয়ে উঠল যেন। সুন্দর ঠোঁটের হাসি যেন আশ্বাসের নির্ভুল ইঙ্গিত।—কে বলল আমি থাকবনা? আমি আপনার পাশে চিরদিন এমনি করে বেঁচে থাকব, যেমন ছিলাম আপনার প্রতিটি কাজে এই ঝালুকপোখরে। বাইরে সেটা কেউ না দেখলেও, সেইটেই ছিল আমাদের একমাত্র সত্যসম্বন্ধ।

অবাক হয়ে চেয়ে রইল সতীনাথ।

সুলতা আবার বলে, ভুলে যাবেন না এদের কথা। মহাভারত আর রামায়ণের যুগ থেকে যারা সবার হাতে লাঞ্ছিত, অপমানিত, নির্যাতিত। পাণ্ডবদের বনবাস নিয়ে সংসারে চোখের জলের অভাব হয় নি কোন দিন। কিন্তু সেই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের বর্তমানেই ধর্মযুদ্ধের প্রাতঃস্মরণীয় নায়কেরা উলুপীদের সৃষ্টি করেছিল, সে এই অরণ্যেই। দ্রোণের মত আচার্য-পুরুষ একলব্যের মত মানুষ পেয়েছিল, সে-ও এই অরণ্যে সতীনাথবাবু। তাঁরা সবাই এদের লাঞ্ছিত করেছেন। ঠকিয়েছেন। আজো তার কোন পরিবর্তন হয়নি। তাঁরাও যেমন নিজের স্বার্থে অরণ্য-সন্তানদের ব্যবহার করে পরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন, আজো সভ্যজগতের মানুষ ঠিক তাই করে। সেদিনের দেবতাদের যখন বিবেকে বাধেনি, তখন আজকের মানুষদের আর কতটা দোষ দেওয়া যায় বলুন ?

সতীনাথ নির্বাক হয়ে শোনে সুলতার কথা। এমন করে তার কথা শোনার জন্যে বহুদিন বহু ব্যাকুলতাকে সে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। তার জানতে বাকি নেই, তার নামের সঙ্গে সুলতার নামটাকে অহেতুক জড়িয়ে সুন্দরমদের দল অনেক কাণ্ড করার চেষ্টা করেছে। যার প্রকাশ দয়ালের উক্তিতে আর ডেম্‌টার কটাক্ষে ধরা পড়েছে। তাদের দোষ দেওয়াও চলে না। প্রথমে কাঁচবাংলা এবং পরে ছোটবাংলা ঝালুকপোখরের মানুষদের কাছে যেমন ভরসা স্থল ছিল, তেমনি ভরসার স্থল তাদের ছিল সতীনাথের রেঞ্জকোয়ার্টার্স। অতএব এর মধ্যে যদি কেউ কোন গোপন যোগসূত্র আবিষ্কারের মহতী গবেষণা করে থাকে, তাদের ষোল আনা দোষ দেওয়া যায় না। তাছাড়া, ঐ দুই স্থান থেকে নির্দেশ উপদেশ সব একই রকমের জারি হতে দেখেছে ঠিকাদার আর শা'জীদের দল। দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আর পরামর্শ না থাকলে এমন কাণ্ডটা হয় কি কোরে ? এই সাদা কথাটা বোঝবার মত জ্ঞানবুদ্ধি তাদের সকলেরই আছে। গাঁয়ের লোকদেরও আছে। নইলে তারা যে কোন সমস্যার সম্মুখীন হলেই সুলতা আর সতীনাথের কাছেই বা ছুটে যাবে কেন ? আর আছেন মোহন মিত্র। অতএব, এঁরা সবাই মিলে যে ঠিকাদারগুষ্টি, কুণ্ডু আর শা'জীদের বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্তে লিপ্ত, সে বিষয় সকলে হলপ্‌ করে বলে থাকে। চক্রান্ত ছিন্ন করার জন্যে একযোগে কাজ করে। না কোরে উপায় নেই। নিজেদের অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখতে কে-বা না তৎপর ? এবং সে তৎপরতার জন্যে তাদের দোষ দেয়া যায় না।

সুলতা তাই বলেছে, অপবাদটা পাকা করে সকলের মনে চিরকালের জন্যে

গেঁথে রাখতেই সে নিজে এসেছে সতীনাথের কাছে। সতীনাথ অনেক দিনের অনেক কথা জমা কোরে এই দিনটির প্রতীক্ষাতেই যেন বসে ছিল। শঙ্করীর দেওয়া আঘাতের ক্ষত স্থূলতার স্পর্শে যেন এতদিনে উপশম হল। আজ সতীনাথ শঙ্করীকেও ক্ষমা করতে প্রস্তুত।

…সাব্। বিজলা সন্তর্পণে একবার ডাক দিল। ক্লান্ত, নিদ্রাচ্ছন্ন মানুষটাকে জাগাতে তার কষ্ট হচ্ছিল।

সতীনাথের চমক ভাঙল।

কতক্ষণ এইভাবে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল সে, খেয়াল নেই।

বাইশ

সতীনাথ চলে যাবার পরদিন খুব সকালে এসে ডেম্‌টা বিজলাকে হুকুম জানাল, অপিস খোল।

বিজলা ছুটে এসে সতীনাথের অপিস ঘরের পাশের ছোটঘরটার তালা খুলে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল।

ডেম্‌টা তাকে ধম্‌কে বললে, বেটা আসল আপিসটা খোল।

বিজলা বলে, হুকুম নেই।

ডেম্‌টা সাহেব দিনের বেলাতেও পেটভরে ভিয়াং পান করতেন। মুখখানা সদাসর্বদা তাই মনে হত ঘামে ভেজা-ভেজা। স্যাৎসেতে। পঞ্চাশ বছর বয়েস হয়েছে, তবু আজ পর্যন্ত দাঁড়ি-গোঁফ গজাল না। মুখখানা তাই কাদাকাদা মত মনে হত। থল্‌থলে একরাশ মাংস ছাড়া মুখের আর কিছু তেমন বোঝা যেত না। ছোটছোট চোখদুটো সেই কাদা-কাদা মাংসের ভেতর ডুবে থাকত। নাকের তো বালাই-ই নেই।

ক্রোধ হলে সে মুখখানা কতো বীভৎস দেখায় বলাই বাহুল্য। বিজলা একটু ভয়-ই পায়। তবু সতীনাথের হুকুম অমান্য করার সাহস তার হয় না। জানে, সতীনাথ আবার ফিরে আসবে। তাই, আবার বলে, হুকুম নেই।

কথাটা সম্পূর্ণ না শুনেই ডেম্‌টা জ্বলে ওঠে দপ্ করে। —হুকুম! শালা তোর সায়েবের ওপর এখন কি হুকুম হয় তাই দেখ্। খোল বলছি দরজা।

বিজলা তবু দরজা খুলল না। বলল, রেঞ্জার সাহেব বলে গেছেন, পাশের এই ঘরে আপনার অপিস হবে।

আচ্ছা। তোর দিনও ফুরিয়েছে তাহলে। যা। দূর'হ সামনে থেকে। আমিই এখন রেঞ্জার। মনে রাখিস।

বাধ্য হয়েই ডেম্‌টাকে পাশের কামরাতেই অপিস বসাতে হয়।

কাজের চেয়ে অকাজের লোকের ভিড় বাড়ে।

বুড়ো ওভারসিয়ার বলে, আর কি ডেম্‌টা সায়েব, মেরে দিলে হাঁত। রাজত্ব-কে রাজত্ব, রাজকন্যে-কে রাজকন্যে। পোয়াবারো তোমার।

ডেম্‌টা সারা শরীর কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে হাসে। ছোটবাংলার রাজকন্যে এবার থেকে সব রেঞ্জারেরই সহজলভ্য, বুড়ো কেলিং ওভারসিয়ারের এই তোষামুদে কথায় বাইরে খুশির বান ডাকালেও মনে মনে তার একটু ভয়-ও জাগে। কি জানি, যদি আবার ফিরে আসে লোকটা? কাজ নেই বাপু। যতদিন না ফাইনাল অর্ডার আসছে প্রোমোশনের, ততদিন বেশি বাড়াবাড়ি করে কাজ নেই। শেষে বুড়ো বয়েসে গুলী খেয়ে মরবে? তা সইবে না।

এই ডেম্‌টা সাহেবই একেবারে সেদিন ভিন্নমানুষ, যেদিন সতীনাথের চিঠি পেল, সে কয়েকদিনের মধ্যেই আসছে। ম্যাপের কাজ তার প্রায় শেষ হয়ে গেছে।

চিঠি পেয়ে ডেম্‌টার মাথায় হাত। একি হোল? আবার ফিরে আসবে? মাত্র এই ক'দিনের সুলতান হয়ে রইল সে?

বিজলাকে ডেকে আদর করে বলে, বিজ্‌লা, বাপ্‌ আমার, তোর মুখখানা আজ ক'দিন থেকে বেজায় শুকনো দেখাচ্ছে কেনরে? মনে হচ্ছে, অনেকদিন তুই 'বাহাত্তরের' মুখ দেখিস নি। এই নে টাকা। বিকেলেই এক পাঁট কিনে গলাটা ভেজাস।

বিজলা চতুর মানুষ। বলে, ভাটিওলা আমার পুরোন বন্ধু।

বুড়ো ওভারসিয়ার কাছেই ছিল। বলল, নে'না।

মালিক যখন সেধে পয়সা দিচ্ছে নে'না। পয়সা দিয়ে খাবি দই, গোয়ালিনী তোর কিসের সই?

বিজলা হাত পেতে পয়সা নেয়, আর মনেমনে ভাবে, দাঁড়াও কর্তা, বড় রোয়াব ঝেড়েছিলে। আসুক আগে রেঞ্জার সায়েব, তারপর বোঝাবো, আসল রেঞ্জার সে, না তুমি।

প্রার্থনায় মানুষের হৃদয়ে ভগবানের জন্ম হয় না।

সুন্দরমেরও হয় নি।

হেমপিসিকে স্টেশনে তুলে দিতে এসেছে সুন্দরম। টুলটুল আর কিঙ্কর সঙ্গে আছে। কেঁদে কেঁদে হেমপিসির চোখদুটো ফুলে আছে। লাল হয়ে। আসবাব আগে সুলতার সঙ্গেও তিনি আর দেখা করতে যান নি।

গাড়ী ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরম নেমে এল। বলল, কিছু ভেবোনা তুমি, কলকাতা এসেই আমরা ব্যবস্থাটা পাকা করে ফেলব।

হেমপিসি রক্তজবা চোখ দুটো মেলে ধরলেন সুন্দরমের মুখের ওপর।

সুন্দরম আবার বলে, কিছু ভেবোনা। সব ঠিক হয়ে যাবে।

হেমপিসি আঁচলে চোখ চেপে ধরলেন। তারপর সজল বিহ্বল কণ্ঠে বললেন, না সুন্দরম, আমি আর কিছু ভাববো না। কোনদিন না। টুলটুলের জন্যে আর আমি কোনদিন কিচ্ছু ভাববো না।

শেষের কথাগুলো সুন্দরমের কানে পৌঁছল কি না বোঝা গেল না।

গাড়ী তখন বেগ সঞ্চার করে সামনে এগোচ্ছে।

তেইশ

মধুবনের হাটে এমনি কত শতশত আসা যাওয়াব পালা নিত্য লেগে আছে কে-বা তার হিসাব রাখে! মহাকাশের বুক থেকে যেমন কত তারকার নিত্য খ'সে পড়ার খেলা চলে, মহাসমুদ্রের বুকে কত দুরন্ত তুফানের সৃষ্টি করে, আকাশ চুম্বি উত্তাল তরঙ্গ-যন্ত্রণার সৃষ্টি করে, দু-এক বিন্দু লবনাক্ত জল কোথায়ও গড়িয়ে পড়লে যেমন তার হিসেব কেউ রাখে না, তেমনি এই মহা অরণ্যের বুকে কত কি লাঞ্ছনা অপমান আর নির্যাতনের চাতুরি ভরা খেলা খেলে কত কে যে চলে যায়, আবার নতুন মুখ আসে, কেউ তার কোন হিসেব রাখে না।

মানুষ তার হিসাব না রাখলেও অরণ্য তার হিসাব আরেক রকম করে রাখে। নীরব সাক্ষী হয়ে জেগে থাকে সেখানে প্রতিটি গাছ-পালা লতা গুল্ম। ধ্যান গম্ভীর অরণ্যের মুখর সে রূপ কানে কানে অবিরত কথা কয়। নিস্তব্ধ নিঝুম ঘন অরণ্যের মাঝে সেই মন নিয়ে উপস্থিত হয়ে ঐ বিশালকায় তরুরাজির সামনে গিয়ে দাঁড়ালে কত কালের কত কাহিনীর স্পর্শ পাওয়া যাবে। সেখানে কোন কালের সামান্যতম একটি কথাও হারায় না। সব কিছু জমা হয়ে আছে। এ হিসাবে কোন ভুলের চিহ্ন অরণ্যের বুকে আঁকা নাই।

এখানে যেমন মোহনমিত্র সতীনাথের অসফলতার কাহিনী জমা হয়ে আছে, তেমনি আছে সুলতার ত্যাগ সহিষ্ণুতা, আর হেমাপিসির ব্যর্থ অশ্রু জলের কাহিনী। আর আছে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ অরণ্য সন্তানের নিরন্তর সংগ্রামের নব-ইতিহাসের কাহিনী।

অন্ধকারাচ্ছন্ন কাঁচবাংলায় সে রাতে সদ্য-ধর্ষিতা হতচেতন কুমারী কন্যাকে বুকে নিয়ে হেমাপিসি নীরবে যে কান্না কেঁদে গেছেন, সুন্দরমের লালসার আগুনে নিজকে আহুতি দিয়ে উৎসব মুখর কাঁচবাংলায় আরেক রাতে আঁধার সাঁতরে এসে ঘুমন্ত টুলটুলের মাথাটা বুকে চেপে ধরে যে কান্না তিনি কেঁদে ছিলেন, কোন কাহিনীই অরণ্যের বুক থেকে হারায় নি। তেমনি হারায় নি অরণ্য সন্তানদের নব-ইতিহাসের সংগ্রামময় কাহিনী। একদিকে যেমন মালিক ঠিকাদার আর মহাজনেরা নিষ্ঠুর আঘাতের পর আঘাত হেনে চলেছে, তেমনি ওরাও আরো সজাগ, আরো কঠোর হওয়ার ব্রত নিয়েছে। মিঠাপানিকে মুছে দিয়ে ঝালুকপোখরকে সৃষ্টি করে চলেছে। সেখানে এগিয়ে আসছে মোহন মিত্র, তরুবালা, সতীনাথ, সুলতা আর বাসব রতনের দল।

সুন্দরমদের কলঙ্ক কাহিনীও তেমনি জমা পড়েছে অরণ্যের বিস্তৃত বক্ষে। অরণ্য-বহ্নির সৃষ্টি হয় তাই মাঝে মাঝে। লোভাতুর মানুষের ঘৃণিত হাতে এই অরণ্যেই যে আগুনের সৃষ্টি হয়ে চলে, প্রকৃতির প্রতিশোধের মত অলক্ষ্য বিচারকের হাতে অরণ্য-বহ্নির সৃষ্টি হয়ে ঠিক তেমনি এ্যন্টি-ফায়ারের কর্তব্য সম্পাদিত হয়ে চলে।

আর একটি কথা।

পুরাতন বলে অরণ্যে কোন পরিচয় নেই। অতি প্রাচীন অতিপুরাতনও এখানে বারবার নবপল্লবিত কুসুমিত হয়ে চির সবুজ।

তাই, যেদিন দীর্ঘ বারো বছর পর এক সন্ধ্যায় ছোট বাংলার সামনে গাড়ী থেকে একজন নেমে সোজা ভিতরের দিকে এগিয়ে গেল, তাকে দেখলে কারো বুঝতে ভুল হবে না। এইতো, মাত্র সেদিন এই লোকটি ঝালুকপোখর থেকে বিদায় নিয়ে গিয়েছিল। এইতো মাত্র এই সে-দিন। এ-তো সতীনাথ। হরির-ও ভুল হয় নি। দরজা খুলে দিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কখন এলেন বাবু?

সতীনাথ বলল, এই তো আসছি। তোমাদের বাসায় আগে গিয়েছিলাম। বন্ধ। তাই এখানে চলে এলাম।

হরি বলল, কেন ? দাদাবাবু দিদিমনি ফেরেন নি এখনো ?

সতীনাথকে জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থাকতে দেখে হরি নিজের ভুল সংশোধন করে আবার বলল, ও। তাঁদের আপনি দেখেন নি আগে। বাবুর ছেলে-মেয়ে। গাঁয়ে গেলে ওঁদের এমনি দেরীই হয়।

সতীনাথের মনে একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন জেগে উঠে তাকে বেশ চঞ্চল করে তোলে। চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে। সুলতা কোথায় ? মোহনের ছেলে মেয়ে এসেছে ? তবে মিত্র সাহেব, বৌদি ? এঁরা কোথায় ?

হরি সতীনাথের চঞ্চল মনের প্রশ্নগুলো যেন কিছুটা আন্দাজ করে। পাশের ঘরের তালা খুলে আলো জেলে দিয়ে বলে, আগে বসুন। বিশ্রাম করুন। একটু চা করে দি। তারপর সব বলছি।

সতীনাথের আর কালহরণ সয় না। বলে, চা করতে হবে না হরি। গাড়ীতেই ফ্লাস্কে চা আছে। নিয়ে এস।

বেশ। আপনি ঘরে গিয়ে বসুন। আমি এখুনি আনছি।

সতীনাথ চেয়ে দেখে, এই কি সুলতার ঘর ? এতো একটা মস্ত লাইব্রেরী ঘর। বসবার অন্য কোন ব্যবস্থাই নেই একখানা কাঠের চৌকি ছাড়া। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সতীনাথ বারবার চারিদিকে চেয়ে দেখে।

হরি বলে, এখন ছোটবাংলা খুব বড় ইস্কুল বাড়ি। ডাক্তারখানাও আছে। দাদাবাবু ডাক্তার। তিনিই ওষুধ-বিষুধ দেন সকলকে।

সতীনাথ প্রশ্ন করে, এখানকার লোক ওষুধ খায় ?

আগে খেত না। আপনাকে আর কি বলব ? আপনিতো সব জানেন। শেকড়-বাকড় লতা-পাতা ছাড়া অন্য ওষুধ দেখলে ওরা বিষ বলত। এখন খায়। আরাম হয় দেখে সাহস বেড়ে গেছে।

সতীনাথ পাইপ সেজে টানতে থাকে আর হরির কথা শোনে মন দিয়ে।

হরি বলে, কাঁচবংলার ওনারা সব কলকাতা চলে গেছেন। আর আসেন না।

সতীনাথ কিছুটা অধৈর্য হয়ে পড়তে থাকে। যাঁর কথা শোনবার জন্যে এতদূর ছুটে এসেছে সে এতদিন পরে, হরি তাঁর কথা দিয়েই আরম্ভ করছে না কেন ? সতীনাথ ভেবেছিল ছোটবাংলায় উপস্থিত হয়ে সুলতাকে রীতিমত চমকে দেবে। মোহন মিত্রের বাড়ী হাজির হয়ে হঠাৎ তাঁকে অবাক করে দেবে। কোনটাই সফল হল না।

প্রশ্ন করে বসল, দাদা বৌদি, এঁরা কোথায় ?

হরি বলে, সেই কথাই তো বলছি। তাঁরা সবাই পুরী গেছেন তিনমাস হোল।

কেন ?

সেই কথাই তো বলছি। স্থ-দিদির খুব অসুখ করেছিল। কলকাতার বড় বড় ডাক্তারে ছোটবাংলা ছেয়ে গেল। অনেক কষ্টে তাঁর জীবন রক্ষে হল। তারপর বাবু মা-জী আর আমাদের বড় মাস্টারবাবু জোর করে স্থ-দিদিকে পুরী নিয়ে গেলেন হাওয়া-বদলের জন্যে। তবে, আর চিন্তা নেই। বড়মাস্টেরবাবু গেল মাসে ফিরে এসেছেন। তিনারা সব ভালই আছেন।

কিছুটা বুঝল সতীনাথ। কিন্তু মনটা তৃপ্ত হল না। অহেতুক আর প্রশ্ন করে হরিকে বিপন্ন করতে সতীনাথের ইচ্ছা রইল না।

উঠে হরি বলল, হাতমুখ ধুয়ে নিন। আমি রান্নার জোগাড় দেখি।

তাকে বাধা দিয়ে সতীনাথ বলে, আমার খাবার গাড়ীতেই আছে। তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না হরি। তুমি বোস।

আপনার বিছেনা-পত্তর ?

স গাড়ীতেই।

হরি স্তু হয়ে উঠে পড়ল। —যাই। দেখি। সব নিয়ে এসে ঘরে তুলি।

●

প্রায় সারাটা রাত সতীনাথ চোখের পাতা এক করতে পারেনি। নানা চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। হরি যত্নের কোন ত্রুটি করেনি। বলেছে, খাটেই বেছ্‌না করে দিই। স্থ-দিদি তো এই খাটেই বেছ্‌না করেন। নিজের হাতে বেছনা পাতা তাঁর অভ্যেস।

সতীনাথ একটু ভেবে নিয়ে বলে, তুমি আমার নিচেই বিছানা রাখ। আমি পেতে নেব। তুমি আর কষ্ট কোর না।

কষ্ট কি বাবু ? কষ্ট আপনার হবে ভূঁয়ে বেছনা পাতলে।

কোন কষ্ট হবে না হরি। আমার অভ্যেস আছে।

তা বললে কি হয় ? বাবু মা-জী স্থ-দিদি ফিরে এলে কি বলবেন বলেন তো ? আমি তা পারব না।

বেশ তো। আমিই পারব। তুমি ছেড়ে দাও।

ভূমিশয্যায় অনভ্যস্থ ছিল সতীনাথ।

ঘুম না-হওয়ার সে-ও অন্যতম কারণ হতে পারে। শেষরাত্রের দিকে হয়তো একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালে হেমেনের ডাকে চোখ খুলে অবাক হয়ে পড়ল সতীনাথ।

তুমি এখানে?

সেই প্রশ্ন নিয়ে আমিও তো ছুটে আসছি সতীনাথ। হরির মুখে শুনে বিশ্বাসই করতে পারিনি। স্বচক্ষে দেখেও এখনও নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছি না। কিন্তু, তুমি?

হ্যাঁ হেমেন। আমি। তোমার চেয়ে হয়তো আমার তৈরী হতে কিছু বেশি সময় লেগেছে। কিন্তু আমি এসেছি হেমেন। ফিরে এসেছি।

রজত আর অনুভা ঘরে এসে দাঁড়াতেই হেমেন বলল, এই দেখ সতীনাথ, দাদার ছেলে আর মেয়ে। রজত ডাক্তার। আর অনু আমাদের স্কুলেই কাজ করে।

সতীনাথ উঠে বসলে, রজত আর অনু তাকে প্রণাম করে বলল, কাল গাঁ থেকে ফিরতে আমাদের অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। হরির মুখে আজ ভোরে সব শুনে হেমেনদার সঙ্গে আমরা চলে এলাম।

অনু বলে, আপনার কথা সব সময়ই হয়।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। মা বাবা হেমেনদা লতাদি একসঙ্গে হলেই আপনার কথা হয়। বড় ইচ্ছে ছিল। যাক্। দেখা পেলাম।

মৃদু হেসে সতীনাথ পাইপ সাজতে লাগল। হেমেন বলল, তুমি তৈরী হয়ে নাও। আমরা কাজগুলো সেরে নিইগে যাই। হরি, বাবুর চা'টা সব ব্যবস্থা করে দাও।

সতীনাথ বলল, ব্যস্ত হোয় না হেমেন। কাল রাত থেকে হরি আমার সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে।

হরি অদূরে দাঁড়িয়ে কৃতার্থের হাসিতে মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করে তুলল।

সত্যিই অবাক হয়েছে সতীনাথ হেমেনকে দেখে। একি তার বেশভূষা? সৌখীন লেখক হেমেন আজকের এই কর্মব্যস্ত হেমেনের মধ্যে কোথায় হারিয়ে

গেছে, খুঁজে পাওয়া ভার। এমন সাধারণ গ্রাম্য বেশে হেমেনকে দেখবে সতীনাথ ভাবতেও পারে নি। খালিপায়ে অক্লেশে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হরি বলে, ঐতো উনি বড় মাস্টের বাবু। সেই যে আপনার কাছকে এয়েছিলেন সে বার।

তুমি ঠিক বলেছ হরি।

উৎসাহিত হয়ে হরি আবার বলে, উনি গাঁয়ে থাকেন।

আর তুমি ?

আমি এখেনে। এখেনেই আমার ডিপ্‌টি এখন। রাত-দিন।

সতীনাথ বলে, বেশ ভাল। আচ্ছা হরি, বিজলাকে তোমার মনে আছে ?

তা আবার নেই ?

সে আছে রেঞ্জকোয়ার্টার্সে ? তাকে একবার খবর দিতে পার ?

কাকে খবর দেব ? সে কি আর এখানে আছে ? আপনি চলে গেলেই তারও বদলী হয়ে গেল। আর ফিরে আসেনি।

ঝালুকপোখরের এই সঙ্গীটির কথা সতীনাথের বড় বেশি মনে পড়ে। একটি দিনের জন্যেও সে ভুলতে পারে নি বিজলাকে। অকুণ্ঠ সেবা আর যত্ন দিয়ে এই লোকটিই তাকে সজীব করে রাখত। মোহন মিত্র তরুবালা আর সুলতা যেমন এতগুলো বছরের একটি দিনও তার মনে এতটুকু অস্পষ্ট হয়ে যায় নি, তাদেরই পাশে পাশে এই লোকটির সব স্মৃতি সমানভাবে জেগেছিল এতদিন সতীনাথের মনে। সুলতাকে সে যেন সব সময় সব কাজে সাথে-সাথেই পেয়েছে এতদিন। সে যেন তাকে অহরহ স্মরণ করিয়ে চলেছে, কই, নাও। তৈরী হয়ে নাও। সত্যিই, ঝালুকপোখর একটি ক্ষণের জন্যেও তার মনের আকাশ থেকে মুছে যায় নি। কত স্থানে থাকতে হয়েছে তাকে, তবু মনটা তার ঝালুকপোখর ছেড়ে যেতে পারেনি। সেই কম্পাউণ্ড, সেই তার সখের গোলাপ বাগান, সেই সন্ধ্যায় সূর্য-ডোবা লাল আকাশ,—এসব কিছুকেই তার অবাধ্য মনটা এখনো আঁকড়ে পড়ে আছে। সব জায়গায় সূর্যাস্তের সময় পাইপ ধরিয়ে একমনে সতীনাথ পশ্চিমের আকাশের দিকে চেয়ে থেকেছে। কিন্তু ঝালুকপোখরের মত বনে-বনে তেমন করে ফাগ ছড়িয়ে সন্ধ্যাকে নামতে দেখেনি সে। সতীনাথ অরণ্যের মাঝে কোকিলের ডাক শুনেছে, ময়ূরের নাচ দেখেছে। পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে

সব আকাশেই। তবু ঝালুকপোখরের আকাশটার জন্যে প্রাণ তার কেঁদেছে বারবার।

দুপুরের আহারটা ওরা একসঙ্গেই সেরে নেয় ছোটবাংলায় সুলতার ঘরে বসে। হেমেন রজত আর অনু ছুটি পেল দুপুরে। তার আগে একটিবারের জন্যেও আর তারা ভেতরে এসে সতীনাথের কাছে বসতে সময় পায়নি। দুপুরের আগে কোনদিনই তারা ছুটি পায়না।

রজত আর অনুকে বারবার দেখে সতীনাথ। প্রাণ জুড়িয়ে যায় তার। এমনি করে মানুষ করে তোলবার জন্যেই মো'হন মিত্র তাদের অতদূরে সরিয়ে রেখেছিলেন, একেবারে মনের মত করে কাছে টেনে নেবার জন্যে। নিজে যা সফল করে তুলতে পারেন নি বলে মনে করেছেন, সেই দায়িত্ব-ভার রজত আর অনুর ওপর দিয়ে সুলতার পাশে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার তাঁর সঙ্কল্পের কথা আগে থেকে কেউ কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। কিন্তু তিনি তা-ই করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্যে, তরুবালার উদ্দেশ্যে সতীনাথ প্রণাম না জানিয়ে পারে না। জীবনের পথ যারা এমনি করে বেছে নেয়, সেপথের আঘাত তারা মোহন মিত্রের মতই আশীর্বাদ বলে মাথায় তুলে নিতে পারে।

সতীনাথের মনের অবস্থা বুঝে হেমেন বলে, এবার বুঝলে সতীনাথ, আদর্শই সততার বৈধ জনক। মহামুনি হলেও, অষ্টাবক্র। নিরর্থক। নির্বোধ সে আদর্শহীন সততা। স্থায়ীত্বহীন। মূল্যহীন। মোহন নিজের জীবন দিয়ে এই পুরোন কথাটা নতুন করে প্রমাণ করেছেন।

সতীনাথ মন দিয়ে শোনে হেমেনের কথাগুলো। কোন উত্তর দিতে পারে না। নিজের জীবন দিয়েই সতীনাথ বুঝেছে, কেবলমাত্র সততা আর সদিচ্ছাই জীবনকে কোন নির্ভুল ঠিকানায় পৌছে দিতে পারে না।

হেমেন জিজ্ঞাসা করে, ক'দিন আছ তো ?

সতীনাথ সহাস্যে চেয়ে থাকে হেমেনের দিকে। হেমেনের প্রশ্নের উত্তর দেয় না।

রজত আর অনুকে উদ্দেশ্য করে হেমেন বলে, তোমাদের ফিরতে আবার দেরী হয়ে যাবে ...

রজত বলে, আমরা এখুনি বেরিয়ে পড়ব। আজ আর বেশি দেরী হবে না।

সতীনাথ আর হেমেনের কাছে বিদায় নিয়ে রজত আর অনুভা গ্রামের উদ্দেশ্যে

বেরিয়ে গেল। হেমেন সেই দিকে চেয়ে বলল, ক'দিন যখন আছ, তখন দেখে যেও, মোহন মিত্র রেঞ্জার হয়েই কাজে নেমেছিলেন, রেঞ্জার হয়েই বিদায় নিলেন, অসফলতার একথাটা বাইরের লোকের কাছে সত্য বটে, কিন্তু যে অরণ্যকে তিনি প্রাণ মন দিয়ে আপন করে নিয়েছিলেন, সেই অরণ্যকেই তিনি নিজের সবকিছু সমর্পন করেছেন।

সতীনাথ নিঃশব্দে সামান্য হাসে।

হেমেন বলে, এই ছোট বাংলায়, সেবার ঝালুকপোখর থেকে চলে যাবার দিন তাঁকে মূর্খের মত রজত আর অনু সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করেছিলাম, সেদিন তিনি তার সরাসরি কোন উত্তর দেন নি। যেদিন নিজেকে তৈরী করে নিয়ে বছর দুয়েক পর আবার ফিরে এলাম, তখন রজত আর অনুকে দেখে আমার সেদিনের জবাব পেয়ে গেলাম। মোহনমিত্র শুধু মৃদু মৃদু হেসেছেন। বলেছেন, এদের গড়ে-পিটে তৈরী করে নাও হেমেন, আমার জীবন আর ভবিষ্যত সব কিছু আমি অরণ্যের পায়ে সঁপে দিয়ে গেলাম। সেখানে কোন ফাঁকি দিই নি।

সতীনাথের চোখ দুটো সজল হয়ে উঠল। একটা নিশ্বাস ফেলে নিরুত্তর রইল সে।

হেমেন উঠে দাঁড়াল।

বলল, এবার আমায় যেতে হবে সতীনাথ। আস্তানাটা ঘুরে পঞ্চাশ মাইল পথ ভেঙ্গে স্টেশনে পৌছতে হবে। আজ রাতের ট্রেণেই ওঁরা ফিরছেন। গত সপ্তাহে চিঠি দিয়ে দিন সময় জানিয়ে দিয়েছিলেন।

সতীনাথ একটু কি ভাবল নিজের মনে। তারপর বলল, আমি কি তোমার সঙ্গে যেতে পারি হেমেন?

একদিন এই হেমেনই অনুরোধ জানিয়েছিল, একটা কিছু জুটিয়ে দাও না আমায় সতীনাথ, থেকে যাই তোমাদের সঙ্গে। আজ সেই হেমেন সতীনাথের থেকে অনেক দূরে চলে গেছে যেন। কথাটা বলতেই হেমেন হেসে উত্তর দিল, এতদিনে এখানে এই কথাটাই বুঝেছি, অরণ্য অঞ্চলে পথ ভুলে গেলে কেউ তার জন্যে অপেক্ষা করে না। সঙ্গে ডেকে নেবার কেউ উপস্থিত থাকে না পাশে। নিজে এগিয়ে না গেলে পিছিয়ে পড়তে হয়।

—আমি আর পিছিয়ে থাকতে চাই না হেমেন।

বেশ। তবে চল।

একটু থেমে হেমেন আবার বলে, তোমাকে পাশে পেলে সুলতা দেবী আবার নতুন জীবন ফিরে পাবেন সতীনাথ, চল।

সতীনাথ মাথা নিচু করে হেমেনের সঙ্গে গ্যারেজের সামনে এসে হাজির হোল।

সতীনাথ বলল, আমার গাড়ীটা নিলে কোন অন্যায় হবে কি?

অন্যায় কেন হবে? তবে বিশেষ জরুরী না হলে আমরা এ অঞ্চলে গাড়ী ব্যবহার করি না।

হ্যাঁ তা দেখেছি। তখনও দেখেছি। উনি তা করতেন না, মোহন মিত্রও না।

হেমেন জীপ চালিয়ে সতীনাথকে নিয়ে গ্রামের দিকে এগিয়ে চলতে চলতে বলল, তারপর? তোমার কথা তো কিছুই বললে না।

সতীনাথ ধীরে ধীরে উত্তর দেয়, আমার কথা তো কিছু বলবার মত নেই।

হ্যাঁ। আমরা শুনেছিলাম সব। কিন্তু তোমার মুখে শুনতে ইচ্ছে হয়।

হেসে বলল সতীনাথ, কালাপানি হয়েছিল আমার। সেবার ম্যাপের কাজ শেষ হতে যখন আর দিন ক'য়েক মাত্র বাকি, সাহেব বললেন, হাঁ, ফিরে যেতে পার। যাবার দিন চিঠি নিও। তারই ওপর ভরসা করে এখানে চিঠি দিলাম, ফিরে আসছি বলে।

এইটুকু বলে সতীনাথ একমনে পাইপ টানতে লাগল।

তারপর?

তারপর ঠিক দিনক্ষণেই চিঠি পেলাম।

তবে ফিরলে না কেন?

সে চিঠিতে অন্য আদেশ ছিল। একেবারে গাড়োহা, বিহার বনবিভাগের কালাপানি!

সতীনাথ হাসতে লাগল।

হেমেন গম্ভীর হয়ে গাড়ী চালাচ্ছে।

কিন্তু ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। ট্রেনিং কালের ফলাফলের ওপর যা নির্ভর করে, সে পথ আমাকে ছেড়ে দিতেই হোল। আবার ডেরাডুন। তারপর···

সতীনাথ নতুন করে পাইপ ধরায়।

গাড়ী চালাতে চালাতে হেমেন একবার সতীনাথের মুখের দিকে নজর ফেরায়।

তারপর ?

তারপর কিছুদিন এদিকে-ওদিকে জুড়ি করে রাখলে। শেষে ডিভিশান্ চার্জ দিতে হল।

গাড়ী এসে বাসবদের ঘরের সামনে থামল। হেমেন বলল, নেমে এসো। তৈরী হয়ে নিতে একটু সময় লাগবে।

সতীনাথ হেমেনকে অনুসরণ করে গিয়ে ভাদরীর ঘরের পাশে নতুন একখানা বেড়ার ঘরে গিয়ে দাঁড়াল।

হেমেন বলল, বোস।

জায়গা বলতে সামান্য একখানা চৌকি। যেমন ছোটবাংলায় স্বলতার ঘরে দেখেছে সতীনাথ। স্তূপাকার কাগজপত্র, বই। হেমেন সেগুলো একপাশে সরিয়ে দিয়ে বলল, জায়গা করে নাও। বোস।

ভাদরী প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়াল ঘরে। হেমেনকে বলল, আজ না তোমার গাড়ী দেখতে যেতে হবে রাতে।

তাকে বাধা দিয়ে হেমেন সতীনাথের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, দেখ কে এসেছে। চিনতে পার ?

ভাদরী সতীনাথের দিকে খানিক এগিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখে হঠাৎ বলে ওঠে, আমাদের রেঞ্জার সায়েব না ? বিজলার সায়েব ?

হেসে হেমেন বলে, হ্যাঁ। এখন রেঞ্জার না, ডিফো সাব্।

সতীনাথ বলে, না। কিছুই না। এখন আর কিছুই না।

ভাদরী বলে, নতুন মেহ্মান। কি খাতির করি বলতো ? বলতে বলতে ব্যস্ত হয়ে ঘর থেকে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে ভাদরী ভাবে, কি ভাগ্য, সেই মেহ্বান আবার এসেছে।

গাঁয়ের অনেকেই ভিড় করে এগিয়ে আসে। ছেলে-বুড়ো সবাই। বাসব এসে দাঁড়ায়। বলে, আপনাকে আমরা ভুলি নি।

সতীনাথ বলে, আমিও তোমাদের ভুলিনি বাসব। রতন কোথায় ?

সে আসবে আজ রাতে। তাদের আনতে বড় মাষ্টার যাচ্ছেন যে।

সতীনাথ চেয়ে দেখে, বাসব এখন পূর্ণ জোয়ান। গাঁয়ের লোকেরা বলে,

মথুর। ঠিক মথুরা। তখন বাসবের চোখ দুটো রক্তে ভরে ওঠে। বাপের মাথার সেই রক্তের ফিন্‌কি বাসবের চোখ ভরে ওঠে।

ভাদরী এক ঘটি গরম দুধ এনে হাজির করল সতীনাথের সামনে। নাও, খাও বিজলার সায়েব।

সতীনাথ বেশ বিব্রত বোধ করল। বলল, ভর সন্ধ্যেবেলা এই এক ঘটি দুধ খেতে হবে?

ভাদরী মুখ গম্ভীর করে তোলে। খাবে না যখন, তখন মেহ্‌মান হয়ে আসো কেন?

হেমেন ভাদরীকে ভাল করেই চেনে। আগেকার ভাদরী আর সে নেই। অনেক সাহস বেড়ে গেছে। মিঠাপানিকে মিটিয়ে দিচ্ছে ওরা বনাঞ্চল থেকে। ওদের বুকের আর মুখের জোর এখন অনেক বেশি। সায়ের দেখলে কুনো হয় না।

ফস্‌ করে কিছু বলে বসে, এই আশাঙ্কায় হেমেন বলে ওঠে, ভাদরী, সায়েব মানুষরা চা খায়।

ভাদরী কি যেন বলতে যেতেই হেমেন তাকে বাধা দিয়ে বলল, না, তোকে আর চা তৈরি করতে হবে না। ঘটি রাখ। আমরা দুজনে ভাগ করে খাব।

ভাদরী খুশি হয়।

একটু দাঁড়াও হেমেন।

রেঞ্জ কোয়ার্টার্সের সামনে এসে গাড়ী দাঁড়াল। সতীনাথ নেমে এল। গেটের সামনে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। সে রেঞ্জ কম্পাউণ্ড আর নেই। তার সখের গোলাপ বাগান কবে মুছে গেছে। এরই মধ্যে সমস্ত এলাকাটা অন্ধকার। কোয়ার্টার্সের ভেতর একটা দুর্বল আলো। জানালাটা খোলা।

কত কথাই মনে পড়ছে সতীনাথের এই গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। যে গেট দিয়ে মোহন মিত্র ভেজা চোখে একদিন বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেন। সতীনাথ এসেছিল। এই তো সে দিন। মনে হয় এখনো তার কানে বাজছে, ইয়ে জঙ্গল হ্যায়। এঁহা বাঘ হ্যায়, ভালু হ্যায়, হাঁথী হ্যায়, ঔর···?

স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে মোহন মিত্রের কণ্ঠস্বর। এই তো সেদিনকার কথা।

সতীনাথ ধীর পদে ফিরে এসে বসল গাড়ীতে। হেমেন বলল, দেখলে সব ?

আবার এগিয়ে যায় ওরা।

সতীনাথ পাইপ ধরিয়ে বলে, হেমেন, তোমার তৈরী হয়ে আসতে অনেক কম সময় লেগেছিল। সত্যি ঈর্ষা হয় তোমাকে।

হেমেন সামান্য হেসে চুপ করে থাকে।

সতীনাথ বলে, যেদিন ডিভিশন চার্জের চিঠি পেলাম হাতে, সেদিন আর দেরি করলাম না। তারই উত্তরে লিখে দিয়ে এলাম, গোলামী থেকে মুক্তি চাই। তারপর সোজা তোমাদের কাছে।

গাড়ী থামিয়ে দিল হেমেন। কিছুটা অবাক হয়েই প্রশ্ন করল, সে কি ?

সতীনাথ বলল, হ্যাঁ হেমেন সেদিন যা পারিনি, আরো ওপরে উঠে বুঝলাম তোমাদের কাছে ফেরার পথ দূরতর হয়ে উঠেছে। তাই, অগৌরবের শিরপা ত্যাগ করে তোমাদের কাছে মুক্ত হয়ে ছুটে এলাম হেমেন। তোমরা আমায় গ্রহণ কর।

হেমেন চেয়ে দেখল সতীনাথের মুখে চোখে সুন্দর হাসি ফুটে উঠেছে।

হেমেন বলে, ঐ দেখ কাঁচবাংলা।

সেই বিখ্যাত কাঁচবাংলা।

সতীনাথ চেয়ে দেখে মাটিতে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে আছে বাংলার বিশাল চালাগুলো। এক একটা দেয়ালের অংশ নগ্ন প্রতিবাদের মত তবু মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে।

অনেকক্ষণ সেদিকে চেয়ে থেকে সতীনাথ বলল, বেশ।

হেমেন বলে, এমনি আরো কতো বাংলো ভগ্নস্তূপের মাঝে নিজেদের লজ্জা গোপনের জন্যে মুখ লুকিয়ে পড়ে আছে। এক-একটা যুগের সাক্ষী !

সতীনাথ, আমরা সভ্যতার বড়াই করে থাকি। সভ্যতা আর স্বাধীনতা যদি সহযাত্রী হয়, তবে যাদের আমরা অসভ্য বলে আসতে শিখেছি, তাদের কাছে নতজানু হয়ে শিক্ষা নেবার সময় এসেছে আমাদের। আমরা যখন

স্বাধীনতার কথাটা মুখে উচ্চারণ করতেও শিখিনি, যখন ইংরেজের দল এইসব অঞ্চলে এসে প্রথম ছাউনি গড়ে, ক্যানটনমেন্ট গড়ে, তখন থেকেই এরা স্বাধীনতার সৈনিক। যাদের কথা জানলে আমাদের মহাপণ্ডিতেরা নতুন বোধোদয়ের পাঠ নিতে বাধ্য হবেন। অনেক মহাত্মার মুখে চুণকালি পড়বে। অনেক অনেক জীবন দিয়েছে তারা পলাশীর পর। তবু আজো তাদের সংগ্রাম থামেনি।

সতীনাথ মনদিয়ে শোনে হেমেনের কথাগুলো।

হেমেন বলে ওঠে, তোমার জন্যে আমি আজ গর্বিত সতীনাথ। ঝালুকপোখরে থেকে সে সময় যা পারনি, তারচেয়ে জীবনের সফলতার অনেক উঁচুতে উঠে একদিন তাই তুমি পারলে সতীনাথ। তোমার জন্যে আজ আমার গর্বের শেষ নেই।

সতীনাথ সামান্য হেসে বলে, সুলতার দিকে চেয়ে দেখ হেমেন। তাঁর জীবন তো আরো প্রাচুর্যের জঞ্জালে ভরা ছিল। একা একা তার ভেতর থেকে পথ করে বাইরে আসতে তাঁকে কত যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে হেমেন।

সতীনাথের মুখে সুলতার উল্লেখ হেমেনকে নতুন করে উৎসাহিত করে তোলে।

বলে, একদিন তোমায় বলেছিলাম, কি অটুট শ্রদ্ধা তোমার ওপর। সেদিন তুমি নিজেকে ফেলে কেবল ছুটে বেড়িয়েছ।

আজ আমি নিজের কাছে নিজেকে ধরা দিয়েছি। তোমার কথা মনে পড়ত। এ-যে কি শান্তি, কি তৃপ্তি, বোঝান যায় না।

হেমেন গর্বের হাসি হাসে।

বলে, জানিনা, আরো একটা কথা তুমি ভেবে দেখেছ কি না। অরণ্যের কোলে জন্মে কোন অরণ্যবাসী কোন কালে কোন একজনও ঠিকাদার হোল না কেন বলতে পার? সোনার কুঠার তো তারাও তুলে নিতে পারত নিজের হাতে। বলবে পারদর্শীতা নেই। মূর্খের মত অন্ধের মত নয়, সুপরিকল্পিত সুশৃঙ্খল উপায়ে যারা প্রথম দিন থেকে স্বাধীনতার সভ্যতার সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করতে শিখেছে আমাদের বহু আগে, তাদের ওপর এ অপবাদ খাটে কি?

না খাটে না।

হেমেন আবার বলে, কী স্বার্থান্ধ আমরা ভেবে দেখ। যেই আমরা বুঝলাম আজাদীর লড়াইয়ে সমস্ত গ্ল্যামারটা ওরা দখল করে বসবে, ওমনি অহিংসা আর চরখা এনে ঢুকিয়ে দিলাম। তাতেও যখন তেমন কাজ হোল না তখন শত্রুশত চৌরিচৌরা সৃষ্টি করে ইংরেজের তবিলদার সেজে তাদের সারিতে গিয়েই দাঁড়ালাম। লজ্জায় মরে যাই সতীনাথ। অরণ্যের এই সত্য ইতিহাস যেদিন প্রকাশ পাবে, সেদিন আমাদের পণ্ডিত-মহাত্মাদের মুখগুলো কেমন দেখাবে তাই ভাবি। অথচ আমরাই সভ্য, এরা অসভ্য!

প্রাণখুলে সতীনাথ আর হেমেন হাসতে থাকে। ঘন অরণ্যের পথদিয়ে তাদের জীপ ছুটে চলে সবেগে, যেন সেইসব বিকৃত ইতিহাস দলিত-মথিত করে। অসমতল পাহাড়ীপথে হেমেন জীপ ছুটিয়ে চলেছে নির্ভয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে। কোথাও যেন কোন বাধা নেই তার চলার পথে।

সতীনাথের চোখের সামনে আজ যেন সব পুরাতন স্মৃতিগুলো নতুন বেশে ধরা দেয়। মনের কোণে বারবার একটা অনাস্বাদিত তৃপ্তির অভিবাঞ্ছিত স্বপ্নের পরশ অনুভব করে সে।

সুলতা তাকে দেখে কি মনে করবে?

হেমেন বলেছে, তোমাকে পাশে পেলে সুলতা দেবীর নতুন জীবন লাভ হবে।

একদিন এই অরণ্য অঞ্চলে জীবনের যে পথকে হারিয়ে বসেছিল সতীনাথ, সব চেয়েও, সব ছেড়ে তাকে বিদায় নিতে হয়েছিল, সে অরণ্য আজ দু'হাত ভরে তার সব প্রাপ্য ফিরে দিতে যেন উন্মুখ হয়ে তারই অপেক্ষায় আছে।

সে এক অপূর্ব আস্বাদ।

সুখে-দুঃখে ভরা জীবনের ফেলে আসা দিনগুলি হঠাৎ একসময় নিজের একেবারে নাগালের মধ্যে এসে ধরা দিলে যেমন বিস্ময়ভরা অব্যক্ত শিহরণে মানুষ বিহ্বল হয়ে পড়ে, সতীনাথের অবস্থা আজ ঠিক তাই।

গাড়ীর আলো সামনের যেটুকু পথ আলোকিত করে আরো দূর, আরো দূর এগিয়ে যাবার কেবলি আহ্বান জানায়, সেইটুকু পথ ছাড়া সামনে-পিছনে অ সব কিছু নিশ্ছিদ্র জমাট অন্ধকারে একেবারে ঢাকা। তার ভেতর দিয়ে হেমেন আর সতীনাথ এগিয়ে চলেছে। হেমেনের মনে কি হয় সতীনাথ জানে না। কিন্তু তার নিজের মনে আজ পুরোন কত স্মৃতির নতুনের বেশে অবিরাম আনা-গোনা।

দীর্ঘ সে অপেক্ষার কালে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত এই অরণ্যের নিরন্তর যে আহ্বান সতীনাথ নিজের হৃদয়ে অনুভব করে ব্যাকুল হয়েছে, তারই সঙ্গে মিশে ছিল যেন সুলতার আহ্বান। আজ অরণ্যের অন্ধকারে সব কিছু যেন কেবলি তাকে ডাক দিয়ে ফেরে।

সুলতার মুখখানা নতুন করে মনে পড়ে সতীনাথের। সেই অপরূপ লাবণ্যভরা সুঠাম দেহ সুলতার। ঠিক যেন অরণ্যের চরিত্রও তার। কত কিছু ঝড়-ঝঞ্ঝা বুকে জমা রেখেও অরণ্যের মতই স্থির, অচঞ্চল।

মনে হয়, সুলতার কণ্ঠস্বর।

—আমি জানতাম, তুমি আবার ফিরে আসবে।

সতীনাথ জানে, মধুবনের হাটে-হাটে এমনি আসা-যাওয়ার পালা কিন্তু লেগে আছে। বাইরের মানুষ তার হিসেব না জানলেও, অরণ্য তার নির্ভুল হিসেব আরেক রকম করেই রাখে। এখানে কোন কিছুই হারাবার নয়।

চঞ্চল হয়ে ওঠে সতীনাথ।

জমাট অন্ধকার ভেদ করে অদূরের ঐ মিটি-মিটি আলো। অস্পষ্ট হলেও বেশ বোঝা যাচ্ছে। স্টেশন দূরে নয়।

হাতঘড়িটার দিকে একবার চেয়ে নিল হেমেন।

সতীনাথ বলে ওঠে, আর একটু গতি বাড়াও হেমেন। ট্রেনের সময় হয়ে এল।

সমাপ্ত